Prof. A. L. Banerjee's

B. A. BENGALI SECOND LANGUAGE

Paper II

প্রবন্ধ, উপন্যাস ও সমালোচনা

Revised by

Prof. S. BAGCHI

MODERN BOOK AGENCY PRIVATE LTD.
10, BANKIM CHATTERJEE STREET,
CALCUTTA—12.

Published by
D. C. Bose,
MODERN BOOK AGENCY PRIVATE LTD.
10, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12.

সূচীপত্র

১৯৬০

Printed by

Satya Charan Das
Alexandra Printing Works
9-A, Hari Paul Lane,
Calcutta-6.

&

Harinarayan Dey
Sreegopal Printing Works
25/1A, Kalidas Singhee Lane,
Calcutta—9.

B. A. BENGALI SECOND LANGUAGE

শ্রীকান্ত—প্রথম পর্ব

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১) শ্রীকান্ত উপন্যাস, ঈষৎ রঞ্জিত জীবনকাহিনী

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবার সময় হইতে অনেকেই ইহাকে শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই রচনাটিতে এমন অনেক বিষয় সন্নিবেশ করা হইয়াছে যেগুলি শরৎচন্দ্রের জীবনেই কোনো না কোনো ভাবে ঘটিয়াছিল। অবশ্য 'শ্রীকান্ত' রচনাতে যে সব ঘটনা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেগুলি ঠিক সেইভাবে অর্থাৎ সেই স্থানে বা সেই নামাঙ্কিত পাত্রপাত্রীকে অবলম্বন করিয়া ঘটে নাই—কিন্তু অনেক ঘটনার মূল শরৎচন্দ্রের জীবনে পাওয়া যায় দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' এই ছদ্মনামে আপনার জীবনের কাহিনী ঈষৎ পরিবর্তিত আকারেই প্রকাশিত করিতেছেন। বস্তুত ইহা লইয়া সমকালীন সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

পরবর্তীকালে এই গ্রন্থটিকে সমগ্রভাবে দেখিয়া সাহিত্য-সমালোচকদের অনেকে সম্পূর্ণ উল্টা গাহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মত, এই যে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসই—তবে ইহাতে শরৎচন্দ্রের জীবনের কোনো কোনো ঘটনার ছায়াপাত আছে। তাঁহারা এই সব ঘটনার সাদৃশ্যকে বেশী মূল্য দেন নাই—কারণ অভিজ্ঞতা কথাসাহিত্যিকের একটা বড়ো অবলম্বন; উপন্যাসের মধ্যে জীবনের সত্য ঘটনা কিছু পরিমাণে থাকিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই এবং তাহা লইয়া হৈ-চৈ করাও নিষ্প্রয়োজন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে

শরৎচন্দ্র উত্তমপুরুষে কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন বলিয়া কাহিনীটিকে আত্ম-জীবনীমূলক রচনা বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা সাহিত্যের ভঙ্গিমাত্র। বর্ণনার সুবিধার জন্যই শরৎচন্দ্র উত্তমপুরুষে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ('রজনী' উপন্যাসে) এবং রবীন্দ্রনাথও ('ঘরে বাইরে' উপন্যাসে) উত্তমপুরুষে উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন—অনেক অপ্রধান লেখকও এই নীতি অবলম্বন করিয়া গল্প উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং শুধুমাত্র উত্তম পুরুষে রচিত এবং লেখকের জীবনে কয়েকটি ঘটনার পরিচয় গ্রন্থের মধ্যে আছে বলিয়া কোনো গ্রন্থকে আত্মজীবনীমূলক রচনা বলা সংগত হইবে না।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাস কি না তাহা বিচার করিবার জন্য ইহার মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ কী পরিমাণে আছে তাহা দেখা যাইতে পারে। প্রখ্যাতনামা ইংরেজী সাহিত্য সমালোচক উইলিয়াম হেনরী হাডসন উপন্যাসের উপাদানগুলি নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "In the first place, the novel deals with events and actions, with things which are suffered and done; and these constitute what we commonly call the plot. Secondly, such things happen people and are suffered or done by people; and the men and women who thus carry on the action form its dramatis personoe, or characters. The conversation of these characters introduce a third element—that of dialogue, often so closely connected with characterisation as to be an integral part of it. Fourthly, the action must take place, and the characters must do and suffer somewhere and at some time; and thus we have a scheme and time of action. The element of style may be put next on our list: and with this it might seem that for all practical purposes our analysis is complete. But there still remains a sixth component to which too much importance can hardly ttached. Directly or indirectly, and whether the writer

himself is conscious of it or not, every novel must necessarly present a certain view of life and of some of the problems of life; that is, it must so exhibit incidents, characters, passions, motives, or to reveal more or less distinctly the way in which the author loooks out upon the world and his general attitude towards it. It is difficult to find a name for this sixth element which is altogether satisfactory, for whatever may be suggested we are in danger of implying too little or too much. But postponing any discussion of this till we reach it our proper course, we will for the present call this the novelist's criticism, or interpretation or philosoply of life.

Plot, characters, dialogue, time and place of action, style, and a stated or implied philosophy of life, then, are the chief elements entering into the composition of any work of prose fiction, small or great, good or bad."

বস্তুত কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, প্রতিবেশ, ষ্টাইল ও লেখকের বিশিষ্ট জীবনদর্শন এই ছয়টি উপন্যাসের উপাদান ও আলোচ্য বিষয়। কাব্যের ক্ষেত্রে রসাদর্শ বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে; কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে তাহা অত্যাবশ্যক নয়। সুতরাং এই ছয়টি মুখ্য উপাদান অবলম্বন করিয়া 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থখানি উপন্যাস কি না, তাহা বিচার করিতে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

প্রথমত এই গ্রন্থটির মধ্যে যে কাহিনীটি পরিবেশিত হইয়াছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে আদর্শ উপন্যাসের কাহিনীর নাটকীয় গতিশীলতা নাই। শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের প্রথমার্ধে ইন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এবং দ্বিতীয়ার্ধে রাজলক্ষ্মীর প্রসঙ্গ অবতারণা করা হইয়াছে। ইন্দ্রনাথ প্রসঙ্গের মধ্যে নাট্যসুলভ বিকাশ ও পরিণতি নাই। লেখক কেবল ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া ইন্দ্রনাথের চরিত্রটিকেই পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—সেই সঙ্গে অন্নদাদিদির কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে উপন্যাসের কাহিনীর ক্রমে ইন্দ্রনাথ বা অন্নদাদিদির উপকাহিনীর কোনো

বিশেষ স্থান নাই—নিছক কাহিনীর দিক হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই অংশটি পরবর্তী অংশ (এবং 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের বাকি কয়টি পর্ব) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সমগ্র গ্রন্থটির রসাস্বাদনে কোনো ক্ষতি হয় না। উপন্যাসের দিক হইতে বিচার করিলে ইহা মূল কাহিনীর সহিত সম্বন্ধ জীবনালেখ্য মাত্র। জীবনস্মৃতিতে এইরূপ ঘটনা বর্ণনার প্রয়োজন আছে, কিন্তু উপন্যাসে এইরূপ চিত্রকর্মের কোনো প্রয়োজন নাই। প্রথম পর্বের দ্বিতীয়াংশে যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা জীবনালেখ্য না হইলেও পুরাপুরিভাবে উপন্যাসের কাহিনী বলিয়া স্বীকৃত হইবার মতো নয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে তর্ক উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, প্রথম পর্বের দ্বিতীয়ার্ধে যে কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে অবশিষ্ট পর্বে তাহারই পরিণতি সাধন করা হইয়াছে, সেগুলির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে প্রথম পর্বের এই অংশটির মধ্যে অসম্পূর্ণতাই পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু প্রথম পর্বের পিয়ারী প্রসঙ্গের মধ্যেই উদ্ভব ও পরিণতির একটা দ্রুত চিত্রণ দেখা যায় এবং তাহা পরবর্তী পর্বগুলির প্রবেশক হইলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং এই অংশের মধ্যে উপন্যাসোচিত কাহিনীরস আস্বাদ করিবার চেষ্টা করা অসংগত হইবে না।—কাহিনী হিসাবে পিয়ারী প্রসঙ্গ নাট্যসুলভ গতিশীলতায় পরিণতি লাভ করে নাই—আবার ইহাকে ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা মাত্র বলা চলে না। উপন্যাসের কাহিনীর মতো উপযুক্ত বিন্যাস এই অংশে না থাকিলেও এখানে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উপন্যাসের কাহিনীর সজাতীয়। লেখকের জীবন হইতে ইহার মূল আবিষ্কার করা হয়তো অসম্ভব নয়—কিন্তু ইহার মধ্যে অভিজ্ঞতাই মুখ্য নয়—যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা ঘটনামাত্র নয়, তাহার মধ্যে কাহিনীরস ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থটি হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিলেও শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের এই অংশকে খণ্ডোপন্যাস (short novel) বলা অসংগত হইবে না।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের মধ্যে যে সব চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে, তাহার মূল শরৎচন্দ্রের জীবনে সন্ধান করিবার চেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন। শ্রীকান্তের

মতোই শরৎচন্দ্রও পল্লীবালক এবং বাল্যকালে পশ্চিমের এক শহরে (ভাগলপুরে) তাঁহার নিকট আত্মীয়ের গৃহে থাকিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন। এখানে রাজেন্দ্রনাথ নামে যে একটি দুর্দান্ত বালকের সহিত শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়, সেই উপন্যাসের মধ্যে ইন্দ্রনাথরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে ইহাই অনেকে বিশ্বাস করেন। শৈশবে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র একটি বালিকাকে প্রায়ই প্রহার করিতেন—সেই রাজলক্ষ্মীর মূল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তিনি নিজে একবার শ্রীকান্তের মতো সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং এক সময় এক তরুণ রাজবন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি হয়তো এমন ঘটনার সহিত পরিচিত হন যাহা তাঁহাকে পিয়ারী বাইজীর প্রসঙ্গ রচনা করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। অন্নদাদিদির মূলেও সাপুড়ে স্বামীর সহচারিণী এক ব্রাহ্মণ-কন্যা রহিয়াছেন বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন।

কিন্তু এই মূলগুলি শরৎচন্দ্রের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়াছে এই মাত্র। জীবনীমূলক রচনার মধ্যে যেসব নরনারীর সহিত আমাদের পরিচয় হয়, সেগুলি বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিরূপে আমাদের মনে একটা করিয়া ছাপ কিছুদিনের জন্য রাখিয়া যায় এই মাত্র—কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে যেসব পাত্রপাত্রীর সহিত আমরা পরিচিত হই, তাহারা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট চরিত্ররূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থের মধ্যে যে সকল নরনারীর সহিত আমাদের পরিচয় হয়, সেগুলির কোনোটিই ব্যক্তি মাত্র নয়, সেগুলির প্রত্যেকটি এক একটি জীবন্ত চরিত্ররূপেই আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। কয়েকটি চরিত্র আছে—যেমন মেজদা, যতীন, পিসেমহাশয়, পিসিমা, নতুনদা প্রভৃতি। এই টাইপ চরিত্রের সঙ্গে বিকশমান ও জীবন্ত কয়েকটি চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—যেমন ইন্দ্রনাথ (পূর্ব হইতেই পরিণত হওয়ায় অল্প বিকশিত), অন্নদাদিদি ও পিয়ারী। আত্মজীবনীমূলক রচনাতে টাইপ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে ব্যক্তিত্ব তেমন

উজ্জ্বল হইয়া প্রতিভাত হয় না। আত্মজীবনীতে বিকশমান চরিত্র আদৌ থাকে না। সেখানে মানুষকে খণ্ডিত করিয়া দেখা হয় মাত্র। সুতরাং এই দিক হইতে দেখিলে শ্রীকান্তকে উপন্যাস বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অতিরঞ্জিত আত্মজীবনীতে কোনো কোনো মানুষের জীবনকে কল্পনার রসে সঞ্জীবিত করিয়া দেখানো যায় বটে, কিন্তু ঠিক এইভাবে কোনো চরিত্রকে বিকশিত করিয়া তোলা সম্ভবপর নয়। চরিত্রকে এইভাবে জীবন্ত করিবার দায় ঔপন্যাসিকের—ইহা আত্মজীবনীকারের কাজ নয়। সুতরাং শ্রীকান্ত উপন্যাসের সবগুলি চরিত্রের মূল শরৎচন্দ্রের জীবনে খুঁজিয়া বাহির করা গেলেও এই গ্রন্থে কয়েকটি উপন্যাসের চরিত্রই বিচরণ করিয়াছে।

সংলাপ ও প্রতিবেশের দিক দিয়া অবশ্য উপন্যাসের বিশিষ্ট কোনো ধর্ম খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নয়। উপন্যাস ও আত্মজীবনীর মধ্যে একই রকমের সংলাপ ও প্রতিবেশ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। শক্তিশালী কথা সাহিত্যিক মাত্রেই পরিচিত প্রতিবেশ ও সংলাপ দ্বারাই উপন্যাসের কথাবস্তু গড়িয়া তুলেন—যাহা একেবারে অপরিচিত তাহা দিয়া এই দুইটি জিনিস সৃষ্টি করিতে গেলে তাহা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে যে প্রতিবেশ রচনা করিয়াছেন এবং যে সংলাপ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল। শরৎচন্দ্র নিজে ভাগলপুরে ছিলেন এবং যে সব বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে ঐ অঞ্চলের বর্ণনা বহুস্থলে তাঁহার নিজের বাল্যজীবনের সহিত মিলিয়া যায় সন্দেহ নাই। প্রতিবেশের বর্ণনায় এবং সংলাপের ভঙ্গিতে তিনি বহু স্থলেই ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির রচনাতেও একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রতিবেশ এবং কথাবার্তা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালের লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। তাঁহার একাধিক উপন্যাসে বীরভূম জেলার প্রতিবেশটি অবিকল ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'শ্রীকান্ত' গ্রন্থটির মধ্যে যে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিবেশটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ ইহা নয় যে, তিনি শ্রীকান্তের বকলমে নিজের জীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার জীবন-দৃষ্টিরই পরিচয় প্রদান করে। জীবনের দিকে একটা ঋজু ভঙ্গিতে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা তাঁহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর কেহ করেন নাই—তাঁহার পরেও আর কারও রচনায় জীবনদৃষ্টির মধ্যে এমন স্বচ্ছতা হয়তো নাই। যাহা তাঁহার সহজ দৃষ্টির পরিচয়মাত্র দেয়, তাহাকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা সংগত হইবে না। সংলাপ ও প্রতিবেশের নৈকট্য শরৎচন্দ্রের কুশলী হস্তের নিদর্শনমাত্র।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের বর্ণনা ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ইহাকে উপন্যাস না বলিয়া আত্মজীবনী বলিয়া সন্দেহ করার একটি কারণ। প্রথম পর্বের সূচনায় পাই—"আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।"—ইহা গ্রন্থের নায়ক শ্রীকান্তেরই কথা—কিন্তু ইহাকে লেখক শরৎচন্দ্রের কথা বলিয়া বোধ হয়। অষ্টম পরিচ্ছেদের সূচনায় "লিখিতে বসিয়া অনেক সময়েই আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এই সব এলোমেলো ঘটনা আমর মনের মধ্যে পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া ত তাহারাএকটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই।" ইত্যাদি উক্তিতে মনে হয় যেন শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের মুখ দিয়া নিজের কথাই বলিতে চাহিতেছেন। এই উক্তির মধ্যে যে একটা আত্মসচেতনতা আছে তাহা উপন্যাসের নায়কের মুখে থাকে না—বাস্তবিক পক্ষে ইহা বহু অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক প্রৌঢ়ের আত্মজীবনীর স্টাইল।

'শ্রীকান্ত' গ্রন্থটি আদ্যন্ত এইভাবে রচিত যে, মনে হয় শরৎচন্দ্র যেন নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলিতেছেন এবং ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

কিন্তু ইহা ষ্টাইল মাত্র। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত উপন্যাসে বর্ণনার এই রীতিটিই গ্রহণ করিয়াছেন। এই রীতির একটি বড়ো সুবিধা এই যে, ইহাতে লেখক একদিকে যেমন ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে পারেন, অপর দিকে তেমনি ঘটনার স্রোতকে থামাইয়া দিয়া প্রয়োজন মতো হ্রস্ব বা দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও পারেন। এই স্টাইলে আত্মজীবনী রচনার একটা ভাণমাত্র আছে—বাস্তবিক পক্ষে লেখক এই ভঙ্গিটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। আত্মজীবনী হইলে লেখকের নিজের ভাবনাগুলি মুখ্য স্থান অধিকার করিত; কিন্তু এখানে তাহা হয় নাই—এখানে শ্রীকান্ত যেন দ্রষ্টার মতো কেবল সব কিছু দেখিয়া গিয়াছে। বস্তুত এই দেখাই এই উপন্যাসের প্রধান ব্যাপার—শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মধ্য দিয়া জীবনের সহিত আমাদের দর্শন করাইয়া দিতে চাহিয়াছেন।

'শ্রীকান্ত' গ্রন্থটির মধ্যে জীবন দর্শন আছে বলিয়াই ইহা উপন্যাস। আত্মজীবনীমূলক রচনার মধ্যে তত্ত্বোপলব্ধি থাকে—কিন্তু এ ধরণের জীবন দৃষ্টি থাকে না। এখানে শ্রীকান্তের উক্তির মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র জীবনের যে বিচিত্র রূপ এবং সেই জীবন হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা আত্মজীবনীকারের তত্ত্বালোচনা নয়—তাহা জীবনজিজ্ঞাসু স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা নিছক তথ্য বা তত্ত্বস্বরূপে প্রতিভাত হয় নাই (এইগুলিই আত্মকথার উপাদান), তাহার মধ্য দিয়া শিল্পের দ্যুতিস্বরূপ একটা গভীর জীবনবোধ প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীকান্ত বাস্তবিক পক্ষে উপন্যাস বলিয়া স্বীকার্য। ইহাতে লেখকের জীবনের অনেকগুলি ঘটনা ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া প্রতিফলিত হইয়াছে (অনেক উপন্যাসেই এমন হইয়া থাকে) বটে কিন্তু শরৎচন্দ্র সেইগুলি অবলম্বন করিয়া একটি উপন্যাসই রচনা করিয়াছেন। জীবনের ছোটো বড়ো বিভিন্ন ঘটনাকে একটু অতিরঞ্জিত করিয়া বিবৃত করিবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না—তিনি উপন্যাস রচনা করিতে গিয়া ঐগুলিকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীকান্তের মধ্যে একটি পুরাদস্তুর উপন্যাসের লক্ষণগুলি নাই—গঠনশিল্পের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাকে নিখুঁত উপন্যাস বলা চলে না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উপন্যাসই সব চেয়ে শ্লথবন্ধ। ইহার গঠন নাটকের মতো সুদৃঢ় না হইলেও চলে। শরৎচন্দ্র সেই গঠনকে আরও একটু শিথিল করিয়া দিয়াছেন। এক হিসাবে ইহাকে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণও বলা যাইতে পারে। কারণ এ যুগের উপন্যাসে গল্পটাই সবচেয়ে বড়ো বলিয়া মনে হয় না—জীবনচিত্র, সমস্যা সম্পর্কে বিতর্ক, অতিশয়িত বিশ্লেষণ এ যুগের উপন্যাসের মধ্যে স্থান করিয়া লইতেছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসের নায়ক বক্তার স্থান গ্রহণ করিয়া এইরূপ আলোচনা ও বিচিত্র উপাদান সমাবেশের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস শিল্পেরই একটি বিশিষ্ট রূপ সন্দেহ নাই।

(২) "এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।"—শ্রীকান্ত উপন্যাসের অবতরণিকা করিতে গিয়া শরৎচন্দ্র এই যে উক্তিটি করিয়াছেন উপন্যাসের মধ্যে ইহা কতখানি সমর্থিত হইয়াছে?

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটিতে শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনার প্রচলিত ধারাটি অনুসরণ করেন নাই। সাধারণ উপন্যাসে কথক প্রথম পুরুষ, তিনি উপন্যাসের ঘটনাবলী বর্ণনা করেন মাত্র। শ্রীকান্ত উপন্যাসে নায়কই উত্তমপুরুষে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে। নায়ককে উপন্যাসের কথকরূপে স্থাপন করিয়াও বহু উপন্যাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু সেগুলির সহিত শ্রীকান্ত উপন্যাসের একটা পার্থক্য আছে। সাধারণ উপন্যাসে নায়কের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা তাহার ক্রিয়াই নাটকের মুখ্য উপাদান। কিন্তু শ্রীকান্ত উপন্যাসে নায়ক যেন কেবল দ্রষ্টার মতো ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। প্রত্যেকটি ঘটনার সহিত তাঁহার যোগ আছে বটে কিন্তু কোনো ঘটনায় তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন নাই,

বা কোথাও কোথাও করিলেও এরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে মনে হইয়াছে যে তিনি নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র—ঘটনার সহিত তাঁহার সম্পর্ক যে স্থাপিত হইয়াছে তাহা একটা আকস্মিক ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

গ্রন্থের প্রথম হইতেই শরৎচন্দ্র এই দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যেন তাঁহার স্মৃতিকথা রচনা করিতে উদ্যত হইয়া বলিতেছেন, "আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্নবেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।"—এই স্মৃতিকথা কথকের ভূমিকাটুকু তিনি বস্তুনিষ্ঠ দর্শকরূপেই গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। জীবনে যে অভিজ্ঞতা তিনি (বা শ্রীকান্ত) লাভ করিয়াছেন তাহা সাদামাঠা ভাষায় ব্যক্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই জন্যই বাস্তবনিষ্ঠার উপর জোর দিয়া তিনি বলিয়াছেন, "তা ছাড়া মস্ত মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা—কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড় পর্বতকে পাহাড় পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া, জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ। কাহারও নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলায় থাক্ একগাছি চুলের সন্ধানও তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহারও মুখটুখ কখনও নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্যি কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।"—উক্তিটির মধ্যে অতিকথন থাকিলেও শ্রীকান্তবেশী শরৎচন্দ্র তাঁহার অভিপ্রায়টি নিপুণভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে শরৎচন্দ্রের বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সমকালীন অন্য যে কোনো লেখকের সহিত তুলনা করিলে তাঁহার রচনার

মধ্যেই কবিজনোচিত উচ্ছ্বাসের পরিচয় সব চেয়ে কম পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একমাত্র শ্মশানের অভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কোনো স্থলে কবিসুলভ অলংকরণের পরিচয় পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্র একটির পর একটি করিয়া ঘটনাগুলিকে বর্ণনা করিয়াছেন—সেই ঘটনাগুলিকে সুবিন্যস্ত করিয়া একটা অখণ্ড ভাবপরিবেশন করিবার উদ্দেশ্য তাঁহার আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। তিনি যেন শিথিলভাবে শ্রীকান্তের জীবনের ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়া চলিয়াছেন—বর্ণনার ভঙ্গি নিছক গদ্যাত্মক, বুদ্ধিগ্রাহ্য আলোচনা তাহাতে কিছু পরিমাণে আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিদৃষ্টির সুস্পষ্ট প্রকাশ তাহাতে নাই ; সমস্ত ঘটনার মধ্য হইতে একটি অখণ্ড ভাবগত তাৎপর্য আপাতদৃষ্টিতে সুব্যক্ত হইয়া উঠে নাই। ফলে লেখক কিশোর বা তরুণ বয়সের কাহিনী বিবৃত করিলেও তাহার মধ্যে কৈশোর বা প্রথম যৌবনের উন্মাদনার পরিচয় পাওয়া যায় না ; বরং কতকটা অনাসক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনার ফলে তাহা যেন কিছু পরিমাণে বুড়া বয়সের কথার অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছে।

অবশ্য উপন্যাসটির মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে যে, শরৎচন্দ্র যে বাস্তবমাত্রজীবী দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহা তাঁহার সত্যকার পরিচয় নয়। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য বর্তমান। ছন্দে যাহা প্রকাশ করিয়া বলা হয় তাহার মধ্যে কবিজনোচিত রূপায়ণ না হইলে চলে না। কিন্তু গদ্যের মেজাজই অন্য রকম। গদ্য বিজ্ঞানের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার মধ্যে কাব্যের স্বত-উৎসারিত রসধারা না থাকিলেও চলে। কিন্তু বাহিরে শিল্পায়ন না থাকিলে ভিতরে কবিত্বের ধারা থাকিবে না একথা বলা চলে না। বিশেষ করিয়া উপন্যাসের ক্ষেত্রে, যেখানে প্রতিপদে রস-দৃষ্টিকে বা রসানুভূতিকে পাঠকদের কাছে উন্মুক্ত করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই, সেখানে তাহাকে অন্তরালবর্তী রাখা অসংগত নয়, বরং তাহা লেখকের শক্তিরই পরিচয় দান করে।

বস্তুত 'শিল্পকর্মকে সংগুপ্ত রাখাই শ্রেষ্ঠ শিল্প' (ars est celare artem) এই লাটিন সুভাষিতটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশী করিয়া প্রয়োজ্য। বাহিরে নিছক বাস্তবের বর্ণনা থাকিলেও ভিতরে যথার্থ জীবন-দৃষ্টির পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। বাস্তব-জীবিতার আবরণ ভেদ করিয়া যথার্থ কবিত্ব উপন্যাসটির প্রায় সর্বত্রই প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের শিল্পী চেতনা যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বাহিরে নিতান্ত বাস্তব বিষয়কে প্রকাশিত করিতেছে এবং অন্তরে একটা গভীর সত্যকে উদ্ভাসিত করিয়া চলিয়াছে। এই অত্যাশ্চর্য শিল্প-কৌশলের পরিচয় শরৎচন্দ্রের অন্য রচনাতেও ক্বচিৎ পাওয়া যায়—ইহা মহৎ শিল্পের নিদর্শন।

(৩) শ্রীকান্ত উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

"ইন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অপরূপ সৃষ্টি। তাহাকে ঠিক শিশু বলা যায় কিনা সন্দেহ। শ্রীকান্তের সঙ্গে তাহার যখন পরিচয় হইল তখন সে শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু তবু তাহার মধ্যে যে সকল বৃত্তি সমধিক বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহারা বিশেষভাবে শৈশবসুলভ; পরিণত বয়সের পরিপক্কতা তাহাদের মধ্যে নাই। শিশুহৃদয়ের সাহস, নির্লিপ্ততা, চঞ্চলতা, পরোপচিকীর্ষা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের যত চিত্র আছে, তন্মধ্যে ইন্দ্রনাথ অতুলনীয় এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।…ইন্দ্রনাথ রূপকথার রাজ্যে বাস করে না, সে ইঙ্গিতের সাহায্যে আমাদিগকে চকিত করে না। তাহার কারবার কঠিন বাস্তবের সঙ্গে। অথচ ইন্দ্রনাথের কার্য-কলাপের এমন একটা ছাপ আছে যাহা অতিমানবের আচরণে পাওয়া যায়; কোন সময়ই তাহাকে আপামর সাধারণের গণ্ডিভুক্ত বলিয়া মনে করা যায় না।…

ইন্দ্রনাথের যে বৈশিষ্ট্যটি সর্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইতেছে এই যে, সে একজন সত্যিকার মহামানব। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সে পড়িয়াছে; খেলার মাঠে মারামারি, গঙ্গার উজান বাহিয়া মাছ চুরি, জেলেদের সতর্কতার মধ্য দিয়া মাছ লইয়া পলায়ন, সাপ, বুনোশূয়ার প্রভৃতি বন্যজন্তুসংকুল পথে সঞ্চরণ—ইহা তাহার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অঙ্গ। সমস্ত বিপদের

উপর দিয়া সে তাহার বিজয়কেতন উড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে; জীবনসংগ্রামে উপক্রুত, ক্ষতবিক্ষত, পরাজিত মানবের পক্ষে তাহার সহজ শ্রেষ্ঠত্ব, তাহার অনির্বাণ পরোপচিকীর্ষা, তাহার অম্লান তেজস্বিতা লোভের বস্তু, স্বপ্নের সামগ্রী। ইন্দ্রনাথ কঠিন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে, কিন্তু সে এমনি সহজে, এমনি অনায়াসে বিপদের মধ্য দিয়া অক্ষত অবস্থায় বাহির হইয়া গিয়াছে যে মনে হয় যাহা অপরের কাছে প্রতিকূল, তাহার কাছে তাহাই অনুকূল; যে পথকে অপরে কণ্টকাকীর্ণ মনে করিবে সেই পথই তাহার পক্ষে কুসুমাস্তীর্ণ।...

ইন্দ্রনাথের চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ তাহার নিঃশঙ্ক সাহস। আর এই সাহসই শিশুচরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষ ভয় করিতে সুরু করে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে শিখিয়া, লাভক্ষতির সম্ভাবনা পরিমাণ করিতে আরম্ভ করিয়া। শিশুর এই বালাই নাই; লাভলোকসান সম্পর্কে সে নির্লিপ্ত। সুতরাং বিপদকে সে বিপদ বলিয়া মনে করে না; অনিশ্চিতকে সন্দেহ করিয়া সে সাবধান হয় না, বরং অনিশ্চিত সম্পর্কে কৌতূহলী হইয়া সে তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে অগ্রসর হয়।...সে কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করে না, কোন অবস্থা বিপর্যয়ে সে সংকুচিত হয় না। শ্মশানের পাশ দিয়া গভীর রাত্রিতে অনায়াসে সে নৌকা চালাইয়া লইয়া যায়, জেলেরা সন্ধান পাইয়াছে মনে করিলে ভুট্টাগাছের মধ্যে লুকায়, সেইখান হইতে ঠেলিয়া নৌকা বাহির করিতে করিতে অবলীলাক্রমে নামিয়া পড়ে, কারণ অদূরে নিতান্ত নিরীহ বুনো শুয়ারটুয়ার এবং অতি নিকটে কিছু না—সাপ! গঙ্গার জল আবর্ত রচিয়া ভীমবেগে চলিতেছে, বালুর পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, যদি জেলেরা ধরিয়াই ফেলে তাহা হইলেও ভয়ের কোন কারণ নাই, ৬।৭ ক্রোশ ভাসিয়া গেলেই চলিবে! নতুনদা যত অন্যায়ই করুক, যে বাঘ তাহাকে লইয়া গিয়াছে সেই বাঘকে আক্রমণ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে নতুনদাকে রক্ষা করিতে হইবে। ইহা অক্ষমের আস্ফালন নহে, ক্ষুদ্রের

আকাশকুসুম নহে, ইহা বীরের সহজ, সরল সঙ্কল্প। অশান্ত প্রকৃতি ও হিংস্র জানোয়ারের সম্মুখীন হইতে যে অণুমাত্র বিচলিত হয় না, ক্ষুদ্র মানুষ তাহার কাছে নগণ্য হইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? উন্মত্ত শাহজী বর্শা দিয়া তাহাকে আঘাত করিয়াছিল, ফুটবল ম্যাচের মারামারিতে বিপক্ষীয় ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলে সে সহজে নিষ্কৃতি পাইত না। ক্ষিপ্রগতিতে সে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে সে প্রশান্ত, অবিচলিত; আত্মরক্ষা অপেক্ষা অপরের রক্ষার প্রতিই তাহার বেশী দৃষ্টি।

...সে যে শুধু নির্ভীক তাহাই নহে, সে নির্লিপ্ত। তাহার এই নির্লিপ্ত নির্ভীকতার মূলে ছিল তাহার সহজ, সরল জ্ঞান—মরিতে তো একদিন হইবেই। এই জ্ঞান সে দর্শনশাস্ত্র হইতে পায় নাই, ইহা তাহার অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক অনুভূতির ফল। ইহা তাহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। বারংবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া সে ইহাকে সহজ করিয়া লইয়াছে, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে সে ফাঁকি দিতে চাহে নাই। তাই তাহার বীরত্বের মধ্যে আস্ফালন নাই, আড়ম্বর নাই; ইহার মধ্যে রহিয়াছে শিশুসুলভ নিঃশঙ্কতা ও শিশুসুলভ সরলতা।

ইন্দ্রনাথের সাহস তাহার চরিত্রের প্রধান গুণ, কিন্তু সে শুধু সাহসের প্রতীক নহে। যদি সে একটিমাত্র গুণের আধারই হইত, তাহা হইলে তাহার মধ্যে পরিপূর্ণ মানবতার অভাব হইত। শিশুর নির্ভীকতা, নির্লিপ্ততার সঙ্গে জড়াইয়া আছে তাহার সরল, সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা। ইন্দ্রনাথ ভয়হীন কিন্তু শিশুসুলভ বহু অন্ধবিশ্বাসও তাহার আছে। শাহজীর সমস্ত আজগুবি গল্পে সে বিশ্বাস করিত, সাপুড়ের মন্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার আগ্রহের সীমা নাই, যে বিষপাথরে তিনদিনের মড়া বাঁচানো যায় তাহা আয়ত্ত করিয়া লইবার জন্য শাহজী ও অন্নদাদিদিকে সে বহু অনুরোধ উপরোধ করিয়াছে। তাহার ধারণা কালী প্রত্যক্ষ দেবতা, তাহাকে জবাফুল দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে সমস্ত বিপদ—গুরুজনের ভর্ৎসনা এমন কি শারীরিক

অসুস্থতা—হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যে মহামানব নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক কোন বিপদ্‌কেই তৃণাধিক জ্ঞান করে নাই, তাহার হৃদয়ে নিঃশঙ্ক আত্ম-নির্ভরশীলতার সঙ্গে এই সহজ সরল বিশ্বাসের ধারা প্রবাহিত হইত। বহু কষ্টে, বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সে মাছ শিকার করিয়া আনিয়াছে, কোন পার্থিব বিপত্তি তাহাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই; কিন্তু অপার্থিব ভূতপ্রেত সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তবে একটি ভরসা এই যে, যদিও তাহারা বহুরূপী তবু তাহারা নিজেরা মাছ তুলিয়া লইতে পারে না। সংস্কারে অন্ধবিশ্বাস মানুষের আত্মনির্ভরশীলতাকে দুর্বল করে; কিন্তু ইন্দ্রনাথের মন তাহার যুক্তিহীন বিশ্বাসের দ্বারা খণ্ডিত হয় নাই। তিনবার রাম নাম করিলে ভয় থাকে না—ইহা খুব সরল সংস্কার, কিন্তু ভয় করিয়া রাম নাম করিলে রক্ষা হয় না, কারণ তাহারা টের পায়। এই সরল সংস্কার তাহার চিত্তকে দুর্বল তো করেই নাই বরং তাহার স্বাভাবিক শক্তিকে বিশ্বাসের অবলম্বন দিয়া সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ নির্ভীক, নির্লিপ্ত, কিন্তু সর্বোপরি সে পরোপচিকীর্ষু। পরোপ-চিকীর্ষায় তাহার চরিত্রের যে দৃঢ় নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা যে কোন লোকের পক্ষেই বিস্ময়কর। তরুণের চিত্তে পরের উপকার করিবার ক্ষণিক উত্তেজনা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে সতেজ ও সক্রিয় রাখিতে ইন্দ্রনাথ যে শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা চপলমতি শিশুর নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। মৎস্য ধরিতে সে বিরাট অভিযান করিয়াছে, বিপদ্‌সঙ্কুল পথ বাহিয়া চৌর্যের পর্যন্ত আশ্রয় লইয়াছে। ইহাতে তাহার নিজের কোন স্বার্থ নাই; বিপদকে সে ভয় করে না, বিপদের সম্মুখীন হইতে সে বিচলিত হয় না, অথচ নিজের জন্য বিপদ বরণ করিতে সে কোন আগ্রহ দেখায় নাই। দারিদ্র্যনিপীড়িতা শ্রদ্ধাস্পদন অন্নদাদিদিকে সাহায্য করিতে, ঘৃণিত চরিত্র নতুন-দাকে রক্ষা করিতে·অসহায় বালককে অত্যাচারীর হাত হইতে ত্রাণ করিতে, প্রতিবেশীর বাড়ীর লোকদিগকে

নেকড়ে বাঘের উৎপাত হইতে মুক্ত করিতে—সে অম্লানবদনে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার কার্যকলাপ অবিমৃষ্যকারিতায় ভরা; কিন্তু দুঃসাহসিক অবিমৃষ্যকারিতার পশ্চাতে রহিয়াছে সুগভীর পরোপচিকীর্ষা; যাহা কিছু সে করিয়াছে তাহার সঙ্গেই পরের মঙ্গল জড়িত হইয়া আছে। সে সৈনিক নহে, দরিদ্রের সন্তান নহে, বিপদ বরণ করা, অর্থের জন্য কায়ক্লেশ সহ্য করা তাহার দৈনন্দিনের প্রয়োজন নহে। অথচ যেখানে পরের কষ্ট দেখিয়াছে, সেইখানেই তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া সে বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

ইন্দ্রনাথের পরোপচিকীর্ষা এত বিশ্বব্যাপী যে, ইহা শুধু জীবিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, অজানা শিশুর ভাসমান মৃতদেহও তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। সেই শিশুটিকে বন্য শৃগাল প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া সস্নেহে নৌকায় তুলিয়া লইয়াছে আবার তেমনি সস্নেহে জলের উপর শোয়াইয়া দিয়াছে। সদ্য মৃত শিশুকে দেখিয়া তাহার বলিষ্ঠ হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হইয়াছে, যে অভিযান হইতে সে সাপ, বুনো শূয়োর, ততোধিক হিংস্র জেলে প্রভৃতির ভয়ে নিরস্ত হয় নাই, তাহার প্রতিও ক্ষণেকের জন্য স্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। এইখানেও আবার শিশুসুলভ অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় পাই। ইন্দ্রের ধারণা ঐ মৃতদেহকে জলে শোয়াইয়া দেওয়ার সময় সে 'ভেইয়া' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার প্রেতাত্মা ঠিক পিছনেই বসিয়া আছে! ইন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার পাশে মহামানবের বলিষ্ঠতা ও শিশুর চঞ্চলতা ও সারল্য একই সময়ে পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। কালীর জবাফুলে আসক্তি, রামনামের মাহাত্ম্য, ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব—হিন্দুর সমস্ত সংস্কারেই তাহার অচল বিশ্বাস। অথচ যখন তাহার পরোপচিকীর্ষা জাগিয়া ওঠে তখন সে অতি সহজে এই সব সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া পড়ে। যে মৃতদেহ সে তুলিয়া লইল তাহা কোন ছোট জাতীয় লোকের হইতে পারে এই বলিয়া শ্রীকান্ত আপত্তি তুলিয়াছিল, কিন্তু

অমনি ইন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল, 'আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই তৈরী হোক—এখন ডিঙি ছাড়া কেউ বলবে না আমগাছ, জামগাছ—বুঝলি না? এও তেমনি।' তাহার যুক্তির মধ্যে শিশুর সরলতা, অকপটতা ও তর্কশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার চিহ্ন আছে; কিন্তু তৎসঙ্গে সত্যের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিবার যে অনায়াসলব্ধ শক্তির পরিচয় আছে তাহা শুধু মহামানবেই সম্ভব। অন্নদাদিদির সঙ্গে সংস্রবের মধ্যেও শৈশবোচিত চঞ্চলতা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া উঠিয়াছিল। সে অন্নদাদিদিকে গভীরভাবে ভালোবাসে, তাহার জন্য যে কোন কষ্ট করিতে প্রস্তুত আছে, সামান্য কারণে সে শিশুর মত রাগিয়া উঠে। অন্নদাদিদির গোপন ইতিহাস সম্পর্কে সে শিশুর মতোই অজ্ঞ। তাহার দিদি মুসলমান, ইহা তাহার ভাল লাগে নাই, এবং সে ক্রুদ্ধ হইয়া ইহা লইয়া সে দিদিকে গালি দিয়াছে। অথচ কেমন করিয়া সে ইহাও অনুভব করিয়াছে যে, যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে তাহাই একমাত্র সত্য নহে, ইহার অন্তরালে গভীরতর রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার অনুভূতির এই অস্পষ্টতাও একান্ত-ভাবে শিশুসুলভ। অন্নদাদিদিকে সে যে কত ভালবাসিয়াছে তাহা সে জানিত না। তাই যখন তখন রাগিয়া উঠিয়া শাহ্‌জীকে ও দিদিকে সে গালাগালি দিয়াছে; সাপের মন্ত্র, শিকড় ও বিষপাথরের বিষয়ে সত্য কথা জানিতে পারায় তাহার বহুদিনের আশা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং এই আশা-ভঙ্গে সে শিশুর মত রাগিয়া উঠিয়াছে। দিদির স্বীকারোক্তির অন্তরালে যে কতখানি বেদনা, সত্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ ছিল তাহা না বুঝিয়া সে তাহাকেই অজস্র কটূক্তি করিয়াছে; ক্ষণেক পরেই দিদির পক্ষ লইয়া শাহ্‌জীর সঙ্গে মারামারি করিয়াছে; কিন্তু শাহ্‌জীর হৃদয়ের স্বচ্ছতা, সরলতা ও বলিষ্ঠতা তাহার অনভিজ্ঞতা অথচ সত্যের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা—তাহার সকল প্রবৃত্তিই অতিশয় বিস্ময়কর, আবার একান্তভাবে শিশুসুলভ।

ইন্দ্রনাথের চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও কোমলতা, দৃঢ়তা ও চঞ্চলতা, হৃদয়ের উদারতা ও বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতার যে সমাবেশ হইয়াছে তাহার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আর দুইটি আপাতবিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্যের যে সমন্বয় হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরের উপকার করিতে সে সদাজাগ্রত, তজ্জন্য যে কোন কষ্ট স্বীকার করিতে সে সদা প্রস্তুত, অথচ নিজের সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেই যে হেডমাষ্টারের পিঠের উপর অসম্ভ্রমসূচক কি একটা করিয়া স্কুল হইতে পলায়ন করিয়াছিল আর সেখানে যায় নাই। 'এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে ইস্কুল হইতে রেলিঙ ডিঙাইয়া বাড়ী আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে তথায় ফিরিবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর প্রায়ই খোলা থাকে না।' কিন্তু সেইজন্য তাহার কোন আক্ষেপ নাই, সেইখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য আগ্রহ নাই। 'আর এমনি ভাবেই একদিন অতি প্রত্যূষে ঘরবাড়ী, বিষয়-আশয় আত্মীয়স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গেল, আর আসিল না। এইখানেও আক্ষেপ নাই, বিজ্ঞাপন নাই, আড়ম্বর নাই। যে কয়দিন সে সমাজে, সংসারে ছিল, সেই কয়দিন বিজয়ী বীরের মত সমস্ত প্রচলিত শিক্ষাসংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়া পর্বতপ্রমাণ বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়াছে। যাহাদের সংস্রবে আসিয়াছে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছে আবার তাহাদের প্রতি আকৃষ্টও হইয়াছে। কিন্তু যে দিন সে চলিয়া গেল, সেইদিন অতিথির মত নির্লিপ্তভাবে চলিয়া গেল, কোন বন্ধন কোন প্রলোভন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।" [সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত]

ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বের নায়ক বলা চলে কি? শ্রীকান্ত উপন্যাসে এই চরিত্র অবতারণার সার্থকতা কী তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

সমগ্রভাবে বিচার করিলে 'শ্রীকান্তই' শ্রীকান্ত উপন্যাসের নায়ক—ইন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের অগণিত চরিত্রের একটি চরিত্র মাত্র। কিন্তু শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে বিশেষ করিয়া ইহার বারোটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম সাতটি

পরিচ্ছেদে ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে তাহাকে নায়কের মর্যাদা দেওয়া অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের এই অংশে ইন্দ্রনাথ চরিত্রের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। বস্তুত শ্রীকান্তের জীবনস্মৃতির এই অংশকে ইন্দ্রনাথচরিত বলা চলে। প্রথম দর্শনেই ইন্দ্রনাথের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও অসামান্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় শরৎচন্দ্র দান করিয়াছেন। ইস্কুলের মাঠে বাঙালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করিয়া যে ছোটখাটো দাঙ্গা হইয়াছে তাহাতে ইন্দ্রনাথ যে ভাবে ত্রাণকর্তার মতো শ্রীকান্তকে উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতে তাহার প্রতি বিস্ময় ও মুগ্ধতায় শ্রীকান্তের অন্তর পরিপূরিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর রয়েল বেঙ্গল টাইগার-বেশী ছিনাথ বহুরূপীর ব্যাপারে তাহার যে পরিচয় সে পাইয়াছে তাহাতে সে তাহার সহিত একাকী গভীর রাত্রে নৌকা করিয়া যাত্রা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। সেই নিশীথ অভিযানে ইন্দ্রনাথের চরিত্রের অসাধারণত্ব অপূর্বভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই অংশে আমরা মূলত ইন্দ্রনাথের ভাবনার পরিচয়ই পাই। উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্তের নিজস্ব ভাবনা অবশ্য উপন্যাসটির মধ্যে ক্বচিৎ প্রকাশিত হইয়াছে—শ্রীকান্ত যেন এখানে তাহার বাল্যের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর পরিচয় সর্বদিক দিয়া দিতে চাহিয়াছে। ইহা উপন্যাসের খণ্ডাংশ মাত্র হওয়ায় ইন্দ্রনাথের জীবনের পূর্ণরূপ বা তাহার পরিণতির কোনো বিস্তৃত বিবরণ এখানে পাওয়া যায় না; তবে এখানে আমরা ইন্দ্রনাথের চরিত্রের যেটুকু পরিচয় পাই তাহাতে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। শরৎচন্দ্র গতিশীল কাহিনীরূপে এই উপন্যাসটিকে রচনা করেন নাই; সেইজন্য কয়েকটি ঘটনার সূত্রে ধীরমন্থর গতিতে এই চরিত্রটির বিকাশ বা পরিণতি তিনি দেখান নাই। বরং যেন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এই চরিত্রটির বিভিন্ন অংশকে পাঠকের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীকান্তের ব্যক্তিরূপটি তিনি নানাভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একটা একটানা দীর্ঘ ঘটনার স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া

তাহার চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়া না তুলিলেও তিনি কতকটা বিচ্ছিন্নভাবেই তাহার চরিত্রের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাহার নায়কোচিত মহিমার কোনো হানি হয় নাই। ইন্দ্রনাথ তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লইয়া শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রথম অংশের নায়কের ভূমিকায় সমাসীন থাকিয়াছে।

কিন্তু এখানে একটা আপত্তিও তোলা যাইতে পারে। শ্রীকান্ত একটি —আত্মজীবনীমূলক না হইলেও—আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাস। উপন্যাসটির অপর যে কোনো চরিত্র যতই উজ্জ্বল বা মোটা রেখায় অঙ্কিত হোক না কেন কথকের ব্যক্তিত্বই সর্বত্র এতখানি ব্যাপ্ত থাকে যে অন্য কোনো চরিত্রকে নায়কের মর্যাদা দেওয়া যায় না। একথা সত্য যে, ইন্দ্রনাথ চরিত্র প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু শ্রীকান্তের চিত্তেই তাহার প্রতিফলন হইয়াছে সন্দেহ নাই। এখানে গল্পকার প্রথম পুরুষে বর্ণনা করেন নাই, উত্তম পুরুষে করিয়াছেন আর সেই উত্তম পুরুষ এমন একটি চরিত্র যাহার ক্রিয়ার পরিবর্তে ভাবনার জালই আগাগোড়া বোনা হইয়াছে। প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদে ইন্দ্রনাথ প্রাধান্য লাভ করিলেও শ্রীকান্ত ব্যক্তিত্বহীন কথক মাত্রে পরিণত হয় নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব সর্বত্রই সঞ্চারিত হইয়া আছে। সুতরাং লঘুভাবে বিচার করিয়া ইন্দ্রনাথকে নায়কের গৌরবজনক ভূমিকা দেওয়া গেলেও সূক্ষ্ম-ভাবে পর্যালোচনা করিলে শ্রীকান্তকেই নায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং ইন্দ্রনাথকে তাহার জীবনকালের একটি উজ্জ্বল তারকা মাত্র বলা যাইতে পারে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাস হইলেও সাধারণ উপন্যাসের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ইহাতে নাট্যসুলভ কাহিনীর পরিবর্তে জীবনের বহু অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত হইয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে একটা ঘটনার অখণ্ড স্রোত বর্তমান, সেটা প্রধান সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্ নয়। মূল ধারার আশে পাশে যে সকল শাখা বহির্গত হইয়াছে সেগুলি উপন্যাসটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ইন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ সেই শাখাগুলির অন্যতম, এবং সবচেয়ে বেশী পরিমাণে পুষ্ট। ইন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া জীবনের যে অভিজ্ঞতা

ব্যক্ত হইয়াছে তাহা অসাধারণ সন্দেহ নাই। ইন্দ্রনাথের অতুলনীয় সাহস, হৃদয়বত্তা, শিশুসুলভ সরলতা ও গভীর জীবনবোধ যেভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার মূল্য নিতান্ত অল্প নয়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের মধ্যে ইন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এইজন্যই সার্থক বলা চলে।

ইহা ছাড়া শ্রীকান্তর জীবন গঠনেও ইন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। শ্রীকান্ত বাল্যে ইন্দ্রনাথকে সঙ্গীরূপে পাইয়াছিল। ইন্দ্রনাথের সাহস যে শ্রীকান্তের মধ্যে কিছুপরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা বাজি ফেলিয়া শ্রীকান্তের শ্মশানের মধ্যে যাত্রা হইতে অনুভব করা যাইতে পারে। ইন্দ্রনাথের হৃদয়ের মধ্যে যে উদারতা ও পরোপচিকীর্ষা ছিল তাহাও শ্রীকান্তের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সে মহামারীর সময় জীবন বিপন্ন করিয়াও রোগাক্রান্তের সেবা করিতে পিছাইয়া যায় নাই। ইন্দ্রনাথের বাস্তববোধও শ্রীকান্ত প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিল; কোনো অবস্থাতেই সে বিমূঢ় হইয়া পড়ে নাই। সর্বোপরি ইন্দ্রনাথের চরিত্রের মধ্যে যে তীব্র নিরাসক্তি ছিল তাহা শ্রীকান্তের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। ইন্দ্রনাথের মতোই শ্রীকান্তও বারবার সকল মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তের জীবনমন্ত্রের দীক্ষাগুরুরূপে কল্পিত হইয়াছে বলা হয়তো অসংগত হইবে না।

"ইংরাজী সাহিত্যিক একজন লিখিয়াছিলেন 'To know her was itself a liberal education' এই বাক্যটি সম্পূর্ণরূপেই অন্নদাদিদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য"। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অন্নদাদিদির চরিত্রটি বিশ্লেষণ করিয়া উদ্ধৃত উক্তিটি আলোচনা কর। এই চরিত্র রূপায়ণের মূলে শরৎচন্দ্রের যে দৃগ্‌ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার পরিচয় দাও।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের অপর বহু চরিত্রের মতোই অন্নদাদিদির চরিত্রটিও বিচিত্র। তাহার জীবনের ইতিহাসের তুলনা নাই। যে স্বামীর সহিত তাহার

বিবাহ হইয়াছিল সে চরিত্রহীন ও অমানুষ। তাহার বিধবা ভগ্নিকে হত্যা করিয়া তাহার স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। বহু বৎসর পরে সে আবার মুসলমান সাপুড়ের বেশ ধরিয়া অন্নদাদিদির পিত্রালয়ে গিয়াছিল। অপর কেহ তাহাকে চিনিতে না পারিলেও অন্নদাদিদি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। হিন্দু স্ত্রীর কাছে স্বামীই সর্বস্ব। সুতরাং সে ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়াও মুসলমান হইয়া যাওয়া চরিত্রহীন খুনী স্বামীর সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছে। লোকের কাছে সে কলঙ্কিনী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে কারণ সে যে তাহার স্বামার সহিত গৃহত্যাগ করিতেছে তাহা সে কাহাকেও জানাইতে পারে নাই। খুনী স্বামার পরিচয় দান করিলে স্বামীর বিপদের আশঙ্কা আছে এ কথা সে বিস্মৃত হয় নাই। লোকে তাহাকে অসতী বলিয়া জানিয়াছে জানুক, তাহাতে তাহার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সে স্বামীর অনুচারিণী হইয়া সত্যধর্মকে বরণ করিয়াছে ইহাই তাহার বিশ্বাস। হৃদয়হীন স্বামীর অজস্র অত্যাচারেও তাহার সেই বিশ্বাসের ভিত্তি টলে নাই—স্বামীকে সে আমৃত্যু অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

অবশ্য শ্রীকান্ত বা ইন্দ্রনাথ অন্নদাদিদির জীবনেতিহাসের পরিচয় পাইবার পূর্বেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীকান্ত অন্নদাদিদির সহিত প্রথম পরিচয়ের সময় বর্ণনা করিয়াছে, 'আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগ যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ কাঁকালে আঁটি বাঁধা কতকগুলি শুকনো কাঠ এবং ডান হাতে ফুলের সাজির মত এক খানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাকসব্জী! পরণে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামা কাপড়—গেরুয়া রঙে ছোপান, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়। দুহাতে দুগাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দুস্থানীর মত সিঁদুরের আয়তির চিহ্ন'—স্বামীর যে ধর্ম তাহারও সেই ধর্ম— কিন্তু হিন্দু নারীর আচার সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহার আকৃতির মধ্যেই তাহার চরিত্রের দীপ্তি উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকান্ত তাহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ও কিছু পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। ইন্দ্রনাথের পরেই অন্নদাদিদি তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আকর্ষণ করিয়াছে।

বস্তুত অন্নদাদিদির নিকট হইতে শ্রীকান্ত যাহা লাভ করিয়াছে তাহা তাহাকে liberal educationই দান করিয়াছে। অন্নদাদিদির চরিত্রের মধ্যে যে সহজ স্নেহপ্রবণতা ছিল তাহা শ্রীকান্তের কিশোর চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে।—দিদির মধ্যে এমন একটা মহত্ত্ব ছিল যাহা নিদারুণ দৈন্যের মধ্যেও তাহাকে সকল তুচ্ছতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাহার স্বামী প্রতারক—প্রতারণা তাহার ব্যবসার অঙ্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দিদি নিজে কোনোরূপ প্রতারণা না করিলেও স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে অনেক কিছু ঢাকিয়া রাখিতে হইয়াছে। ইন্দ্র যখন অভিমান করিয়াও তাহাকে প্রতারক বলিয়াছে তখন 'তাঁহার মুখখানি কিসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় একেবারে কালিবর্ণ হইয়া' গিয়াছে। অন্নদাদিদির স্নেহবৎসল হৃদয় ইন্দ্রকে ঠকাইতে চাহে নাই—স্বামীর বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও সে ইন্দ্রকে জানাইয়া দিয়াছে যে তাহারা সাপের মন্ত্র জানে না, কৌশলই তাহাদের ব্যবসার সম্বল।

স্নেহ ও স্বামিপ্রেমের মধ্যে যে সংঘাত অন্নদাদিদির জীবনে আসিয়াছে তাহা সে মিটাইতে পারে নাই। ইন্দ্রকে সে ভালোবাসে কিন্তু স্বামীকে রক্ষা করাও তাহার কর্তব্য। ইন্দ্র ও শাহ্‌জীর মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ হইয়া যাইবার পর সে বড় দুঃখে বলিয়াছে, 'ইন্দ্র, এই আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ কর ভাই, আর কখনো এ বাড়িতে আসিস্‌নে! আমাদের যা হবার হোক, তুই আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিসনে!' —স্নেহপরবশ হইয়া একবার স্বামীর প্রতারণার কথা বলিলেও তাহার স্বামিনিষ্ঠাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছে। স্বামীর হীনতার পরিচয় পাইয়াও সে নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত চলিয়া আসিয়াছে—তাহার পাতিব্রত্যের আদর্শই এইরূপ। হাজার অপ্রিয়

কাজ করিলেও স্বামীকে সে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহার অমঙ্গল চিন্তা করিতে পারে না।

শাহ্‌জীর মৃত্যুর পর এই অসামান্যা নারী যেভাবে কঠোর দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহার আভাসমাত্র বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার চরিত্রটি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকান্ত কোনো দিন তাহার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চাহে নাই—ইন্দ্রনাথের তো কথাই নাই। তাহারা এই অতুলনীয়া নারীর সহিত পরিচয়ের ছাপটুকু আপনাদের হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছে। দিদির মহত্ত্ব যে কতখানি তাহা পরিমাপ করিবার প্রয়াস তাহারা কোনো দিন করে নাই। দিদির হৃদয়ের মাধুর্যের ও মহত্ত্বের যে পরিচয় তাহারা পাইয়াছিল তাহাতেই তাহাদের অন্তর পরিপুরিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীকান্ত তাহার জীবনে নারীকে শ্রদ্ধা করিবার, যাহারা নানা কারণে সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত ও অবহেলিত তাহাদের মধ্যেও যে মহত্ত্ব আছে তাহাকে স্বীকার করিবার উপযোগী শিক্ষালাভ করিয়াছে। অন্নদাদিদি তাহার চরিত্রের অপরিসীম মহত্ত্ব দিয়া শ্রীকান্তের হৃদয়ের মধ্যেও উদার পরিসর সৃষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহার পাতিব্রত্যের ধারণা ও অসাধারণ স্বামিনিষ্ঠার কথা শ্রীকান্ত আজীবন স্মরণ রাখিয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির ভঙ্গি ঈষৎ তির্যক্। যাহাকে আমরা তুচ্ছ ও অবহেলিত বলিয়া জানি তাহার মধ্যে অসাধারণত্ব আবিষ্কার করিবার প্রয়াস তাঁহার কবিদৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্নদাদিদি সমাজের বাহ্যদৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ও অবজ্ঞাত বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহার মধ্যে পাতিব্রত্যের যে দীপ্তি আছে শরৎচন্দ্র তাহার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকান্তকে সে যে পত্র লিখিয়াছে তাহাতে সে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছে, 'ভগবান যদি পতিব্রতার মুখ রাখেন, তোমাদের বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে।'—সে যে স্বামীর জন্য লোকনিন্দিত পথ গ্রহণ করিয়াও যথার্থ পাতিব্রত্য ধর্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহার অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস বর্তমান।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, শরৎচন্দ্র পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করিবার জন্য অন্নদাদিদির কাহিনীর অবতারণা করেন নাই। শ্রীকান্ত উপন্যাসে নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিকের পরিচয় দিয়া সমাজের দিক হইতে এবং বাস্তবের দিক হইতে নারীর জীবনে যেসব সমস্যা জাগিয়াছে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কাব্দৃষ্টি সতীত্বের লোকায়ত ধারণাকে নারীত্বের পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করে নাই। বরং সতীত্বের সহিত নারীত্বের সম্পর্ক যে অঙ্গাঙ্গী নয়, ইহা তাঁহার উপন্যাসগুলিতে একাধিকবার ব্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্র রাজলক্ষ্মী বা পিয়ারীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। (দ্বিতীয় পর্বের অভয়া, চতুর্থ পর্বের কমললতা, শেষপ্রশ্ন উপন্যাসের কমল প্রভৃতি চরিত্রও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়) রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের বিবাহিতা পত্নী নয়, বাল্যসঙ্গিনীমাত্র। তাহার অন্তরে যে শ্রীকান্তের প্রতি অনুরাগ ছিল তাহাও শ্রীকান্ত পূর্বে বুঝিতে পারে নাই। তাহার সামাজিক মর্যাদাও নাই—সে সমাজবহির্ভূতা বাইজী মাত্র। অথচ তাহার মধ্যে যে প্রেম সম্ভবপর, তাহার মধ্যে নারীত্বের যে দীপ্তি আছে শরৎচন্দ্র তাহা প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে অন্নদাদিদির মধ্যে যে পাতিব্রত্য আছে শরৎচন্দ্র কেবল সেটুকুকে অবলম্বন করিয়া এই চরিত্রটি চিত্রণ করিতে অগ্রসর হন নাই (সতী স্ত্রীও যে স্বামীর পক্ষে কিরূপ দুর্বিসহ হইতে পারে সতী গল্প তাহার দৃষ্টান্ত)। অন্নদাদিদির মধ্যে নারীত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় শরৎচন্দ্র তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। যাহাকে সে পাতিব্রত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহা হিন্দু নারীর বাহ্য সংস্কার মাত্র নয়, তাহা তাহার অস্থিমজ্জায় বিজড়িত বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছু নয়। যে কোনো হিন্দু-নারী স্বামীর জন্য ঐভাবে ধর্ম, সমাজ সব কিছু বিসর্জন করিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে—বিশেষ করিয়া শাহ্জীর মতো জঘন্য চরিত্রের পুরুষের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ আদর্শের দিক দিয়া সংগত কিনা সে

বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশও রহিয়াছে। শরৎচন্দ্র অন্নদাদিদির চরিত্রে যে উপাদানটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা পাতিব্রত্য নয়, তাহা প্রেম—স্বামী নামক সংস্কারকে অবলম্বন করিয়া তাহা পুষ্ট হয় নাই, তাহা একটি পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে।

মেজদা ও নতুনদা চরিত্র দুইটি বর্ণনা করিয়া এই দুইটির চরিত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্রের যে জীবনদৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরিচয় দাও।

মেজদা শ্রীকান্তের সহোদর অগ্রজ নয়, তাহার পিসতুতো দাদা। শ্রীকান্ত কেশব ও যতীন তিনটি বালক তাহার সঙ্গে একই ঘরে পড়াশোনা করিত। মেজদা নিজে তাহাদের পড়াশোনা তত্ত্বাবধান করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। সে নিজে বার দুই এণ্টান্স পরীক্ষায় ফেল করিয়া তৃতীয় বার পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। নিজের পড়া যাহাই হোক না কেন সে এই বয়ঃকনিষ্ঠ ছাত্রদের প্রচণ্ড শাসন করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। তাহার অত্যাচারের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীকান্ত বলিয়াছে, "মেজদা তাহার অগ্রজের অধিকারে ছোটদের সমস্ত অধিকার গ্রাস করিয়াছিল,...বস্তুত, মেজদার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না; রবিবারের দুপুর রৌদ্রে এক মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তাঁহার তাসখেলার বন্ধু ডাকিয়া আনিতে হইত। গ্রীষ্মের ছুটির দিনে তাঁহার দিবানিদ্রার সমস্ত সময়টা পাথার বাতাস করিতে হইত, শীতের রাত্রে তিনি লেপের মধ্যে হাত পা ঢুকাইয়া কচ্ছপের মত বসিয়া বই পড়িতেন, আর আমাদিগকে কাছে বসিয়া তাহার বহির পাতা উল্টাইয়া দিতে হইত—এমনি সমস্ত অত্যাচার! অথচ বলিবার যো নাই, কাহারও কাছে অভিযোগ করিবার সাধ্য পর্যন্ত নাই। ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেও তৎক্ষণাৎ হুকুম করিয়া বসিতেন, কেশব, তোমার জিয়োগ্রাফি আনো, পুরানো পড়া দেখি। যতীন, যাও; একটা ভাল দেখে বেতের ছড়ি আনো। অর্থাৎ প্রহার অনিবার্য।"

ছোটদের উপর অত্যাচার করিলেও মেজদার নিজের বিন্দুমাত্র সাহস

বা মানসিক শক্তি ছিল না। 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'-বেশী ছিনাথ বহুরূপীকে দেখিয়া সে 'একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুৎ-বেগে···দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া' দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।—শ্রীকান্ত যখন নৌকা হইতে ফিরিয়াছে তখন সে তাহার শারীরিক অসুস্থতার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। শ্রীকান্তর পিসিমা যখন তাহাকে খাওয়াইয়া শুইতে যাইবার জন্য লইয়া যাইতেছিলেন তখন সে চীৎকার করিয়া শ্রীকান্তকে ধমক দিয়া বলিয়াছে 'খবরদার! যাস্‌নে বলছি শ্রীকান্ত।' কিন্তু পরক্ষণেই সে তাহার মায়ের তিরস্কারে একেবারে চুপ হইয়া গিয়াছে।—তাহার মধ্যে যে একটা প্রভুত্ববোধ ছিল সে তাহা অন্যায়ভাবে খাটাইয়াছে। সে স্বার্থপরের মতো কয়েকটি অল্পবয়স্ক বালকের উপর অত্যাচার করিয়াছে—তাহাদের প্রতি মমতা ছিল না বলিয়া সে তাহাদের সত্যকার তত্ত্বাবধান করে নাই। সেইজন্য সামান্য তিরস্কারেই সে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িয়াছে।

নতুনদাও শ্রীকান্তের নিজের দাদা নয়—সে ইন্দ্রনাথের মাস্‌তুতো দাদা। মেজদার মধ্যে যাহা ছিল তাহাকে স্বার্থপরতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু নতুনদার মধ্যে স্বার্থপরতার সহিত একটা ঘোরতর নীচতা সংযুক্ত ছিল। নতুনদার সহিত শ্রীকান্তের পরিচয় বেশিদিনের নয়—মাত্র কয়েক ঘণ্টার। কিন্তু সেই স্বল্প কালের মধ্যেই সে নতুনদার যে পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার চিত্তে গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। একদিন শীতের সন্ধ্যায় ইন্দ্র ও শ্রীকান্ত তাহাকে নৌকা করিয়া একটি শখের থিয়েটারে হার্মোনিয়াম বাজাইবার জন্য লইয়া যাইতেছিল। প্রথম দৃষ্টিতেই শ্রীকান্ত তাহার পোষাকের ঘটা দেখিয়া ভয় পাইয়াছে—'কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চক্‌চকে পাম্প-সু আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই।'—শ্রীকান্তের সহিত তাহার পরিচয় না থাকিলেও সে দাঁত খিঁচাইয়া শ্রীকান্তকে

তামাক সাজিতে বলিয়াছে। নিজে আপাদমস্তক আবৃত হইলেও সে শ্রীকান্তের একমাত্র র‍্যাপারটিকে পাতিয়া বসিবার জন্য চাহিতে দ্বিধাবোধ করে নাই।—হাওয়া পড়িয়া গেলে নৌকা অচল হইলে শ্রীকান্ত যখন ইন্দ্রকে গুণ টানিবার কথা বলিয়াছে, তখন নতুনদা দাঁত মুখ ভ্যাংচাইয়া তাহাকে গুণ টানিতে বলিয়াছে। এই প্রসঙ্গটি বর্ণনা করিয়া শ্রীকান্ত বলিয়াছে,

"তারপরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নিচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে হালটা ধরিতে বলায়, জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করতে পারবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেল, না খুলে—

হাঁ দামী দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর কি! নে—যা করছিস্, কর।

বস্তুত আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম। পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে একফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে চাঁড়লে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।"

এই নতুনদার প্রসঙ্গ অবশ্য একটি কৌতুককর পরিণতিতে শেষ হইয়াছে—কুকুরের ভয়ে নতুনদার যে দুর্গতি হইয়াছিল তাহা শ্রীকান্ত তাহার দুর্ব্যবহারের উপযুক্ত শাস্তি বলিয়াছে। বাহিরে সপ্রতিভতা দেখাইলেও নতুনদা ভিতরে

যে সব দিক দিয়া অন্তঃসারশূন্য শ্রীকান্ত যেন তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে। গঙ্গায় নৌকাযাত্রা করিবার সময় প্রায় মধ্যরাত্রে তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ আহার অন্বেষণের জন্য গ্রামের মধ্যে গিয়াছে। নতুনদা তীরে উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে সংগীত চর্চা করিলে কয়েকটি কুকুর তাহার বিচিত্র বেশ ও বিচিত্র সংগীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে তাড়া করিয়াছে। এই অভাবিত বিপদে বিপর্যস্ত হইয়া নতুনদা তাহার পোষাকশুদ্ধ গঙ্গার জলে নামিয়া কোনো মতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু সেই বিপদ কাটিয়া যাওয়া মাত্রই সে পূর্বের প্রকৃতি ফিরিয়া পাইয়াছে।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের মধ্যে শরৎচন্দ্র মানবচরিত্রের বিভিন্ন দিক দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহার বাল্যসঙ্গী ইন্দ্রনাথ সরলতা ও উদারতার প্রতিমূর্তি। নতুনদা তাহার বিপরীত চরিত্রের প্রতিমূর্তি—মেজদার মধ্যে তাহার পূর্বাভাস আছে মাত্র। মেজদার মধ্যে কর্তৃত্ব ফলাইবার একটা ইচ্ছা ও স্বার্থপরতা আছে। কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে সে মানুষ হইয়াছে তাহাতে তাহাকে নীচতার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। নতুনদার চরিত্রের মধ্যে তাহার নীচতাই সব চেয়ে বেশী করিয়া চোখে পড়ে। মানুষ যে মানুষকে কতখানি তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে নতুনদার ব্যবহারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে অসজ্জন ও পাষণ্ড চরিত্র অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু নতুনদার মতো এমন অভদ্র চরিত্র আর দেখা যায় না। কি করিয়া যে লোকের সঙ্গে ভালো করিয়া কথা বলিতে হয় তাহাই যেন সে জানে না। প্রতিপদে দাঁতমুখ ভ্যাংচানি ও অপরকে তুচ্ছ করিয়া কথা বলার মধ্যে তাহার প্রকৃতিগত নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে।—অবশ্য তাহার আচরণের মূলে যে পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবও যে কিছুটা ছিল, শ্রীকান্ত তাহার আভাস দিয়াছে। তাহার মতো অন্তঃসারহীন বাবু কলিকাতায় সে কালে দেখা যাইত—বাংলার বাহিরের বাঙালী ছেলেদের প্রতি সে যে মনোভাব পোষণ করে তাহা কলিকাতার অনেক বাবুই করিয়া থাকে

অবশ্য এমন স্বার্থপরের মতো অপরকে খাটাইয়া লইবার মতো বা তাহাদের প্রতি অহেতুক দুর্ব্যবহার করিবার মতো নীচতা সকলের থাকে না। শরৎচন্দ্র তাহার মধ্য দিয়া মানবচরিত্রের নীচতার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও তাঁহার জীবনদৃষ্টির অন্তর্গত।

শ্রীকান্তের নিকট অন্ধকারের মোহন রূপ কীভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

অন্ধকারের যে একটি রূপ থাকিতে পারে সেই সত্য একদিন শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। অনন্ত অন্ধকারের দিগন্ত বিস্তৃত আবরণ উন্মোচন করিয়া তিনি সেই রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

সিঁড়ির আবছায়া অন্ধকারে শ্রীকান্ত গ্রামের বহু প্রাচীন অসংস্কৃত পুষ্করিণীর ভাঙা সিঁড়িতে বসিয়াছিলেন। জনমানবহীন সন্ধ্যার স্তব্ধতার মধ্যে ঐরূপ বসিয়া থাকিতে থাকিতে সময়ের দিকে তাঁহার কোনো লক্ষ্যই ছিল না। হঠাৎ কাহার পদধ্বনিতে তাঁহার তন্ময়তা কাটিয়া গেল। সমস্ত শক্তি সংহরণ করিয়া শ্রীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। এতক্ষণ শ্রীকান্ত বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন গ্রামটির অতীত অবস্থার কথা, একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের মহামারীতে কী শোচনীয় পরিণাম আর সেই মৃত্যু ও আত্মার কথা, জীবন-মরণের রহস্যের কথা। এমনি সময় সেই নীরবতার মাঝখানে কাহার পদধ্বনি! শ্রীকান্ত রাত্রির অন্ধকারে পদধ্বনি অনুসরণ করিয়া ক্রমাগত চলিয়াছেন। পথের যেন শেষ নাই। তাঁহাদের তাঁবুরও কোন দর্শন মিলিতেছে না। সম্মুখে একটি বাঁশঝোপ দেখিতে পাইয়া বুঝিলেন এ-পথে তিনি আসেন নাই। দিক ভুল হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি প্রথমে ভয় পাইলেন। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিলেন কতকগুলি তেঁতুল গাছ জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাছের নিচ দিয়া গাঢ়তর অন্ধকারে পথ চলিতে তাঁহার গা ছমছম করিতে লাগিল। অসীম সাহস সঞ্চয় করিয়া কোনো মতে সেই স্থানটি পার হইয়া সম্মুখেই উন্মুক্ত প্রান্তরের

অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখিতে পাইলেন সরকারী বাঁধ। ~~বাঁধের নিকট মহাশ্মশান।~~ ক্লান্ত দেহে কোনোপ্রকারে বাঁধের উপরে উঠিয়াই শ্রীকান্ত গা এলাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন ; পদধ্বনি শ্মশান পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেল।

এতাবৎকাল শ্রীকান্তের প্রেতযোনিতে কোন বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু কেন যেন আজ তাঁহার মনে হইতে লাগিল এই অভূতপূর্ব ব্যাপারে প্রেতযোনির কোনো ইঙ্গিত আছে। নতুবা পোড়ো দীঘির শ্মশান হইতে এই মহাশ্মশান পর্যন্ত অদৃশ্যের পদধ্বনিকে তিনি অনুসরণ করিলেন কেন? ভয়ে তাঁহার চৈতন্য লোপ পাইতে বসিল। তন্দ্রার ঘোরে অর্ধচৈতন্য অবস্থায় শ্রীকান্ত প্রভাত আলোর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এস্থান তাঁহার অপরিচিত। এই অন্ধকারে তাঁবুর সন্ধানে বাহির হওয়াও বৃথা। পরন্তু যাহার অজ্ঞাত আকর্ষণে তিনি এখানে আসিয়াছেন তাহার কৃপা ভিন্ন মুক্তিলাভের কোনো উপায় নাই। সুতরাং বসিয়া বসিয়া কালক্ষেপ করা ভিন্ন আর কোনো গতি নাই। এই অবস্থায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা গভীর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন তামসী রজনী তাহার নটমঞ্চের যবনিকা উন্মোচন করিয়া শ্রীকান্তের নয়নসম্মুখে উপস্থিত হইল।

তিনি চাহিয়া দেখিলেন দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকারময় আকাশতলে রজনী ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছে, বিশ্বপ্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া শান্তিরক্ষা করিতেছে। শান্ত সৌন্দর্যের এক মহিমময়ী শক্তি শ্রীকান্তের অন্তরবাহির আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অন্ধকারের যে একটি বিশেষ রূপ আছে, লক্ষ আলোর রূপের তুলনায় কোনো অংশে তাহা যে হেয় নহে, তাহা আজ শ্রীকান্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। লোকে বলে আলোর রূপ আছে, আঁধারের রূপ নাই, এ কথা যে কত বড় ভুল তাহা আজ ধরা পড়িল। অন্ধকারের রূপের প্লাবনে দশদিক একাকার। বিশ্বে যাহা কিছু গভীর, যাহা কিছু অসীম সকলই অন্ধকারময়। সৃষ্টির আদি রহস্য অন্ধকারে আবৃত। শ্রীকান্তের সর্ব দেহমন এই অপূর্ব রূপ দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য শ্মশানের

ভয় দূরীভূত হইয়া গেল। মহানন্দস্রোতে এই বিভীষিকাময় রাত্রির আতঙ্ক কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল আজই যদি জীবনের শেষদিন হয় তবে অন্ধকারের ঐ ভুবনমোহন রূপ দেখিতে দেখিতে তিনি আনন্দে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবেন। আঁধারের রূপচ্ছটায় উন্মত্ত হইয়া তিনি মহাশ্মশানের ঠিক মাঝখানে গিয়া বসিলেন। নয়ন ভরিয়া সেই রূপ অবিশ্রান্ত পান করিয়াও যেন তৃপ্ত হন নাই। এইভাবে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে. সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই, যখন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। পূর্বাকাশে শুকতারার ক্ষীণ আলোকটুকু তখনো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। তিনি চাহিয়া দেখিলেন দুইটি গরুর গাড়ি ও কয়েকজন লোক বাঁধের উপর দিয়া ষ্টেশনে যাইতেছে। যাত্রীরা এরূপ স্থানে এই সময়ে এভাবে একজনকে দেখিলে ভয় পাইতে পারে মনে করিয়া তিনি মহাশ্মশানে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে ইহার নায়ক চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা কর।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্ত—সে নিজেই এই কাহিনীর কথক। সে উপন্যাসের কথক হইলেও নিছক বর্ণনাত্মকভাবে কাহিনীটি বিবৃত করিয়া যায় নাই বা উচ্ছ্বসিতভাবে আপনার ভাবগুলিকে বিশ্লেষণ করিতেও চেষ্টা করে নাই। তাহার বর্ণনাগুলি তাৎপর্যময়—সে যে সব আলোচনা করিয়াছে তাহা নিজেকে লইয়া নয়, পরকে লইয়া।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের কথক হওয়ায় কথাসাহিত্যিকের নিরাসক্তি কতক পরিমাণে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে। সে যে নিজের কথা বেশী করিয়া বলে নাই, ইহার কারণ এই যে, লেখক শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসের মধ্যে আত্মগত ভাব বিশ্লেষণকে তেমন আমল দিতে চাহেন নাই—তাঁহার দৃষ্টি বস্তুমুখী হওয়ায় তিনি উপন্যাসের অন্য পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র-চিত্রণেই অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন, তবুও শ্রীকান্ত চরিত্রটি কেবল মাত্র দ্রষ্টা হইয়া থাকে নাই—

উপন্যাসের মধ্যে তাহার একটা স্থান আছে, তাহার চরিত্রের মধ্যেও একটা অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে শ্রীকান্ত চরিত্রটির দুইটি স্তর—একটি স্তরে শ্রীকান্ত বালক অপরটিতে শ্রীকান্ত যুবক। অবশ্য এই দুই স্তরে শ্রীকান্ত চরিত্রের মধ্যে কোনো মূলগত পার্থক্য দেখা দেয় নাই—যেন দুইটি পর্বে চরিত্রটি দুই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এইমাত্র। বিশেষত বুড়ো বয়সে স্মৃতিকথা বলিতে যাওয়ার ভঙ্গিটি গ্রহণ করায় এই চরিত্রটির বিকাশের স্তরটি তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

শ্রীকান্ত চরিত্রের প্রথম পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে ইন্দ্রের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ ক্ষেত্রে। খেলার মাঠে মারামারি হইলে শ্রীকান্তকে কয়েকজন ঘেরিয়া ধরে। ইন্দ্র সেই সময় তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে। এই সময় ইন্দ্র যখন তাহাকে পলাইতে বলিয়াছে, সে ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে সে কী করিবে। ইন্দ্র তাহাকে বলিয়াছে, 'তুই পালা না গাধা কোথাকার।' এই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকান্ত বলিয়াছে, 'গাধাই হই আর যাই হই, আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম, না। ...ইতিপূর্বে এ ভাবে দল বাঁধিয়া মারামারিও করি নাই, এমন আস্ত দুটা ছাতির বাঁট পিঠের উপর কোনো দিন ভাঙে নাই। তথাপি একা পলাইতে পারিলাম না।'—শ্রীকান্ত যে ভীরু ছিল না, এই ঘটনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথের মতো দুর্জয় সাহস অবশ্য তাহার ছিল না, কিন্তু সে যে ঐ অসীম সাহসী কিশোরটির শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র ছিল তাহা এই ঘটনায় ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার পরে ইন্দ্রের সহিত নৌকা যাত্রার সময় বা পরিণত বয়সে একা শ্মশান যাত্রার সময় সে আপনার ভয় করার কথা বলিয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণের সহিত তাহার পার্থক্য যে কতখানি তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। তাহার সাহসের পরিচয় পাইয়াই ইন্দ্র তাহাকে নৌকাযাত্রার সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল।

শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথকে একরূপ প্রথম দর্শনেই ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিল —পরে অন্নদাদিদির প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা প্রথম দর্শনেই জাগিয়াছে। পরবর্তী জীবনে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে ভালোবাসিয়াছিল বটে, কিন্তু সে ভালোবাসার কথা এমন করিয়া প্রকাশ করে নাই।—ইন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণের কারণ তাহার অকপট সহৃদয়তা ও উদারতা। অন্নদাদিদির সন্ন্যাসিনী মূর্তি তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে—তাঁহার মিষ্ট কথা সেই আকর্ষণ গভীরতর করিয়া দিয়াছে। পরে অন্নদাদিদির পূর্ণতর পরিচয় যখন সে পাইয়াছে, তাঁহার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে। পরে রাজলক্ষ্মীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর অন্নদাদিদির কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকান্ত বলিয়াছে—তখন মনের মধ্যে এ বিশ্বাস হিমালয়ের মত দৃঢ়ও ছিল, আমাকে ভুলাইতে পারে, এমন নারী ত ইহলোকে নাই-ই পরলোকে আছে কি-না, তাহাও ভাবিতে পারিতাম না। মনে করিতাম জীবনে যদি কখনো কাহারো মুখে এমনি মৃদু কথা, ঠোঁটে এমনি মধুর হাসি, ললাটে এমনি অপরূপ আভা, চোখে এমনি সজল করুণ চাহনি দেখি তবে চাহিয়া দেখিব। যাহাকে মন দিব, সেও যেন এমনি সতী, এমনি সাধ্বী হয়। প্রতি পদক্ষেপে তাহারও যেন এমনি অনির্বচনীয় মহিমা ফুটিয়া উঠে, এমনি করিয়া সেও যেন সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত ভালমন্দ সমস্ত ধর্মাধর্ম ত্যাগ করিয়াই গ্রহণ করিতে পারে।

মনের মধ্যে এই বিশ্বাস থাকার জন্যই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে প্রথম হইতে গ্রহণ করিতে পারে নাই। পিয়ারী বাইজী তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলিতেছে দেখিয়া সে বিরক্তই হইয়াছে। পরে তাহাকে চিনিতে পারিলেও বা তাহার প্রেমের পরিচয়লাভ করিলেও সে তাহাকে যেন একটু সন্দেহের চোখেই দেখিয়াছে, অসংকোচে তাহার নিকট হৃদয় উন্মোচন করিতে সে পারে নাই। পরে রাজলক্ষ্মীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, কিন্তু কিসের যেন একটা অন্তরাল উভয়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য ব্যবধান রচনা

করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল যাহার জন্য সে একবার শ্রীকান্তকে একান্তভাবে আপনার বলিয়া মনে করিয়া টানিয়া লইতে চাহিতেছে আবার পর মুহূর্তেই তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। শ্রীকান্তের মধ্যেও একটা সংশয় রহিয়াছে। সে রাজলক্ষ্মীর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে কোনো দিনই পারে নাই। তাহার আদর্শ ও বিশ্বাস তাহাকে বারবার আত্মগোপন করিতে প্ররোচিত করিয়াছে।

শ্রীকান্তের প্রকৃতির মধ্যে যে একটা উদাসীনতা ছিল তাহাও তাহার এই মনোভাবের জন্য কতকটা দায়ী। সে নিজেকে 'ভবঘুরে' বলিয়াছে। বস্তুত কোনো বিষয়ের প্রতি তাহার একান্ত আসক্তি ছিল না। তাহার উদাসীন চিত্ত বারবার সমস্ত বন্ধন উপেক্ষা করিয়াছে। কৈশোরে সে নিতান্ত সহসাই পিসিমার বাড়ির সমস্ত শাসনের কথা ভুলিয়া গিয়া ইন্দ্রনাথের সহিত নৌকায় গিয়াছে। বিনা আড়ম্বরে সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিতে সে দ্বিধাবোধ করে নাই আবার বিনা দ্বিধায় সে ঐ সন্ন্যাসীর দল ত্যাগ করিয়াছে! তাহার প্রকৃতির মধ্যে একটা বৈরাগ্য ছিল বলিয়াই রাজলক্ষ্মী তাহাকে বাঁধিতে পারে নাই। জীবনের প্রতি শ্রীকান্তের একটা আসক্তি ছিল সন্দেহ নাই, না হইলে সে কোনো দিনই ঘরে থাকিত না; কিন্তু এমন একটা উদাসীনভাব তাহার সমস্ত আসক্তির মূলে বাসা বাঁধিয়াছিল যে, সে জীবনের বন্ধনে বাঁধা পড়ে নাই। রাজলক্ষ্মীকে কতকটা এইজন্যই সে সবলে গ্রহণ করিতে পারে নাই বা চাহেও নাই। রাজলক্ষ্মীর প্রতি অনুরাগ ক্রমশ তাহার হৃদয়ে গাঢ়তর হইয়া উঠিলেও সেইজন্যই সে রাজলক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া পাটনা হইতে অনায়াসেই চলিয়া যাইতে পারিয়াছে। বস্তুত আসক্তির সহিত ঔদাসীন্যের সমন্বয় হইয়াছিল বলিয়াই আমরা উপন্যাসটির মধ্যে দ্রষ্টা শ্রীকান্তকে দেখিতে পাই।

রাজলক্ষ্মীর চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের চারিটি পর্বের মধ্যে প্রধান চরিত্র রাজলক্ষ্মী। এই উপন্যাসখানির "প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্যন্ত লেখক হিন্দু-সমাজ ও নারীর

জীবনে এই দুয়ের সম্পর্কে তাঁহার অনেক কথা হৃদয়ের রক্তাক্ষরে লিখিয়াছেন—এবং নারীর সেই জীবনের যত কিছু দুর্গতিই এই উপন্যাসটিকে এমন করুণ করিয়া তুলিয়াছে। শরৎচন্দ্র এই সকলের মধ্যে ঐ রাজলক্ষীর ছবিখানিই একটু বড় করিয়া একটু সম্পূর্ণ করিয়া আঁকিয়াছেন; সে চরিত্রের বিকাশ আছে, পরিণতি আছে। আবার এই চরিত্রের সম্পর্কেই শ্রীকান্ত নিজের আত্মপরিচয় অজ্ঞানে একটু বেশি করিয়াই দিয়াছে। আমি কিন্তু এই রাজলক্ষীর মধ্যে বাঙালী মেয়ের অতিশয় সুস্থ ও সবল হৃদয়ের সর্বাঙ্গীন বিকাশ দেখিয়াছি; তাহার শক্তি ও দুর্বলতা, তাহার সহজ হৃদয়বৃত্তি, জন্মগত সংস্কার, তাহাদের প্রেমে মধুর ও বাৎসল্যরসের সমান পিপাসা এবং সর্বশেষে, যে-বুদ্ধি নারীর সহজাত—যাহা মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, হৃদয়জাত, যাহার তীক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে পুরুষ একটা শিশুর মতই তুচ্ছ ও নগণ্য হইয়া যায়—এবং যে বুদ্ধি নারীকে এমন আত্মজয়ী ও ত্যাগে মহীয়সী করিয়া তোলে, আমি এই গ্রামসম্ভূতা বাঙালী দুহিতার মধ্যে তাহার যে পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াছি তাহাতে মুগ্ধ হইলেও বিস্মিত হই নাই।

এই যে চরিত্র ইহার একটা রক্তমাংসময় বাস্তব সত্তা আছে। শ্রীকান্ত এই যে নারীকে দেখিয়াছে ও দেখাইয়াছে, তাহাতে কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবের অংশই অধিক, ইহার প্রমাণ—ঐরূপ নারী চরিত্র কোন পুরুষের নিছক কল্পনায় এতখানি বাস্তব হইয়া উঠিতে পারে না, নারীপ্রকৃতির যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি উহাতে আছে তাহা কোন পুরুষের বুদ্ধিগম্য নহে, তাই শ্রীকান্তের বুদ্ধিও বারবার পরাস্ত হইয়াছে। উহার ঐ নারীপ্রকৃতি এমনই অকৃত্রিম যে পুরুষের চক্ষে তাহা একটা প্রহেলিকা—তাহাকে সে দেখে মাত্র, বুঝিতে পারে না, মন দিয়া গড়িতে পারা ত, দূরের কথা। শ্রীকান্ত তাহার প্রেমের পাত্র পাইয়া যে-রূপ আচরণ করিয়াছে তাহাতেও রমণীরহৃদয় ও পুরুষের আত্মাভিমান এই দুইয়ের পার্থক্য সুস্পষ্টই হইয়া আছে; তাহাতেই প্রতীতি হয় যে, শ্রীকান্ত এই নারীকে—ষোল আনা না হউক, বারো আনাও—সংসারের

জনারণ্য হইতেই আবিষ্কার করিয়াছে, এবং ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে।

রাজলক্ষ্মীর জীবন এতই নীতিবিগর্হিত ও সমাজবিরুদ্ধ যে, তাহাকে নারীর সম্মান দেওয়াই—কি সাহিত্যিক কি সামাজিক সুনীতির দিক দিয়া—একরূপ অপরাধ বলিলেই হয়। শ্রীকান্ত তাহা জানে, তাই তাহার প্রথম পরিচয়কালে সে তাহাকে যথাযথ রূপেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। আমাদের দেশে ঐরূপ কুলহীনা স্বৈরিণীরও, কলাবতী হিসাবে, এক প্রকার প্রতিষ্ঠা আছে; কিন্তু সেই বৃত্তিটার প্রতিও কিছু সম্ভ্রম উদ্রেক না করিয়া এমন স্থানে ও এমন উপলক্ষ্যে এবং এমন শ্রেণীর রসিক সংসর্গে তাহাকে সে টানিয়া আনিয়াছে যে, ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রতি পাঠকের যেটুকু শ্রদ্ধা হইতে পারে সে যেন তাহার বেশী আবশ্যক মনে করে না। স্থান, কাল, পাত্রের কি অপূর্ব যোজনা!…শ্রীকান্ত কিন্তু ঐ কুলহীনা গীতবাদ্য-ব্যবসায়িনী রমণীকে, প্রথম দর্শনে, তাহার মনের যথাস্থানেই বসাইয়াছে; আমাদের নিকটেও সে নিজের বা দলের কাহারও জন্য এতটুকু খাতির চায় না। ইহাই হইল এ নাটকের প্রস্তাবনা ও প্রথম দৃশ্য।

কিন্তু ঐরূপ ভূমিকা যে নিপুণ শিল্পীর কতখানি শিল্পচাতুর্যের পরিচায়ক একটু পরেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। ঐরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সে যে সাধারণী নারীকে অবতীর্ণ করিয়াছে তাহার মধ্যেও যে একটা অসাধারণত্ব আছে—শ্রীকান্তের নিজেরই সেই বিস্ময়বিমূঢ়তা এমন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং তাহার বিবরণ এমনই যে, আমরাও যেমন চকিত তেমনই কৌতূহলাক্রান্ত হই—অতি শীঘ্রই পিয়ারী বাইজী রহস্যময়ী হইয়া উঠে; সে যে শুধু বাইজী নয়, আরও কিছু এ সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হয়। শেষে তাহার মধ্যে যে এক হৃদয়বতী ও উচ্চাশয়া নারী স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হই। কিন্তু সেই নারী কি সতী? অর্থাৎ তাহার চরিত্র যতই দৃঢ় হউক, ঐরূপ জীবনযাপন সত্ত্বেও, তাহার দেহ-মন কি এমনই সংস্কারমুক্ত

যে, সম্পূর্ণ স্বস্থ হইতে পারে? কল্পনায়, ভাবচিন্তার উদার উর্ধ্বগ মার্গে সকলই সম্ভব; কিন্তু দেহের ক্ষেত্রে—বাস্তবে? এই প্রশ্নও প্রথম হইতেই উদ্যত হইয়া উঠে—ইহাই যেন এ কাহিনীর একটা মূল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর রাজলক্ষ্মী তাহার সমগ্র জীবন দিয়াও দিতে পারে নাই; শ্রীকান্ত নিজে সে বিষয়ে একটা কঠিন মৌন রক্ষা করিয়াই প্রশ্নটাকে যেমন জটিল, কাহিনীকেও তেমনই রসঘন করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীকান্ত তাহার সেই বাইজী জীবনের ইতিহাস মাঝে মাঝে ইঙ্গিতে আভাসে ব্যক্ত করিয়াছে। যেকালে তাহার সহিত শ্রীকান্তের ঐ আকস্মিক পুনঃ পরিচয় ঘটিয়াছিল, তখন সে অনেকটা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে; তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তখন সে আত্মবিক্রয়ের প্রয়োজন বা বাধ্যতা হইতে প্রায় মুক্ত হইয়াছে। ইতিপূবে তাহার জীবন যে পঙ্কিল স্রোতে বহিয়াছিল, সেই অভ্যস্থ জীবনের কতকগুলি বাহ্যিক আচার সে এখনও ত্যাগ করে নাই। তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই; সে যে তাহার বৃত্তিগত সেই গীতবাদ্যের রসচর্চা ত্যাগ করে নাই, তাহার একাধিক কারণ ছিল। একটা বড় কারণ এই যে, ঐ সঙ্গীতকলার অনুশীলনই রূপোপজীবিনী বাইজীর পক্ষে আত্মমর্যাদা-বোধের একমাত্র সহায়—ঐ সঙ্গীতই ছিল তাহার প্রাণের ভাষা; সে প্রয়োজন শুধুই হাহাকার-নিবারণের নয়—পরমসুন্দরের আরাধনায় আত্মার পিপাসা-তৃপ্তি ও পরিপুষ্টির জন্যও বটে।

কাহিনীর মধ্যে আর একটু অগ্রসর হইলেই আমরা দেখিতে পাই, এতদিনে রাজলক্ষ্মী একটা সংসার পাতিবার আয়োজন করিয়াছে; সেই সংসারের সে যেমন গৃহিণী, তেমনই উপার্জনকারী পুরুষের কাজও তাহারই। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সে জীবনটাকে একরকম গুছাইয়া লইয়াছে। পতিতা নারী—সমাজে তাহার স্থান নাই; তথাপি সে যে ধনসম্পদের অধিকারিণী হইয়াছে (বোধ হয়, এই জন্যই ঐ বৃত্তিটা এখনও ত্যাগ করে নাই)—সে জানে সেও একটা শক্তি; সেই শক্তির অতিসতর্ক ও নম্রতাপূর্ণ ব্যবহারে

সে সমাজকে বশীভূত করিয়া, তাহারাই এক কোণে একটু সংসার গড়িয়া লইবে—নারীজীবনের একটা স্বাভাবিক পিপাসা মিটাইবে। তাই সে তাহার বহু বিবাহকারী কুলীন স্বামীর অন্যতমা এক বিধবার পুত্রকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, শাস্ত্র ও হৃদয় দুইয়েরই সমর্থনে, তাহার উপরে মাতৃত্বের অধিকার সাব্যস্ত করিয়া, তাহাকে লইয়াই সংসার পাতিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর মত অবস্থায়, নারীত্ব গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার—ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর কি হইতে পারে? ঐ একটিতেই তাহার বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় মিলিবে। জীবনের একটা ভাগ সে ক্রীতদাসীর মত পণ্যরূপে বিলাইয়া দিয়াছে, তাহার দেহের রূপ ও মনের কলাকুশলতা পরের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছে; তখন আত্মবিস্মৃতিই ছিল তাহার একমাত্র সম্বল। সে জীবন যে কি, তাহা সে জানিত; বোধ হয়, এই নিদারুণ সত্য ঐ শ্রেণীর সকল নারীই অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভব করে, শেষে সেই চেতনাকে রুদ্ধ করিয়া বা একেবারে হত্যা করিয়াই পরিত্রাণ পায়। রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যবিধাতা এ বিষয়ে তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন—সেই আত্মচেতনা সুপ্ত হইলেও লুপ্ত হয় নাই। অতঃপর রাজলক্ষ্মী তাহার ভাঙা জীবনটাকে কোন রকমে জোড়া দিয়া বাকিটার জন্য একটা ছক তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। সে প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে; সে বিশ্বাস করে, পুরুষের মত নারীর পদস্খলনেও ক্ষমা আছে; নিজের আত্মাকে সে নিজেই উদ্ধার করিবে।

কিন্তু সে কাজ ত সহজ নয়—সহজ হয়, যদি হৃদয়ের ভিতরে কোন উৎপাতের কারণ না থাকে। অতি কঠিন মনোবল বা আত্মশক্তির দ্বারা একটা সুনির্বাচিত নীতিমার্গে জীবনকে জয় করা দুঃসাধ্য নয়; কিন্তু প্রাণ যে বাদ সাধে। ঐ প্রাণকে যাহারা হত্যা করিতে পারে না—সেই প্রাণের প্রাক্তন ব্যাধি যদি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দুশ্চিকিৎস্য হয়—তাহা হইলে জীবনের জমা-খরচ এমন নির্ভুলভাবে হিসাব করিতে গেলে অলক্ষ্যে বিধাতা হাসিয়া উঠে। রাজলক্ষ্মী পুরুষের চেয়েও বুদ্ধিমতী, তথাপি সে নারী; সেই নারী প্রকৃতিতে

ঐরূপ একটা কিছু যদি নাই থাকিবে, তবে এমন কাহিনীর সৃষ্টি হয় কেমন করিয়া? পিয়ারী বাইজীর সর্বাঙ্গ ভরিয়া এতদিন যে বহ্নি চতুর্দিকে স্ফুলিঙ্গ বিকিরণ করিতেছিল, তাহাকে সে যে আরেক অগ্নিতে শীতল করিয়াছিল। সেই অগ্নি অনির্বাণ হইয়া আছে। দেহে যখন যৌবন অনাগত তখন তাহার কিশোরী-হৃদয়ে সেহ যে আগুনের পরশ লাগিয়াছিল—সে যে যৌবনের অমৃত-পরশ। সে অগ্নির পরশ এমনই গোপনে ঘটিয়াছিল যে, দ্বিতীয় ব্যক্তিও তাহা জানিতে পারে নাই। সে যেন একান্তই তাহার নিজের; সংসার নয়, সমাজ নয়, বোধ হয় ভগবানও নয়—কেহই তাহার সাক্ষী ছিল না। সে প্রেম এমনই যে, তাঁহার মন্ত্রটাই রাজলক্ষ্মীর গুরু হইয়াছে, আর কোন গুরুর আবশ্যক হয় নাই। তাই সে এমন নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। ভিতরের সেই গুরু এবং বাহিরের ঐ সংসার, এই দুইয়ের পৃথক দাবী এক নূতনতর সাধনায় সে মিলাইয়া লইয়াছে। অন্তরে কোন অভাব নাই, কোন বন্ধন নাই, কাহারও মুখাপেক্ষা নাই; বাহিরে ঐ কর্মবন্ধনও একপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান: সেই যজ্ঞকালীন যে নিত্য স্নান, তাহাতেই সে তাহার দেহজাত যত কিছু অশুচিতা ধৌত করিয়া ফেলিবে; রাজলক্ষ্মী তাহাই মনে করিয়াছিল।

কিন্তু রাজলক্ষ্মী ভুল করিয়াছিল—সে তাহার হিসাবে প্রাক্তনকে বাদ দিয়াছিল। কাব্যে নাটকে যেমন, জীবনেও তেমনই, দৈবের মত শক্তিমান আর কিছুই নয়; হিন্দু যাহাকে প্রারব্ধের দুর্লঙ্ঘ্য ও যথাকাল সমাগত পরিণাম বলে—দৈব তাহাই। রাজলক্ষ্মীর জীবনে দৈবের লীলা অল্প নহে। তাহার কিশোরী বয়সে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাও যেমন অতিদূর প্রাক্তনের ফল, তেমনই এতকাল পরে আবার যাহা ঘটিল তাহাও সেই নিয়মের বহির্ভূত নহে।...তাহার অপ্রবুদ্ধ জীবনের অতিপ্রবুদ্ধ প্রেম যে নিয়তির মতই অভ্রান্ত ও দুর্লঙ্ঘ্য, তাহা সে তখনই বুঝিয়াছিল, পরে একদিনের জন্যও তাহা বিস্মৃত হয় নাই।...এতদিন যাহাকে সে মনের আড়ালে রাখিয়াছিল, যাহার অস্তিত্বও সে ভুলিয়াছিল, সহসা সে একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।...

তথাপি বাহিরের ঘটনা যতই বিস্ময়কর হউক, ভিতরের ঘটনা আরও অভূতপূর্ব। যে তাহার জীবনের এতখানি অধিকার করিয়া আছে, যে তাহার পরম সুখ ও চরম দুঃখের উৎস, সে তাহাকে জানে না। প্রেমের সেই মন্ত্র-দীক্ষা দান নয়—সে ছিল নিমিত্তমাত্র। রাজলক্ষ্মী তাহাকে জানে—তেমন জানা আর কেহ তাহাকে জানে না; জানিয়াও সেই উদাসীন সর্বস্বার্থবিমুখ দুর্দমনীয় প্রকৃতির মানুষটিকে সারা প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল; ভালবাসা এমনই আশ্চর্যজনক বটে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর প্রেম অন্ধ বলিয়া মনে হয় না,—শ্রীকান্ত সম্বন্ধে সে কিছুমাত্র ভুল করে নাই।···রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে জানিয়া শুনিয়াই বরণ করিয়াছে দোষগুণ সমেত তাহার সেই ব্যক্তিত্বটার অনুরাগিনী হইয়াছে।··

রাজলক্ষ্মী তাহার আত্মগত গভীর পিপাসাকে,·নিজ অন্তরে ধারণ করিয়া, চিত্তকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছিল। সেই প্রেম একটা শক্তিরূপে—রক্ষা-কবচের মতই—সকল অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও তাহাকে শ্রেয়ের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই। এই প্রেমই তাহার গুরু, তাহার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।···গুরুকে সে মাথার উপরে রাখিয়াছে, কিন্তু সংসারও তাহার চাই—নারীর জন্মগত সংস্কার যাইবে কোথায়? আর একটা বড় সংস্কার তাহাকে পীড়িত করিয়াছে—নারী জাতির পক্ষে তাহা দুর্লঙ্ঘ্য—দৈহিক শুচিতার সংস্কার; হিন্দু সমাজে উহাই নারীর সতীত্ব সংস্কার। রাজলক্ষ্মী অসতী; তাহার যে চরিত্রের পরিচয় ইতিমধ্যে আমরা পাইয়াছি, তাহাতে ঐরূপ শুচিতার প্রতি তাহার লোভ যে কত প্রবল হওয়া স্বাভাবিক তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে।···

এমনই যখন অবস্থা, তখন রাজলক্ষ্মী, বিধাতার পরিহাসের মতই তাহার সেই অন্তরবাসী মূর্ছিত মদনকে—সেই ভস্মীভূত অনঙ্গকে—সশরীরে পূর্ণ জাগ্রতরূপে সহসা বাহিরে আবির্ভূত হইতে দেখিল। এ সেই কিশোর-কিশোরীর সাক্ষাৎ নয়, তখন দুইটি মুকুলই পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। নারী

চিনিল, পুরুষ চিনিল না। পিয়ারী বাইজী তাহাকে দেখিবামাত্র এক অদ্ভুত স্নেহে অভিভূত হইল; সেই জন্মান্তর-সৌহৃদ নয়—যেন তাহারও বেশি। ইহার কারণ, দুইজনেই এখন পূর্ণবয়স্ক হইলেও—একজন নারী, আর একজন যুবাবয়সী বালক। রাজলক্ষ্মী যে তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল, তাহার কারণ উহাই। সেই কিশোর শ্রীকান্ত তেমনই আছে; রাজলক্ষ্মী তাহার অন্তরটা নিমিষে দেখিতে পাইল; যৌবনের আনুষঙ্গিক উচ্ছৃঙ্খলতা কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই দুরন্ত বালক ঠিক তেমনই আছে। রাজলক্ষ্মী বুঝিতে পারিল, বয়সে ও বুঝিতে সে-ই এখন জ্যেষ্ঠ; তাহার সেই ঠাকুরটির বয়স কখনও বাড়িবে না, দুর্বুদ্ধি ঘুচিবে না—সে তেমনিই আত্মরক্ষায় উদাসীন; তেমনই অসহায়। সে যেন আবার তাহার সেই কিশোরী জীবনে ফিরিয়া গেল—তাহার যৌবন, তাহার বাইজী-জীবন অতিক্রম করিয়া, অতীতের সেই বৃন্দাবনে বনে বনে, আবার তেমনি করিয়া মালা গাঁথিবার জন্য বৈঁচি তুলিতে লাগিল, কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া তেমনই আনন্দে অধীর হইল। স্বপ্নান্তে সে আবার বাস্তবে ফিরিয়া আসিল, তখন সেই প্রেম আরেক রূপ ধারণ করিল—সে যেন দুর্বিনীত বালকের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠা নারীর প্রেম, রাজলক্ষ্মী একেবারে তাহার অভিভাবিকার আসন গ্রহণ করিল।...রাজলক্ষ্মীর প্রাক্তন আবার তাহাকে পাইয়া বসিল—তাহার এত চিন্তার এত যত্নের এমন সুব্যবস্থিত জীবনে এ কোন্ দুর্গ্রহ কোথা হইতে আসিয়া উদয় হইল? অতীত যদি সত্যই অতীত হইয়া যাইত, তবে মানুষ কত দুঃখ হইতেই না পরিত্রাণ পাইত। রাজলক্ষ্মীর অতীত তাহার বর্তমানকে ঘোরান্ধকার করিয়া তুলিল; হতভাগিনী যে আশা করিয়াছিল তাহা ঘুচিল; পিয়ারী বাইজীকে আবার রাজলক্ষ্মী হইতে হইল।...

কেবল একটি কথাই আমাদের মনে বিশেষ করিয়া জাগে, তাহা এই যে এত কাণ্ডের পর—শ্রীকান্তকে বাঁচাইয়া তুলিয়া, এত যত্ন ও এত শুশ্রূষার পর—রাজলক্ষ্মী তাহাকে এমনভাবে বিদায় দিয়াছে। শ্রীকান্ত ইহার একটা কারণ

অনুমান করিয়াছে, অনুমান কেন, দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছে, এবং সেইজন্য সে রাজলক্ষ্মীর প্রতি হঠাৎ বড় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছে ; এই বোধ হয় তাহার প্রথম শ্রদ্ধা। কেবল রাজলক্ষ্মীরই ঐ ব্যবহারই শুধু নয়—শ্রীকান্তের এই ভাবাবেগটিও বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। শ্রীকান্তের দিকটাই প্রথমে বুঝিয়া লওয়া যাক। শ্রীকান্ত প্রেমকে বরদাস্ত করিতে পারে না ; তার উপর পতিতা-নারীর প্রেম—তাহা তো নিতান্ত আশঙ্কাজনক ; যদি কোন কারণে তাহা অতিশয় গভীরও হয়, তবুও সেই মোহের বশে সেও একটা অনর্থক আত্মনিগ্রহ বই তো নয়,—অন্নদাদিদির সেই দারুণ শাস্তিভোগ দেখিয়া সে প্রেমের উপরে আরও চটিয়া গিয়াছে। এই পতিতা নারীও সেই প্রেমের ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে—এ ব্যাধি আরও ঘৃণ্য—পতিতার প্রেম। এ জন্য তাহার সঙ্কোচের অবধি নাই। তাই এতদিনে সে তাহার ঐ একান্ত শুভা-কাঙ্খিনী, উপকারিণী নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ করিতে পারিয়া যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে। তাহার প্রেমের ঐ লক্ষণ দেখিয়া শ্রীকান্ত বড়ই অস্বস্তিবোধ করিতেছিল—কৃতজ্ঞ হইলেও, শ্রদ্ধা বোধ করিতে পারে নাই। এক্ষণে ঐ শ্রদ্ধার কারণ অবশ্য—রাজলক্ষ্মীর মাতৃত্বমহিমা। রাজলক্ষ্মীকেও সে নিজের সেই আত্মগত আদর্শে যাচাই করিয়া লইবে ; তাহার নারীহৃদয়ের যে গভীরতর বেদনা—তাহা তাহার এক প্রকার আধ্যাত্মিক সঙ্কট—সে বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না—বলিয়াছি, ইহার কারণ শ্রীকান্তের সেই চরিত্র ; না হলে বুঝিয়াও বুঝে না কেন ? শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছে তাহার মত নিখুঁত, বাস্তব ও জীবন্ত আর কি হইতে পারে ? কিন্তু সেই চিত্র আমরা যেমন বুঝিতে পারি, সে তেমন বুঝিতে পারে না,—অথচ তাহারই প্রদর্শিত ! এমন হয় কি করিয়া ? তবেই, শ্রীকান্তের ব্যক্তিচরিত্র ও তাহার শিল্পী-চরিত্র, এই দুইয়ের মধ্যে একটা কোন রহস্যময় বিরোধ আছে। এই যে দেখাইতেছে অথচ নিজে দেখিতেছে না, ইহার কারণ কি ? কারণ, শ্রীকান্তের নিজেরই অতি বিশিষ্ট ও অ-সাধারণ চরিত্র।...

পরের দিক দিয়া পরকে দেখা, পরের শুধু বাহিরটাই নয়—ভিতরে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য ; ঐ কঠিন আত্মধর্মনিষ্ঠাই একটা বড় বাধা হইয়া দাঁড়ায়। পরের সম্বন্ধে তাহার অনুকম্পাই আছে, অর্থাৎ দুঃখে সহানুভূতি আছে, কিন্তু মর্মের সহমর্মিতা নাই। সেই সহানুভূতির তুলিকায় যে বর্ণচিত্র আঁকিয়া তোলে, তাহা অতি সুন্দর এবং সাদৃশ্যযুক্ত হইলেও, সে চিত্র এক ভূমিকার চিত্র, তাহাতে পশ্চাৎ-দৃশ্য নাই। ঐ যে কঠিন আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, উহারই কারণে সে প্রেমের বশ নয় ; যে জ্ঞান একমাত্র প্রেমের পক্ষেই সম্ভব তাহা শ্রীকান্তের নাই ; রাজলক্ষ্মীর আছে। শ্রীকান্ত মানুষের দুঃখটাকে যেমন দেখিতে পায়, মানুষের সুখটাকে তেমন দেখিতে পায় না—দুঃখের মধ্যেও যে কত সুখ থাকিতে পারে, তাহা সে বুঝে না, বিশ্বাস করে না। তাই তাহার জীবনদর্শন এমন সেন্টিমেণ্টপ্রধান ও একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। রাজলক্ষ্মীকে সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না, যতবার বুঝিবার অভিমান করিয়াছে ততবারই ভুল বুঝিয়াছে।···

আর রাজলক্ষ্মী ? যে ভ্রান্তি ঘুচিয়াও ঘোচে না, তাহার সেই ভ্রান্তি এবার যেন সত্যই ঘুচিয়াছে। যে কারণে সে শ্রীকান্তের চিন্তাকে মন হইতে একরূপ নির্বাসিত করিয়াছিল, এবং চিরবিচ্ছেদকেই তাহার প্রেমের সাধনমন্ত্ররূপে বরণ করিয়াছিল, সে যে কত সত্য, আর একবার তাহারই নিষ্ঠুরতার প্রমাণ সে প্রত্যক্ষ করিল। সেই তাঁবু হইতে ফিরিবার পথে, গোরুর গাড়ীতে, সে সম্ভবত তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও এই নূতনতর সংঘটনায় সে হয়তো আর একবার শ্রীকান্তকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল ; তাহাতেও সেই এক সত্য, নির্মম নিয়তির মতই তাহাকে নিরাশ ও সাবধান করিয়া দিয়াছে। রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছে,—প্রেম তাহার নাই, কোন নারীর প্রেমই তাহার কাম্য নহে। বরং ঐরূপ প্রেমের আকুলতা ও সনির্বন্ধতা তাহার পুরুষধর্মকে দুর্বল করিতে পারে, তাহাকে আত্মভ্রষ্ট করিতে পারে,—তাহাতে উভয়েরই সমূহ ক্ষতি। তাই সে শ্রীকান্তের সেই রোগ-দুর্বল

অবস্থায় তাহাকে বেশিদিন থাকিতে দিবে না। সে যে কতবড় মর্মান্তিক নৈরাশ্যে, কতবড় মমতাকে নিষ্পেষিত করিয়া, শ্রীকান্তকে এমন করিয়া সরাইয়া দিতেছে—শ্রীকান্ত তাহা বুঝিল না; সে তাহার মধ্যে মাতৃধর্মের একটা মহিমা দেখিয়া মনে মনে নিষ্কৃতি বোধ করিল; এবং নিজেরও প্রেমের নয়—অন্য প্রকার দুর্বলতা জয় করায়, রাজলক্ষ্মীর কল্যাণের জন্য একটা ত্যাগ স্বীকার করার গর্ব অনুভব করিল।"

[শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র—মোহিতলাল মজুমদার]

ব্যাখ্যা

(১) জীবনমৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে! ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্যভাবে বলিয়াছিল, মরতে একদিন ত হবেই, এমন সত্য কথা বলিতে কয়টি মানুষকে দেখা যায়?

মাছ চুরির জন্য নৌকা যাত্রা করিয়া শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের চরিত্রের যে পরিচয় পাইয়াছে তাহাতে সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। এই কিশোরটির মনে ভয় বলিয়া পদার্থ যেন ছিলই না। পাহারারত জেলেদের চোখ এড়াইয়া নৌকা লইয়া গিয়া ইন্দ্রনাথ বড়ো বড়ো পাঁচ ছয়টি মাছ নৌকায় তুলিল। ফিরিয়া যাইবার সময় সে সহসা ডিঙিটিকে জলময় ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। শ্রীকান্ত ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দ্র জানাইল যে, জেলেরা তাহাদের মাছ চুরি টের পাইয়াছে। শ্রীকান্ত দেখিল যে তিনখানা নৌকা তাহাদের খোঁজে বাহির হইয়াছে। তাহারা চলিয়া গেলে শ্রীকান্তকে উপরে বসাইয়া রাখিয়াই ইন্দ্রনাথ নিজে নামিয়া গেল এবং কোমরে দড়ি বাঁধিয়া ডিঙি টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিল। নৌকার উপর ছপাৎ করিয়া একটা শব্দ হইলে শ্রীকান্ত চমকিয়া উঠিল; তখন ইন্দ্রনাথ বলিল যে, উহা সাপ। তাহার কাছ দিয়াও কয়েকটি সাপ গিয়াছে। ঐ সাপগুলি ভয়

পাইয়াছে বলিয়া কামড়াইবে না আর কামড়াইলেই বা কী করা যাইবে, মরিতে তো একদিন হইবেই।

ইন্দ্রনাথের এই আচরণ ও উক্তি শ্রীকান্তকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে। সে ঐ ঘোর বিপদের মধ্যেও শ্রীকান্তকে একবার নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে বলে নাই; সে নিজে সেই ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়া নিদারুণ শ্রম এমন কি চরম বিপদের আশঙ্কা স্বীকার করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই। সেই ঘোর বিপদের সময় সে মুহূর্তের জন্যও স্বার্থের কথা চিন্তা করে নাই। সে যে শ্রীকান্তকে নৌকা হইতে নামিতে দেয় নাই তাহার এই কার্যের মূলে কেবলমাত্র বন্ধুর প্রতি মমতাই যে ছিল তাহা নয়, তাহার প্রকৃতির মধ্যেই দুঃখবরণ ও স্বার্থত্যাগের এমন একটা শক্তি নিহিত ছিল যে, সে নিজে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে অগ্রসর হইয়াছে। মরিতে যে একদিন হইবে এই কথার মধ্যে কল্পনাবিলাস নাই, তাহার একান্ত গভীর জীবনবোধই তাহার এই উক্তির মূলে রহিয়াছে।

(২) বাস্তবিক অকপট সহজ-বুদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি। ইহার উপরে ত কেহই নাই। ভাল করিয়া দেখিলে, মিথ্যা বলিয়া ত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চোখে পড়ে না। মিথ্যা শুধু মানুষের বুঝিবার ও বুঝাইবার ফলটা। সোনাকে পিতল বলিয়া বুঝানও মিথ্যা বুঝাও মিথ্যা, তাহা জানি কিন্তু তাহাতে সোনারই বা কি, আর পিতলেরই বা কি আসে যায়।

রাত্রে নৌকা লইয়া ইন্দ্রনাথ যখন মাছ চুরি করিতে গিয়াছে, তখন শ্রীকান্ত তাহার চরিত্রের বিস্ময়কর পরিচয় লাভ করিয়াছে। ফিরিবার পথে তাহারা গঙ্গার প্রায় তীরে একটি বালকের মৃতদেহ দেখিয়াছে। বালকটি বিসূচিকারোগে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল—তাহাকে গঙ্গার তীরে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। পাছে শৃগাল-কুকুরে তাহাকে লইয়া ছেঁড়াছেঁড়ি করে এই

আশঙ্কায় ইন্দ্রনাথ তাহাকে ঝাউবনের মধ্যে জলে শোওয়াইবার জন্য তুলিয়া লইতে চাহিলে শ্রীকান্ত তাহার আজন্ম-সংস্কারের বশবর্তী হইয়া প্রশ্ন করিয়াছে যে, কোন্ জাতের মড়া তাহা তো জানা নাই, ইন্দ্র উহাকে ছুঁইবে কী করিয়া। ইন্দ্র তাহার উত্তরে বলিয়াছে যে মড়ার জাত নাই। যেমন তাহাদের ডিঙি আগে আমগাছ বা জামগাছ ছিল, কিন্তু এখন ডিঙি মাত্র হইয়াছে, তেমনই এই বালকটি মৃত্যুর আগে হয়তো কোনো জাতের ছিল, কিন্তু এখন ইহা শবমাত্রে পরিণত হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথের যুক্তির মধ্যে বালকসুলভ বুদ্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহার সত্য বিশ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকান্তের মুখ দিয়া শরৎচন্দ্র এখানে আমাদের প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। শবদেহ স্পর্শকে গুরুতর ব্যাপার বলিয়া গোঁড়া হিন্দুরা মনে করেন—অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির শব স্পর্শ করার জন্য ইন্দ্রকে সামাজিক নিন্দাভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বিশ্বাসের মূলে সত্য ছিল। অকপট সহজ বুদ্ধি দিয়া সে যাহা স্থির করিয়াছে তাহাতেও সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে—এই সহজ বুদ্ধিকেই শ্রীকান্ত শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়াছে। দৃষ্টি অকপট হইলে পৃথিবীতে কোনো জিনিসই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বুঝিবার ও বুঝাইবার ভুলেই সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। ইন্দ্রনাথ খাঁটি সোনা—তাহাকে ভুল বুঝিয়া তাহাকে পিতল বলার চেষ্টা অনেকে করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহার গুণের হানি হয় না, যাহারা সত্যই খারাপ তাহাদের গুণবৃদ্ধিও হয় না। যে যেমন সে তেমনই থাকিয়া যায় না।

(৩) একজন আর একজনের মন বুঝে সহানুভূতি ও ভালবাসা দিয়া—বয়স ও বুদ্ধি দিয়া নয়। সংসারে যে যত ভালবাসিয়াছে, পরের হৃদয়ের ভাষা তাহার কাছে তত ব্যক্ত হইয়াছে। এই অত্যন্ত কঠিন অন্তর্দৃষ্টি শুধু ভালবাসার জোরেই পাওয়া যায়, আর কিছুতে নয়।

একদিন রাত্রে নৌকা করিয়া ইন্দ্রের মাছ চুরির সঙ্গী হইবার পর শ্রীকান্ত কয়েকদিন ইন্দ্রের দেখা পায় নাই। একদিন ইন্দ্র শর-ঝাড়ের পাশে বসিয়া মাছ ধরিতেছিল, শ্রীকান্ত তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার কাছে বসিল। শ্রীকান্ত ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল সে আর মাছ ধরিতে যায় কিনা। ইন্দ্র জানাইল যে, সে আর মাছ ধরিতে যায় না। ইন্দ্র ইহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শ্রীকান্ত বুঝিতে পারিল যে, সে কিছু বলিবে।

সে কী করিয়া ইন্দ্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিল গল্পকথক শ্রীকান্ত তাহা পাঠকদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছে যে, তাহার এই বুঝিতে পারার মূল কথা হইতেছে এই যে, সে ইন্দ্রকে ভালোবাসিত। এই ভালোবাসা ছাড়া অপরের মন বুঝিবার অন্য কোনো উপায় নাই। বুদ্ধি দিয়া একটা অনুমান মাত্র করা যায় বটে, কিন্তু যে একজনকে ভালোবাসে, সে তাহার মন অতি সহজেই বুঝিতে পারে—যে ভালবাসার পাত্র তাহার অনুভূতিটুকু কাহারও অজানা থাকে না। বয়স হইলেই যে মন বোঝা যাইবে তাহার কোনো মানে নাই। অভিজ্ঞতা মন বোঝার কাজে লাগে না। উভয়ের অনুভূতির মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক-সূত্র না থাকিলে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করা চলে না। এ সংসারে যে যত ভালোবাসিতে পারে পরের অনুভূতি তাহার নিকট ততখানি স্পষ্ট হইয়া উঠে। ভালোবাসা ছাড়া অপরের হৃদয়ের ভাষাটুকু জানা অসম্ভব। যে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মানুষের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায় তাহা নিছক বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা প্রসূত নয়, তাহার মূলে প্রেম থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্র দরদী লেখক। তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া মানুষের জীবনের সুখদুঃখের যে পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে তাহার মূলে তাঁহার সহানুভূতিশীল দৃষ্টিই বর্তমান। হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়াই তিনি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন—শ্রীকান্তের মুখ দিয়া তিনি নিজের জীবনদর্শনই ব্যক্ত করিয়াছেন।

(৪) তিনি হাতদিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহ্‌জীর মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, যাক্‌, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিই নে।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের মধ্যে অন্নদাদিদির চরিত্র আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। অন্নদাদিদি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ স্বামীর সহিত তাঁহার বিবাহও হইয়াছিল, ব্রাহ্মণকন্যা বা ব্রাহ্মণবধূর আচারও তিনি পালন করিয়া চলিতেন। কিন্তু যে দুশ্চরিত্র স্বামী তাঁহার অগ্রজাকে হত্যা করিয়া উধাও হইবার পর মুসলমান সাপুড়েরূপে আত্মগোপন করিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে স্বামীর মর্যাদা দিয়া, তাহাকেই আপনার জীবনের একমাত্র অবলম্বনরূপে স্বীকার করিয়া তিনি কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সাপুড়ের সংসারে তাঁহার বিন্দুমাত্র আরাম ছিল না, তাঁহার আজন্ম-পালিত রুচির সহিত এই জীবনের মর্মান্তিক বিরোধ ছিল; তবুও এই অসাধারণ নারী দুঃখকে দুঃখ বলিয়া কষ্টকে কষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন নাই। স্বামীর সহস্র দোষ থাকা সত্ত্বেও তিনি অকুণ্ঠচিত্তে তাহার সেবা করিয়া আসিয়াছেন। স্বামী তাঁহার নিকট এমনই জিনিস ছিল।

সেই স্বামীকে তিনি অকস্মাৎ হারাইলেন। শাহ্‌জী একদিন নেশার ঘোরে সাপের মুখে চুমু খাইতে গিয়া সাপের কামড়ে প্রাণ হারাইল। স্বামী ছাড়া এই নারীর আর কোন অবলম্বন ছিল না—ইহারই জন্য অন্নদাদিদি সমাজ ত্যাগ করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত শাহ্‌জীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছে। তিনি শাহ্‌জীর মাথাটা কোলে লইয়া বসিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তকে শাহ্‌জীর মৃত্যু কাহিনী বলিবার পর তিনি অতি সন্তর্পণে তাহার মুখের ঢাকাটি খুলিয়া শেষবারের মতো চুম্বন করিয়াছেন—এই বালকদুটির নিকট তাঁহার কোনো লজ্জা ছিল না। মৃত্যুর আলোকে তাঁহাদের সমগ্র জীবন যেন তাঁহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিয়াছে। তিনি ইন্দ্রনাথকে বলিয়াছেন যে, ইহা একরূপ ভালোই হইয়াছে—ভগবানকে তিনি এতটুকু দোষ দেন না।—তাঁহার এই উক্তির মধ্যে সান্ত্বনার ভাব আছে বটে কিন্তু প্রকৃত সান্ত্বনার লেশমাত্র নাই। এই হতভাগিনী নারীর নিকট জীবনের অর্থই যেন বিলুপ্ত হইয়াছে। চরম অভিমানে অন্নদা-দিদি ভগবানের নাম করিয়া হৃদয়ের সুগভীর বেদনা চাপিয়া রাখিয়াছেন। এই উক্তিতে তাঁহার চরিত্রটি যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

(৫) দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চারপাই' আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জুন জয়দ্রথ বধের পরিবর্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা পাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

ইন্দ্রের নতুনদাকে লইয়া নৌকায় করিয়া দূরবর্তী এক গ্রামে যাইবার পথে নতুনদার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। নতুনদাকে নৌকায় রাখিয়া শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ দুইজনে খাবারের সন্ধানে গ্রামের মধ্যে যাত্রা করিল। তাহারা যখন গ্রামের একমাত্র দোকানটির সমুখে আসিয়া পৌছিল তখন দোকানী দোকান বন্ধ করিয়া দোকানের ভিতবে শুইয়া পড়িয়াছিল। শীতের ভয়ে সে সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; সুতরাং বাহির হইতে দরজা নাড়ানাড়ি করিয়া বা চেঁচামেচি করিয়া তাহাকে ডাকা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু সারাদিন খাটুনির পর দোকানী অঘোরে ঘুম ইতেছিল। তাহার ঘুম ভাঙানো শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গটি বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক শ্রীকান্তের মুখ দিয়া কৌতুকরসের অবতারণা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু সপ্তরথী পরিবেষ্টিত হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছিল—ব্যূহরক্ষী জয়দ্রথ তাহার মৃত্যুর জন্য মুখ্যত দায়ী। পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য অর্জুন প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলেন যে, পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি জয়দ্রথকে বধ করিবেন—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জন দিবেন। জয়দ্রথ বধের সেই প্রতিজ্ঞা অর্জুন রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্জুন যদি প্রতিজ্ঞা করিতেন যে, তিনি ঘরে আগুন না দিয়া বাহির হইতে কেবল ডাকাডাকি করিয়া আর দরজায় ধাক্কা দিয়া এই দোকানীর ঘুম ভাঙাইবেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইত। এই অঞ্চলের লোকেরা দিনের বেলায় এত পরিশ্রম করে যে রাত্রে তাহারা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়।

• এই কয়েক ছত্রে শরৎচন্দ্রের কৌতুক সৃষ্টির তির্যক ভঙ্গিটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই তির্যক রচনাভঙ্গিই তাঁহার রচনাকে বিশেষভাবে উপভোগ্য করিয়া তোলে।

(৬) মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা। দম্ভ প্রকাশের বেলায় কি তাহার কানাকড়ি মূল্য নাই! তোমার কোটি কোটি জন্মের কত অসংখ্য কোটি অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে, এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞান ভাণ্ডারটুকু এক মুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটা কি একটিবারও মনে পড়ে না। এও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের মুখ দিয়া সাধারণ সমালোচকদের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধারণ সমালোচকরা সাহিত্য সমালোচনা করিতে গিয়া জীবনের গভীরতর প্রদেশে পৌঁছিতে পারে না—তাহারা কেবল স্বল্প বুদ্ধি দিয়া জীবনের একটা মনগড়া রূপ কল্পনা করিয়া থাকে এবং তাহা দিয়াই সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া থাকে। কোনো চরিত্র আলোচনা করিতে গিয়া তাহারা ঐ চরিত্রের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ চরিত্র যাহা করিয়াছে তাহা স্বাভাবিক কিনা কেবল সেই বিচারই করিয়া থাকে।

কিন্তু মানুষের পরিচয় যে অন্তরের পরিচয় তাহার বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। সমালোচকরা সমালোচনা করিবার সময় অন্তর যে অনন্ত সেই কথা ভুলিয়া গিয়া আপনাদের স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প অনুভূতি দিয়া মানুষের হৃদয়কেও ছাঁচে ঢালাই করিয়া তাহার বিচার করিতে চাহেন। কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে অসংখ্য উপাদান নিহিত হইয়া আছে। তাহার অস্তিত্বের মূলে যে কোটি কোটি জন্মের আয়োজন রহিয়াছে তাহা বুদ্ধির অতীত অসংখ্যভাবে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে নিহিত থাকে—কোন অবসরে তাহা আমাদের স্বল্প বুদ্ধি দিয়া বিচারের অবকাশ না দিয়াই আশ্চর্যভাবে প্রকাশিত হয়। সমালোচক তাহার জ্ঞানটুকু সম্বল করিয়া মানুষের হৃদয়রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করে—কিন্তু রহস্যগভীর হৃদয় অজস্র বিস্ময়করভাবে প্রকাশিত হইয়া সমালোচকের সমস্ত বুদ্ধির আস্ফালনকে এক মুহূর্তে চূর্ণ করিয়া দেয়।—সাধারণ সমালোচক যখন চরিত্র সমালোচনা করিতে যায় তখন অন্তরের অসীমতার কথা ভুলিয়া যায়—মানুষের হৃদয়ে যে সীমাহীন আত্মার অধিষ্ঠান এ কথা তাহার মনে থাকে না। যাহা হৃদয়ের অনুভূতি দিয়া বোঝা যায় তাহাকে বুদ্ধি দিয়া বিচার করিবার চেষ্টায় সকলই নষ্ট হইয়া যায়।

(৭) এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের যে অংশে শ্রীকান্ত শ্মশানের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছে, সেই অংশে শরৎচন্দ্রের সৌন্দর্যদৃষ্টি ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকান্ত কালের

কবলে পড়িয়া জনশূন্য একটি গ্রামের প্রান্তবর্তী একটি দীঘির ঘাটে বসিয়াছিল—সহসা কোন এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সে মহাশ্মশানের মধ্যে প্রবেশ করিল। এখানে সহসা অন্ধকারের একটা বিচিত্র রূপ তাহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছে। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই রূপময় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া শ্রীকান্ত অন্ধকারের মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে উৎসুক হইয়াছে।

তাহার মনে হইয়াছে যে, রূপ ও সৌন্দর্যের অভাব হইতে অন্ধকারের সৃষ্টি হয় নাই—উহা অ-রূপের চরম পরিণতিও নহে। অন্ধকার বিরাট এবং সীমাহীন গভীর সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। উহার অন্তর্নিহিত অপার অনন্ত সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণের শক্তি মানবের নাই, উহা চির রহস্যাবৃত বলিয়াই মানব-নয়নে অন্ধকারময়। এইজন্য এজগতে যাহা কিছু বিরাট, সুগভীর, সীমাহীন, যাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা মানববুদ্ধির অতীত, তাহাই মানবের চক্ষে অন্ধকারময় হইয়া রহিয়াছে। যেমন অতল সমুদ্রের তলদেশ মানব-চক্ষুর অগোচর বলিয়াই মহাসাগর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; দুর্গম মহারণ্য মধ্যস্থিত অনন্ত রহস্য মানবের অজ্ঞাত, এইজন্য মহাবন অন্ধকারময়। অন্যদিকে যে সমুদয় বিষয়, যে সকল রহস্য, যে যে তত্ত্ব মানবের মনবুদ্ধির অতীত, তাহাও চির অন্ধকারে আবৃত। যে পরমপুরুষ পরমাত্মা সর্বভূতের একমাত্র আশ্রয়, যাঁহার সুনির্মল দিব্য জ্যোতি হইতে সূর্য-নক্ষত্রের উৎপত্তি, যিনি অগতির একমাত্র গতি, যিনি একমাত্র মুক্তিদাতা যাঁহার শক্তিপ্রবাহে জগৎ চরাচর গতিশীল, যিনি প্রাণের প্রাণ, যিনি সর্বসৌন্দর্যের আধার পরম সুন্দর, তাঁহার গুহ্য রহস্য মানব-বুদ্ধির অগোচর বলিয়াই তিনি মানবচক্ষে অন্ধকারময়। অর্থাৎ যে বস্তু সম্বন্ধে মনাবের জ্ঞান যত সংকীর্ণ, সেই বস্তুই মানবের নিকট তত অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মৃত্যুর রহস্য মানবের চির অজ্ঞাত—সেইজন্য মানুষ মৃত্যুকে ঘোর অন্ধকারময় বলিয়া কল্পনা করে। পরলোক লোকচক্ষুর অগোচর বলিয়াই উহা অন্ধ তমসাচ্ছন্নরূপে কল্পিত হয়।

(৮) যে গোপনেই আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে আমার নিকট কতখানি ফেলিয়া রাখিয়া গেল তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর প্রেমের মধ্যে একদিকে যেমন নিবিড়তা ছিল, অন্য-দিকে তেমনই দ্বিধার অন্ত ছিল না। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে গভীরভাবে ভালোবাসিয়াছিল—কিন্তু তাহার বিগত জীবনের শোচনীয় ইতিহাসের জন্য সে শ্রীকান্তের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই। শ্রীকান্তের মঙ্গল কামনায় সে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতে চাহিয়াছে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে একটি ছোটো পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে শ্রীকান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটা ঘোরতর বিপ্লব সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না। যে কোনো কারণেই হোক, শ্রীকান্তকে সরাইয়া দেওয়াই সে শ্রেয় বলিয়া মনে করিয়াছে।

কিন্তু শ্রীকান্তের প্রতি তাহার অনুরাগ বিন্দুমাত্র কমে নাই। শ্রীকান্ত চলিয়া যাইবার আগের দিন সন্ধ্যায় অসুস্থতা বোধ করিলে রাজলক্ষ্মীর উদ্বেগের সীমা ছিল না। শ্রীকান্ত রাত্রে ঘুমাইয়াছিল—মাঝরাত্রে হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙিয়া গেলে সে চোখ মেলিয়া দেখিল যে, রাজলক্ষ্মী ঘরে আসিয়াছে। রাজলক্ষ্মী প্রথমে তাহার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর মশারির ভিতর হাত দিয়া শ্রীকান্তের কপাল ও গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিল। যাইবার সময় সে শ্রীকান্তের গায়ের চাদর গলা পর্যন্ত টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী গোপনে আসিয়াছিল। শ্রীকান্ত তাহার আগমন ও গোপন পরিচর্যাটুকু জানিতে পারিয়াছিল বটে কিন্তু তাহাকে সে গোপনেই যাইতে দিয়াছে। সে তাহাকে তাহার সংসারের প্রতিষ্ঠা হইতে আকর্ষণ করিতে চাহে নাই। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর এই গোপন সেবাটুকু তাহার অন্তর একেবারে ভরিয়া দিয়াছে। তাহাকে সরাইয়া দিতে চাহিলেও রাজলক্ষ্মী যে প্রকৃতপক্ষে তাহাকে কতখানি ভালোবাসে তাহা এই মুহূর্তে তাহার নিকট প্রকাশিত

হইয়াছে। কিন্তু সে যে রাজলক্ষ্মীর এই গভীর অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছে রাজলক্ষ্মী তাহা জানিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মী তাহার অজ্ঞাতসারেই বিদায়ের পূর্ব রাত্রে শ্রীকান্তকে তাহার ভালোবাসার নিদর্শন দিয়া তাহার অন্তর ভরিয়া দিয়াছে।

B. A. BENGALI SECOND LANGUAGE

বিচিত্র প্রবন্ধ

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ছোটোনাগপুর

'ছোটোনাগপুর' রচনাটিকে ভ্রমণকাহিনী বলা চলে কি? এই রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্তটি বিবৃত কর।

পুরাদস্তুর ভ্রমণ-কাহিনী রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত নয়। ভ্রমণকাহিনী বলিতে যে তথ্যপ্রধান বিবৃতি বা আলোচনার কথা আমাদের মনে পড়ে, তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যে একেবারে অনুপস্থিত। তিনি জীবনী রচনা করিতে গিয়া যে 'জীবনস্মৃতি' রচনা করিয়াছেন, তাহা স্মৃতিচিত্রের কয়েকটি টুকরা মাত্র। তাঁহার ভ্রমণমূলক রচনার মধ্যেও বৃত্তান্তের পরিমাণ নিতান্ত অল্প। তিনি মুখ্যতঃ চিত্রের মালা গাঁথিয়া এই শ্রেণীর রচনাগুলিকে সজ্জিত করেন—এগুলির মধ্যে ধারাবাহিক বিবরণের পরিবর্তে ছবির টুকরাই বেশি করিয়া আমাদের চোখে পড়ে। 'ছোটোনাগপুর' রচনাটিতে ধারাবাহিকতার একটা সূত্র আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ছবিগুলিকে গাঁথিবার জন্য।

এই শ্রেণীর রচনা অবশ্য বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতেই যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নয়। ইহার পূর্বে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পালামৌ' নামে যে গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে ছবির টুকরা পরিবেশনের সার্থক প্রয়াস দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের নিপুণ হাতে চিত্ররচনা অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণকাহিনী আরম্ভ করিয়া প্রথমেই হাওড়া স্টেশনে রেল-

গাড়িতে চড়ার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার পর পথের বর্ণনা বা ঘটনাবলীর তালিকা দেন নাই। রাত্রের ট্রেণে স্টেশনের পর স্টেশন পার হইবার মধ্যে যে একটা আবেশমধুর অনুভূতি আছে, তাহারই আভাস দিয়াছেন। ইহার পর মধুপুর স্টেশনে রাত চারটের সময় গাড়ি বদল করিতে হইয়াছে। ইহার পর দিনের আলোয় পথের যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, লেখক তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। ভাঙা মাঠের মধ্যে শুষ্ক নদী—তাহার মধ্যে মধ্যে কালো পাথর, দূরে নীল পাহাড়। ঝাঁকড়া-চুল কৃষ্ণকায় কৃষক ও তাহার দুটি মহিষ, শুকনো সাদা ঘাসের জমিতে একটা বাঁধানো ইঁদারা, দূরের তালগাছ, অশ্বত্থগাছ ও আমগাছ, প্রান্তরবর্তী চালশূন্য কুটীর, গাছের দগ্ধ গুঁড়ি—বর্ণনার নৈপুণ্যে শুষ্ক রুক্ষ প্রকৃতির ছবিটি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

লেখক সকাল ছটায় গিরিডি পৌঁছিয়াছেন—এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে। ডাকগাড়ির বর্ণনা 'চারটে চাকার উপর একটা ছোট্টো খাঁচা'।—সর্বপ্রথমে তিনি গিরিডির ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ডাকবাংলার চারিদিকের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ইহার পর তাঁহার গাড়ি পাহাড়ে রাস্তা দিয়া যাত্রা করিয়াছে। পথে লম্বা লম্বা শালগাছ আকাশের দিকে শীর্ণ আঙুল তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আকাশে মেঘ করিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। পথে বরাকর নদী পড়িয়াছে—গাড়ি টানাটানি করিয়া নদী পার করিয়া আবার রাস্তায় উঠিয়াছে। পথের পাশে ডোবাতে কয়েকটা মহিষ পরস্পরের গায়ে মাথা রাখিয়া জলে শরীর ডুবাইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় তাঁহারা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন। অদূরে দুটি পাহাড়, তাহার মধ্য দিয়া পথ গিয়াছে। কোনো দিকে লোকবসতির চিহ্নমাত্র নাই—দিগন্তে গোধূলির সোনালি রঙের আভাস লাগিয়াছে। কোথাও জনপ্রাণী নাই—যেন বিস্তীর্ণ ভূমিশয্যায় এক বিরাট পুরুষের নিদ্রার আয়োজন করা হইয়াছে ; সেইজন্য সকলেই সন্ত্রস্ত।

রাত্রিটা কোনোমতে জাগিয়া-ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিবার পর প্রভাতে উঠিয়া লেথক দেখিতে পাইলেন যে, বাম দিকে ঘন পাতায় ঢাকা বন পাথরকে একেবারে ঢাকিয়া দিয়াছে। একটু পরেই বন মিলাইয়া গিয়া মাঠ দেখা গেল; দূরে গোরু ও মহিষ চরিতেছে বা জমি চষিতেছে দেখা গিয়াছে।

বেলা তিনটার সময় তাঁহারা হাজারিবাগের ডাকবাংলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রকৃতির উদার পরিবেশের মধ্যে শহরটি বেশ পরিচ্ছন্ন।—পরের দিন দুপুর বেলায় তিনি ডাকবাংলার বারান্দায় কেদারায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। নীল আকাশে দুইখণ্ড শীর্ণ মেঘ দেখা যাইতেছিল। বাতাসে ঘেসো ঘেসো গন্ধ। চারিদিকে একটা নিশ্চিন্ত পরিবেশ। মানুষের জীবন এখানে হাঁসফাঁস করিতে করিতে বা ভারাক্রান্ত হইয়া মন্থরগতিতে যাইতেছে না। জীবন এখানে যেন একটা ছায়াবৃত স্নিগ্ধ নির্ঝরের মতো বহিয়া যাইতেছে। এখানকার আদালতও লেখকের নিকট কোমল বলিয়া মনে হইয়াছে। আদালতের ভিতরে উকিলের বিতর্কের সময় বাহিরে অশ্বত্থ গাছে দুইটি পাপিয়ার ডাক আর বিচারপ্রার্থী লোকেদের হা হা করিয়া হাসির শব্দ শোনা যায়। মাঝে মাঝে আদালতের ঘণ্টা বাজিয়া সকলকে সজাগ করিয়া দিতেছে। কিন্তু এই আবেশময় দ্বিপ্রহরে লেখকের চোখে তন্দ্রা নামিয়া আসিয়াছে।

রুদ্ধ গৃহ

'রুদ্ধ গৃহ' প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে জীবনদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় দাও। এই রচনাটির মূলে তাঁহার জীবনের কোনো ঘটনা আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে তাঁহার অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর স্নেহ ও সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। কাদম্বরী দেবী নিজে সাহিত্যরস-পিপাসু ও কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ভক্ত ছিলেন। তরুণ বয়সী রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনায় তিনি উৎসাহ দান করিতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন

তেইশ বৎসর তখন কাদম্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করিলে কবির চিত্ত সাময়িকভাবে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার এই সময়ের কবিতার মধ্যে একটা বিষাদধূসরভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—একটা উদাস করুণ সুর তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের মধ্যে এমন একটা নিরাসক্ত ভাব আছে, যাহার জন্য কোনো শোক বা কোনো দুঃখ তাঁহাকে চিরকাল আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার এই নিরাসক্তি শিল্পীর নিরাসক্তি নয়, তাঁহার অন্তরের মধ্যেই এমন একটা মুক্তিকামিতা ছিল, যাহার জন্য কোনো বন্ধনই তাঁহাকে বেশিদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। যাহার সহিত হৃদয়ের সুগভীর সম্পর্ক ছিল, তাহার শোকও ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য তাঁহার চিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাকে জীবনে বহু কঠিন শোকের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে কিন্তু কোনো শোকেই তিনি ভাঙিয়া পড়েন নাই। তাঁহার অন্তর সমস্ত বেদনাকে অতিক্রম করিয়া নির্বিকার হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করিয়া রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "আসল কথা, তাঁহার শোক বা সুখ কোনোটিই মনে স্থায়ী রেখাপাত করিত না—তাঁহার ভাবাবেগের পূর্ণ প্রকাশের জন্য—তাহা শোকই হউক বা সুখই হউক, তাহাকে উদ্বোধিত করিবার জন্য যতটুকু আঘাত (stimuli) প্রয়োজন হইত, ততটুকু মাত্র তিনি সহ্য করিতেন—তদতিরিক্তকে আমল দিতেন না। এই নিরাসক্তি তাঁহার চরিত্রে যে নৈর্ব্যক্তিকতা দান করিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি অন্যকে দুঃখ দিয়াছেন। তাঁহার দুঃখ intellectualised emotionএর একটি রূপমাত্র, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির পথে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু মাত্র; তারপর সৃষ্টিসুখ সম্ভোগ হইয়া গেলে বিস্মৃতির চিরপাথারে স্মৃতি ডুবিয়া মরিত।"

'রুদ্ধ গৃহ' প্রবন্ধটি ১২৯২ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা 'বালক'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীঅ (অক্ষয় চৌধুরী) নামক জনৈক পত্রলেখক এই প্রবন্ধটির অন্তর্নিহিত অর্থ-সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে রবীন্দ্রনাথ যে উত্তর দেন তাহা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের অন্যতম মূলসূত্র। তিনি বলিয়াছেন, 'মৃত্যুকে আমরা যেমন ভয় করি বিস্মৃতিকেও আমরা তেমনি ভয় করি।··· বিস্মৃতি মাঝে মাঝে আসিয়া স্মৃতির শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া যায়। আমাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য স্বাধীন করিয়া দেয়।····প্রতি মুহূর্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি জমিয়া অবশেষে আমাদের বাতাস আটক করিতে চাহে,···বিস্মৃতি আসিয়া এই সকল বেড়া ভাঙিয়া দেয়। বিস্মৃতি আমাদের জীবনগ্রন্থের ছেদ, দাঁড়ি; মাঝে মাঝে আসিয়া উত্তরোত্তর আমাদের জীবনবিকাশের সহায়তা করে। একটি জীবনের মধ্যেও শত সহস্র বিস্মৃতি চাই, তবেই জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে।"

এই বিস্মৃতি-তত্ত্ব সম্পর্কে কয়েক বৎসর পরে তিনি যে ব্যাখ্যা করেন তাহাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।—"শরতের প্রভাতে যেন আমার বহুকালের স্মৃতি হৃদয়ের মধ্যে জাগিয়া উঠে। তাহাকে স্মৃতি অপেক্ষা বিস্মৃতি বলিলেই ঠিক হয়। কিন্তু যে বিস্মৃতি বলিলে একটি অভাবাত্মক অবস্থা বোঝায় এ তাহা নয়, এ একপ্রকার ভাবাত্মক বিস্মৃতি, নহিলে 'বিস্মৃতি জাগিয়া ওঠা' কথাটা ব্যবহার হইতেই পারে না। এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট যে কিছু মনে পড়ে তাহা নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে পুরাতন কথা মনে পড়িলে যেমনতর মনের ভাবটি হয়, অনেকটা সেইরূপ ভাবমাত্র অনুভব করা যায়। যে-সকল স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদের পৃথক করিয়া চিনিবার জো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতনারাজ্যের বহির্ভাগে যাহারা বিস্মৃতি মহাসাগররূপে স্তব্ধ হইয়া শয়ন আছে, তাহারা যেন এক সময়ে চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে; তখন আমাদের চেতনহৃদয় সেই বিস্মৃতিতরঙ্গের আঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদের রহস্যময় অগাধ প্রবল অস্তিত্ব

উপলব্ধ হয়, সেই মহাবিস্মৃত, অতিবিস্তৃত বিপুলতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।”

‘রুদ্ধ গৃহ’ প্রবন্ধটির তাৎপর্য সংক্ষেপে বিশ্লেষণ কর।

মানুষের মনে যে শোক অনড় হইয়া বসিয়া থাকে তাহা রুদ্ধ ঘরের মতো। বড়ো বাড়ির বন্ধ ঘরের তালাতে মরিচা পড়া, তাহার চাবি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে-ঘরে দিনের বেলা কেহ যায় না, রাত্রে সেখানে আলো জ্বলে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখাশোনা বা হাসিয়া কথা কওয়ার অভাবে একটা অন্ধ ভয় সেখানে পাইয়া বসে। দুইটি দ্বার দিয়া যে ঘরটি বন্ধ হইয়া আছে তাহার মধ্য হইতে যেন একটা হু হু শব্দ শোনা যায়। একজনের স্মৃতি এই রুদ্ধ ঘরের মধ্যে হৃদয়ের গুপ্ত গহ্বরের মধ্যে আবদ্ধ। এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে।

কিন্তু এই পৃথিবীতে মৃত্যু চিরস্থায়ী হইতে পারে না—জীবনের প্রবাহ তাহাকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। এইজন্যই সমাধিভবনে মৃতকে লুকাইয়া রাখে। তেমনই জীবনও এক এক সময় মৃত্যুকে চুরি করিয়া রাখিয়া সংসারের মধ্যে পরিবেশন করিয়া দেয়।—পৃথিবী জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই স্থান দেয়। পৃথিবীর মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর খেলা দেখিলে আমাদের মনে কোনো ভয় থাকে না। বদ্ধ মৃত্যু আমাদের প্রাণে যেন একটা আতঙ্ক জাগাইয়া দেয়। যেখানে মৃত্যু জীবনের হাত ধরিয়া খেলা করে সেখানে কোনো ভয় নাই। কিন্তু কোনো চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যু পাষাণভার চাপাইয়া রাখে।

পৃথিবীতে যাওয়া-আসাই নিয়ম—এই নিয়ম ভঙ্গ হইলে সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়। জীবন ও মৃত্যু দুইই যেমন আসে তেমনই যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কোনো প্রয়োজন নাই। হৃদয়কে পাষাণ করিয়া তাহার মধ্যে মৃত্যুকে সমাহিত করিলে তাহা অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। হৃদয়ের দুই দ্বার খুলিয়া দিয়া জীবন ও মৃত্যুর প্রবাহকে অবাধ করিয়া তুলিতে হইবে।

রুদ্ধ গৃহ দুই দ্বারই বন্ধ করিয়া রাখে। দ্বার যে দিন রুদ্ধ হইয়াছিল সেদিনকার অন্ধকার আজও পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। চারিদিকে দিনরাত্রির প্রবাহ, আর এই রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে সেই একটিমাত্র দিন আবদ্ধ। পুরাতন আর কোথাও নাই, কেবল এই ঘরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

এই ঘরের অন্তর ও বাহিরের মধ্যে বিচ্ছেদ—উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের সম্পর্ক নাই। বিশ্বের প্রবাহ এই ঘরকে এড়াইয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর সহিত ইহার সকল সম্পর্কই যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গৃহ যেন দ্বার রুদ্ধ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া আছে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো বা উৎসবের আনন্দধ্বনিতে তাহার অন্ধকার ঘুচিতে চাহে কি না কে বলিতে পারে। এ ঘরের চাওয়ার কথা আমরা বুঝিতে পারি না।—শোক-ক্ষুব্ধ হৃদয় পৃথিবীর সৌন্দর্য ও আনন্দের স্পর্শে আপনার বদ্ধতা কাটাইয়া উঠিতে চায়।

শোকাহত হৃদয়ে একদিন জীবনের লীলা ছিল, হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র প্রকাশ ছিল—সে হৃদয় মানুষকে ছাড়া বাঁচিতে পারে না।—রুদ্ধ কক্ষে ছেলেরা একদিন খেলা করিত, এখানে স্নেহপ্রেমের লীলা হইয়া গিয়াছে—এখন তাহার উপর কপাট পড়িয়া গিয়াছে। সেই স্নেহপ্রেম বদ্ধ করিয়া রাখিবার জিনিস নয়—মানুষের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে গোপন দিয়া রাখা যাইবে না। সংসারক্ষেত্রের জন্য তাহার একটা আকুল ক্রন্দন আছে।

রুদ্ধ গৃহের দ্বার খুলিয়া দিয়া সূর্যের আলোতে আবদ্ধ ভয় দূর হইয়া যাইবে। হৃদয়কে উন্মুক্ত করিয়া সুখ-দুঃখ জন্মমৃত্যু সকলের প্রবাহকে অবাধ করিয়া জগতের সহিত ইহার যোগকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে।

ব্যাখ্যা

(১) চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এই জন্য সমাধিভূমি ভয়ের আবাসস্থল।

'রুদ্ধ গৃহ' রচনাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শোকের দীর্ঘজীবিতা অস্বীকার

করিয়াছেন। মৃত্যু আমাদের জীবনে বহুবার আসে। কিন্তু মৃত্যুই মানুষের জীবনের একমাত্র সত্য নয়। মৃত্যু-শোক যখন মানুষের জীবনে আসে তখন তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া দেয়। মানুষ এইরূপ অবস্থায় শোককে অতি উচ্চ মূল্য দিয়া মৃতের স্মৃতিকে শোকরূপে হৃদয়ের মধ্যে জমা করিয়া রাখে বা সমাধিমন্দির রচনা করে।

কিন্তু শোকের বেগ সাময়িকভাবে যত তীব্রই হোক না কেন, তাহা জীবনের চরম পরিচয় নয়। যখন কেহ একটা শোকের স্মৃতিকে বুকের মধ্যে পুষিয়া রাখিতে চায় বা যখন কেহ একটা সমাধিমন্দির রচনা করিয়া তাহাকে সম্মান দিতে চায়, তখন সে জীবনকে একরূপ অস্বীকার করে। কিছুকাল পরে সেই স্মৃতি একটা বদ্ধতার মধ্যে অসাড় হইয়া পড়ে। তখন তাহা হৃদয়ের পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়া উঠে। সমাধিক্ষেত্রে অনেকে ভয় পায় তাহার কারণ তাহার মধ্যে জীবনের পরিচয় নাই—মৃত্যুর একটা তামসমূর্তি তাহার মধ্যে আতঙ্ক সঞ্চার করে।

(২) স্নেহপ্রেম বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই।

যাহার সহিত স্নেহপ্রেমের নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল, সে যখন ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন মনে হয় যে পৃথিবীর সকল সুখের স্বাদই শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন সব কিছুকে উপেক্ষা করিয়া সেই শোকের স্মৃতিকেই হৃদয়ের মধ্যে সযত্নে লালন করিবার জন্য প্রযত্ন দেখা যায়। এইরূপ প্রয়াসকে রবীন্দ্রনাথ একটি গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাকে জগৎসংসার হইতে পৃথক করিয়া রাখার সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু সেরূপ করিলে স্নেহ ও প্রেমকে সত্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। এ ভাবে স্নেহ ও প্রেমকে একটি শোকস্মৃতিতে সমাধিস্থ করিলে জীবনের সত্যকে অস্বীকার করিয়া কেবল মৃত্যুকেই আঁকড়াইয়া থাকা হয়। কিন্তু স্নেহপ্রেম তো জীবনের প্রাণময় প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত। তাহাকে সত্য মর্যাদা দিতে গেলে জীবনের প্রবাহের সহিত তাহার সংযোগ

সাধন করিতে হইবে। সুতরাং হৃদয়ের মধ্যে স্নেহপ্রেমের সত্য প্রকাশ সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইলে উন্মুক্ত মানবজীবনের মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিতে হইবে।

পথপ্রান্তে

'পথপ্রান্তে' নিবন্ধটির অন্তর্নিহিত ভাবটি বিশ্লেষণ কর।

ছায়াময় পথের প্রান্তে লেখকের গৃহ। ভোরবেলায় খোলা জানালা দিয়া সূর্যের প্রথম কিরণ আসিয়া তাঁহার কোলের উপর তাঁহার লেখার উপর তাহার সোনালি রং বুলাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। সূর্যের প্রেম যেন তাঁহার লেখার অক্ষরগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠে।

তাঁহার সমুখ দিয়া কত লোক চলিয়া যায়। প্রভাতের আলো শুভযাত্রার জন্য আশীর্বাদ করে। পাখীরা কল্যাণ গান করিতেছে—পথের পাশে ফুলগুলি আশার মতো ফুটিয়া উঠে। সারা বিশ্বে শুভযাত্রার গান। প্রভাত যেন প্রতিদিন পূর্ব আকাশের স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গ হইতে কল্যাণের সংবাদ আনিয়া দেয়—সারা দিনের মতো অমৃত আহরণ করিয়া আনে। তাহা জগতের যাত্রারম্ভের আশীর্বাদ।

লেখকের লেখার উপরে ছায়া ফেলিয়া পৃথিবীর লোক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সুখ-দুঃখ, প্রতি নিমেষের বোঝা পিছনে ফেলিয়া তাহারা চলিয়া যায়। তাহাদের হাসি-কান্না তাঁহার লেখার উপরে পড়িয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তাহাদের প্রেম তাঁহার কাছে সত্য হইয়া উঠে।

সমস্ত পথে আর কিছুই থাকে না, কেবল তাহাদের প্রেম তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহাদের ভালোবাসার টানে তাহারা আগাইয়া চলে। প্রেম তাহাদের শ্রান্তি হরণ করে। জগতের শোভা তাহাদের সাথী হয়, তাহাদের অন্ধকার হইতে বাহিরে টানিয়া আনে, তাহাদের সমুখের দিকে আগাইয়া দেয়।

প্রেমকে বাঁধা গেলে পথিকদের যাত্রা রুদ্ধ হইত ও প্রেমের সমাধি পথিককে জড় পিণ্ডের মতো আবদ্ধ করিয়া রাখিত। যথার্থ প্রেম বাঁধিয়া রাখে না,

বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমের বন্ধন, বৃহৎ প্রেমের প্রভাব আর সমস্ত ছোটো ছোটো বন্ধন বা আকর্ষণকে ঘুচাইয়া দেয় বলিয়াই জগতের নিত্যপ্রবাহ সম্ভবপর হইয়াছে।

যে প্রেম পথিকদের কাঁদায়, সেই প্রেমই আবার তাহাদের হাসি ফুটাইয়া তুলে। হাসি ও অশ্রুতে আমাদের চারিদিকে এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। প্রেম চিরকাল কাঁদিতে দেয় না। যে প্রেম একজনের বিরহে কাঁদায়, সেই প্রেমই আবার পাঁচজনকে কাছে আনিয়া দেয়। আমাদের চোখ অশ্রুতে অন্ধ হয় বলিয়া আমরা আর কাহাকেও দেখিতে পাই না—সেইজন্য আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারি না। তখন আমরা সংসারকে উপেক্ষা করিয়া মরিতে বসি। কিন্তু অবশেষে প্রেমের জয় হয়। প্রেম আবার আমাদের জগতের মধ্যে জীবনের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়।

প্রভাতে যাহারা যাত্রা করিতে বাহির হইয়াছে তাহাদের অনেকদূর যাইতে হইবে। ভালোবাসা না থাকিলে তাহারা এত দীর্ঘ পথ চলিতে পারিত না। পথের ভালোবাসা প্রতি পদেই তৃপ্তি আনিয়া দেয়। পথের ভালোবাসা তাহাদের চলার প্রেরণা দেয়; আবার সেই ভালোবাসা যখন মোহে পরিণত হয় তখন তাহা তাহাদের যেন আবদ্ধ করে। কিন্তু আবার অগ্রসর হইলে মোহ টুটিয়া যায়।

মা—যে ছেলেটিকে কোলে করিয়া চলিতেছেন ইহার মূলে প্রেমের প্রভাব রহিয়াছে; প্রেমের জন্যই মা দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করিতেছেন না। কিন্তু মা তখনই ভুল করেন, যখন তিনি মনে করেন যে ঐ ছেলের মধ্যেই তাঁহার অনন্তের অবসান। অনন্তের রাজ্যে অসংখ্য ছেলে—ঐ একটি ছেলে তাঁহাকে হাত ধরিয়া সেই রাজ্যে লইয়া যায়। সেই অনন্তের সন্তানরাজ্যে মাধুর্যের সীমা-পরিসীমা নাই। আবার, অন্যদিকে দেখা যায় যে অসহায় শিশুদের কান্নার সীমা নাই। রোগের যন্ত্রণায় তাহাদের দেহ জর্জরিত হইতেছে; বর্বর বয়স্করা কত অত্যাচার করিতেছে। একটি ছেলে মাকে পৃথিবীর সকল সন্তানের মা

করিয়া দেয়—মাতৃত্বের স্বর্গের দ্বার তাঁহার কাছে উন্মুক্ত হইয়া যায়। ইহার পর ছেলের কাজ ফুরায়—তাহাকে নিজের পথে চলিয়া যাইতে দিতে হইবে।

প্রেম যেমন একদিকে আমাদের ভিতর হইতে বাহিরের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, অন্য দিকে আবার তাহা আপন হইতে অন্যের দিকে, এক হইতে আরেক দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। প্রেম পথের আলো; তাহা আলেয়ার আলো হইলে যা হোক একটা কিছুর মধ্যে আমাদের ফেলিয়া দিত—সেইখানেই আমাদের অনন্তযাত্রার অবসান হইত। কিন্তু তাহা হইবার জো নাই—প্রেম আমাদের সকলকে ভালোবাসিতে শেখায়। এককে অতিক্রম করিবার জন্যই একের দিকে আগাইয়া যাইতে হইবে।

সকলেই পথ দেখাইবার জন্য আসে—পথের বাধা হওয়া কাহারও উদ্দেশ্য নয়—সকলেই পথ ছাড়িয়া দেয়। কেহই কাহাকেও বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে না। যে আপনার চারিদিকে দেওয়াল তোলে, কালের প্রবাহ সেই দেওয়াল ভাঙিয়া তাহাকে বাহিরে টানিয়া লইয়া যায়। তখন আবরণ ঘুচিয়া যাওয়ায় সে অসহায়ভাবে কাঁদিতে থাকে। সে তখন লজ্জায়, দুঃখে ধূলির মধ্যে মিশাইয়া যাইতে চাহে।

আমরা জন্ম হইতেই পথিক। অদৃষ্ট যদি আমাদের হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলেও আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না। কিন্তু যাত্রার প্রারম্ভে আমরা শাসনের কঠোর ধ্বনির পরিবর্তে আশ্বাসের বাণী শুনিতেছি। পথের মধ্যে দুঃখকষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমরা ভালোবাসিয়া চলিতেছি। ভালোবাসা আমাদের বেষ্টন করিয়া আছে। সেই ভালোবাসার ডাককে স্বীকার করিয়াই যেন আমরা চলিতে পারি—মোহ যেন আমাদের আবদ্ধ করিয়া না রাখে।

সহস্র লোকের হাসিকান্নার ধারে বসিয়া লেখক পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভালোবাসিতেছেন। তাঁহার প্রেম পাথেয়রূপে দান করিয়া তিনি

তাহাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন। পথ চলিতে প্রেমের প্রয়োজনই সব চেয়ে বেশি। সেই প্রেম দিয়া সকলে যেন সকলকে পথ চলিতে সাহায্য করে।

দ্রষ্টব্য—এই রচনাটির মধ্যে 'রুদ্ধ গৃহে'র মূলগত ভাবটির পরোক্ষ প্রভাব আছে। 'রুদ্ধ গৃহে' পাত্র হইতে পাত্রান্তরে হৃদয়ের যাত্রার বা জীবনের যে প্রবহণধর্মের আভাস আছে এখানে যেন তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রকাব্যে (বলাকার যুগে) যে চলতা আদর্শের বিকাশ দেখা যায়, এখানে তাহার সূত্রপাত দেখা যায়। বিশেষতঃ 'শাজাহান' কবিতায় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া যে প্রেম গড়িয়া উঠে বৃহত্তর মানব-জীবনের তুলনায় তাহার খর্বতা ও ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে তাহা এই ভাবধারারই বিকাশ।—এই রচনাটির সঙ্গে 'ভৈরবী গান' কবিতাটি মিলাইয়া পড়া যাইতে পারে; ঐ কবিতাটিতেও প্রেম-মোহ কাটাইয়া যাইবার একটা সংকেত আছে।

ব্যাখ্যা

(১) নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না, কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়।

'পথপ্রান্তে' রচনাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবনের পথিকধর্মের কথা বলিয়াছেন। চলাই মানুষের জীবনের ধর্ম এবং প্রেমই চলার পথের শক্তি।

পথিক যে পথ চলে তাহার মূলে রহিয়াছে প্রেম। প্রেম না থাকিলে সে আদৌ চলিতেই পারিত না। যেখানে প্রেমের বিকার হইয়া মোহের উদ্ভব হয়, সেখানে মানুষের জীবনের প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। যথার্থ প্রেম মানুষের জীবনকে স্রোতোধর্মী করিয়া তুলে।

নৌকার গুণের সহিত প্রেমের তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্যটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন। নৌকার গুণ নৌকার সহিত বাঁধা।

কিন্তু তাহা কেবলমাত্র বাঁধিয়া রাখার জন্য নয়, তাহার উদ্দেশ্য একেবারে স্বতন্ত্র। গুণ দিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া যায়। তেমনই প্রেমের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের একটা সম্পর্ক রচিত হয় বটে কিন্তু তাহা মানুষকে কোনো স্থলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে না—মানুষের জীবনকে আগাইয়া লইয়া চলাই তাহার উদ্দেশ্য।

(২) এককে অতিক্রম করিবার উদ্দেশেই একের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।

• 'রুদ্ধ গৃহ' রচনাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে মানুষের জীবনের গতিশক্তির মূলে বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। প্রেম আছে বলিয়াই মানুষ চলে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, প্রেম মানুষকে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু প্রেমের মধ্যে একটি ব্যক্তির সহিত আর এক ব্যক্তির সংযোগ থাকিলেও তাহাই শেষ কথা নয়। প্রেম ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া একটা শক্তিরূপে মানুষের জীবনে আবির্ভূত হয়। সেই আবির্ভাবের মূলে হয়তো কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তি থাকে, কিন্তু প্রেম সেই এককে অবলম্বন করিয়া অনেকের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া দেয়। একের মধ্যে বদ্ধ হইলে যাহা মোহ হইয়া পড়ে, বহুর মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া সেই হৃদয়বৃত্তিই প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়।

মায়ের কোলে যখন ছেলে আসে তখন তিনি কেবল সেই ছেলেটিরই মা হইয়া থাকেন না, তখন বিশ্বের সকল ছেলের মায়ের স্থান তিনি পাইয়া যান। তাঁহার প্রেমের অবলম্বন তাঁহার নিজের সন্তান, কিন্তু লক্ষ্য, পৃথিবীর সকল সন্তান। বিশেষ সন্তানের দিকে অগ্রসর হইয়াই তিনি সমস্ত সন্তানকে ভালোবাসিতে পারেন।

লাইব্রেরি

লাইব্রেরি লেখকের নিকট কী ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে? ইহা তাঁহার অন্তরে আর যে চিন্তাটি জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহার পরিচয় দাও।

সমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল যদি একস্থানে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যাইত, তাহা হইলে যেরূপ হইত, লাইব্রেরির মধ্যে তাহাই হইয়াছে। এখানে ভাষা নীরব, প্রবাহ স্থির, মানবাত্মা এখানে কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে বদ্ধ। ইহার মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যা বাঁধা পড়িয়াছে।

মানুষ বিদ্যুৎকে তারের মধ্যে বাঁধিয়াছে—এখানে শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিয়াছে। সংগীত, হৃদয়ের আশা, আত্মার আনন্দোচ্ছ্বাস, আকাশের দৈববাণী সবই এখানে কাগজের মধ্যে বন্দী। এখানে এক একখানি বই অতীতকে বর্তমানের সহিত জুড়িয়া দিয়া কালসমুদ্রের উপর সাঁকো রচনা করিয়াছে।

লাইব্রেরির মধ্যে সহস্র পথ আসিয়া মিশিয়াছে। কোনো পথের শেষ অসীম সমুদ্র, কোনো পথের শেষ অত্যুচ্চ শিখর, আর কোনো পথের শেষ অতল মানবহৃদয়। কোনো দিকে এতটুকু বাধা নাই—এখানে মানুষের মুক্তি এতটুকু জায়গায় বাঁধা।

লাইব্রেরির মধ্যে অগণিত হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায়। এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি রহিয়াছে। বাদ ও প্রতিবাদ, সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করে। দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ এখানে কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া পরম শান্তিতে রহিয়াছে।

এখানে কত পথ অতিক্রম করিয়া কত দূর দেশ হইতে কত যুগ পার হইয়া মানুষের কণ্ঠ এখানে পৌঁছিতেছে। এখানে আলোকের জয়গান ধ্বনিত হইতেছে।

অমৃতলোক আবিষ্কার করিয়া যে মহাপুরুষ একদিন উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, মানুষ অমৃতের পুত্র ও দিব্যধামের অধিবাসী, সেই মহাপুরুষের কণ্ঠ সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এখানে বিরাজ করিতেছে।

লাইব্রেরির মধ্যে সর্বযুগের সর্বদেশের মানুষের ভাষার কথা অনুভব করিয়া লেখকের মনে হইতেছে যে, বিশ্ববাসী যেখানে মুখর, সেখানে বাঙালীরও

কিছু বলিবার আছে। সকলেই যেখানে ভাষাময়, বাংলাদেশ কি সেখানে মূক হইয়া থাকিবে? আমাদের সমুদ্র, হিমালয় হইতে প্রবাহিত গঙ্গা, আমাদের কত কথার ইঙ্গিতই না দিতেছে। আমাদের মাথার উপর নীলাকাশে নক্ষত্রের জ্যোতির্ময়ীবাণী প্রস্ফুট হইতেছে।

দেশবিদেশ হইতে মানবজাতির অসংখ্য বাণী আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিতেছে; তাহার উত্তরে আমরা কি কেবল কয়েকটি ইংরেজি খবরের কাগজমাত্র লিখিব? অসীম কালের পটে সকল দেশের নাম রহিয়াছে, বাঙালীর নাম কি দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতায় লেখা থাকিবে? সারা জগৎ জুড়িয়া যখন মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, তখন কি আমরা আমাদের তুচ্ছ বিবাদ-বিসংবাদ লইয়া মাতিয়া থাকিব?

বহু বৎসরের নীরবতার পর বাংলাদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। এখন সে আপনার ভাষায় আপনার কথা বলুক। তাহার কণ্ঠের সহিত মিশিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

ব্যাখ্যা

অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক খানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

'লাইব্রেরি' নিবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরির মধ্যে অসীমকালের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন। সুদূর অতীত হইতে কত লোক তাঁহাদের হৃদয়ের কথা গ্রন্থের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই হৃদয়ের সংবাদ গ্রন্থের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুদূর অতীতে তাঁহারা যে কথা বলিয়াছেন, বর্তমানে তাহা আমরা বর্তমানকালে শুনিতে পাইতেছি। মানুষ এখানে তাহার অতীত-কালকে বর্তমানের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। চারিদিকে যেন একটি অতলস্পর্শ কালসমুদ্র বর্তমান, তাহার উপরে এক একখানি বই যেন এক একটি সাঁকো রচনা করিয়া এক যুগকে আর এক যুগের সহিত জুড়িয়া

দিতেছে। বইয়ের মধ্য দিয়া আমরা বিভিন্ন যুগের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারি। অতীত যুগের ভাষা এই বইয়ের সাঁকো দিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া পৌছায়!

নববর্ষা

নববর্ষা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যেভাবে প্রতিভাত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

শেষ যৌবনে রবীন্দ্রনাথের নিজেকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছে। প্রথম যৌবনে তাঁহার নিজের অন্ত ছিল না, সংসারও ছিল রহস্যে ভরা। কিন্তু এখন সবই যেন একটা পরিণতিতে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাঁহার পৃথিবীর পরিধিও সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এই বাহ্য সংসার এত বেশি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, এই পৃথিবীতে এমন কত কর্মশালা বহুবার যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ইহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। কত বিষয়ী লোক স্বার্থ লইয়া বিরোধকে চরম বলিয়া মনে করিয়াছিল; তাহাদের নাম পৃথিবী হইতে মুছিয়া গিয়াছে অথচ পৃথিবী আপন কক্ষপথে আগের মতোই আবর্তন করিতেছে।

কিন্তু নববর্ষা প্রতি বৎসরই আমাদের কাছে তাহার একাধারে নূতন ও পুরাতন রসসমৃদ্ধি লইয়া আসে। আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে বলিয়া আমাদের সংকোচের সঙ্গে তাহা সঙ্কুচিত হয় না। আমরা যখন পৃথিবীর অজস্রবিধ আঘাতে বেদনাহত হইয়া পড়ি, তখন আমাদের চারিদিকেও সেই আঘাতের বেদনা সঞ্চারিত হইয়া যায়। দুঃখের বাণ আমাদের বিদীর্ণ করিয়া পৃথিবীকে বিদ্ধ করে। আমাদের সুখদুঃখের ছাপ লাগিয়া পৃথিবীটা আমাদের একেবারে নিজস্ব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মেঘের মধ্যে আমিত্বের এতটুকু স্পর্শ নাই। জরা এই পথিককে স্পর্শ করিতে পারে না—আমাদের আশা-নিরাশার বহুদূরে তাহার স্থান।

এই জন্যই কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখর হইতে যে মেঘ দেখিয়াছিলেন

আমরাও সেই মেঘ দেখি—ইতিহাসের পরিবর্তন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মেঘদূতের মেঘ পুরাতন হইয়াও প্রতি বৎসর নূতন হইয়া দেখা দেয়; অথচ উজ্জয়িনী কবে হারাইয়া গিয়াছে।

এই জন্যই মেঘ দেখিলে সুখী ব্যক্তির মনেও যেন অন্যমনাভাব দেখা যায়। মেঘ মানুষের সংসারের মধ্যে আবদ্ধ হইবার নয় বলিয়া মানুষকে সংসারের অভ্যস্ত সীমার বাহিরে লইয়া যায়। মেঘের সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের কোনো সম্পর্ক নাই বলিয়া তাহা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। মেঘ দেখিয়া নির্বাসিত যক্ষের বিরহ উদ্দাম হইয়া উঠে। মেঘ সংসারের প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিয়া আমাদের হৃদয়কে বাঁধ ভাঙিয়া উধাও হইতে প্ররোচিত করে।

মেঘের অপরূপ চিত্রবিন্যাস, তাহার ঘন অন্ধকার, গর্জন, বর্ষণ এই পরিচিত পৃথিবীর উপরে একটা অপরিচিত জগতের আভাস আনিয়া দেয়—তাহা যেন সুদূর দেশ ও কালের ছায়া ঘনাইয়া তোলে। অভ্যস্ত জগতে যাহা অসম্ভব বলিয়া জানা ছিল, তাহাই এখন সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সংসারের নিয়মের কথা সে ভুলিয়া যাইতে চাহে; নিবিড় বর্ষার দিনে সেই নিয়মের কথা তাহার আর মনে থাকে না।

এই পৃথিবী আমাদের কাছে ভোগের ফলে খর্ব হইয়া গিয়াছে। আমরা তাহার যেটুকু পাই সেইটুকুকেই আমরা সত্য বলিয়া জানি। ভোগের ক্ষেত্রের বাহিরেও তাহার যে অস্তিত্ব আছে আমরা যেন তাহা ভুলিয়া যাই। আমাদের জীবন পৃথিবীকে তাহার প্রয়োজন-মতো সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া আমরা নিজের মধ্যেও যেমন পৃথিবীর মধ্যেও তেমনই কোনো রহস্য দেখিতে পাই না। এমন সময় কোথা হইতে কলিদাসের কালের সেই মেঘ সারা আকাশ স্নিগ্ধ ছায়ায় আবৃত করিয়া আসে। সেই মেঘ সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ হইবার নয়। সেই মেঘ আমাদের কোন্ অলকাপুরীতে কোন্ সৌন্দর্যভবনে বিরহের বেদনা ও মিলনের আশ্বাসের মধ্যে আকর্ষণ করিতে

থাকে। তখন পৃথিবীর পরিচিত পরিসরটুকুকে অতিক্রম করিয়া যাহা আমাদের অগোচর, তাহাই যেন আমাদের কাছে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখনই আমাদের এই বোধ জাগে যে, আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা নিতান্ত সামান্য; যাহা আমরা লাভ করি নাই তাহার পরিমাণ অসামান্য।

নববর্ষা আমাদের অভ্যস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া অজ্ঞাত ভাবজগতের মধ্যে আমাদের টানিয়া লইয়া যায়—আমাদের সকল নিয়মের বাহিরে আকর্ষণ করে। বহু বৎসরের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া তাহা যেন আমাদের মেঘদূতের জগতে স্থাপন করে। রামগিরির নির্জন শিখর ও অলকাপুরীর মাঝখানে যে একটি সুন্দর পৃথিবী রহিয়াছে, তাহার কথা আমাদের মনে পড়ে। আমাদের অন্তর যেন পৃথিবীর পরম রমণীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে দীর্ঘ বিরহের অবসান ঘটাইবার জন্য মানসগামী হংসের মতো উৎসুক হইয়া উঠে।

"পূর্বমেঘে বহু বিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয়, এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন।"—আলোচনা কর।

নববর্ষার মধ্যে যে একটা সুর আছে তাহা আমাদের পরিচিত সংসার হইতে একটা বৃহত্তর জগতের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। নববর্ষার এই ভাবটির কথা বলিতে গিয়া লেখক রবীন্দ্রনাথের কালিদাসের মেঘদূতের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইয়াছে যে, মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য আর কোনো সাহিত্যে রচিত হয় নাই। এই কাব্যে সমস্ত বেদনা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে প্রতি বৎসরই যে মেঘোৎসব ঘটে তাহা যেন এই কাব্যে মানুষের ভাষায় রূপায়িত হইয়াছে।

কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য দুইভাগে বিভক্ত—পূর্ব মেঘ ও উত্তর মেঘ। ইহার মধ্যে পূর্বমেঘে সুবিস্তৃত জগৎ আমাদের কাছে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিশ্চিন্ত আরামে আমাদের গৃহের সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে কাটাইতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ সহসা আমাদের ঘরছাড়া করিয়া দিয়াছে। আমাদের গৃহ হইতে বহু দূরে যে নর্মদা চঞ্চলগতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে,

যে চিত্রকূটের পাদদেশ কদম্বশোভিত, গ্রামান্তর্বর্তী যে চৈত্যবট ও শুককাকলিতে মুখর—তাহাই আমাদের অভ্যস্ত সংসারজীবনকে অতিক্রম করিয়া চিরন্তন সৌন্দর্যের বার্তা বহন করিয়া আনে।

বিরহী যক্ষের চিত্ত অলকাপুরী যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেও কবি পথের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করেন নাই। আকাশে যখন নীলমেঘ ঘনাইয়াছে তিনি তখন ধীরমন্থর গতিতে নদ-নদী-নগর-জনপদের উপর দিয়া বিচরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রকৃতির যে সৌন্দর্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে তাহাকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্ত যক্ষের সমধর্মা হইয়া বিরহের বেগে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কবি পথের সৌন্দর্যের আকর্ষণ দিয়া তাহার সেই গতিকে মন্থর করিয়া তুলিয়াছেন। লক্ষ্য অলকাপুরীর পথ যে সুন্দর, তাহাকে উপেক্ষা করা যায় না।

বর্ষায় আমাদের পরিচিত সংসার হইতে বাহির হইয়া আমাদের মন বাহিরের দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়। পূর্বমেঘে কবি আমাদের সেই বাসনাকে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাকেই প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন—মেঘের সঙ্গী করিয়া দিয়া আমাদিগকে অপরিচিত জগতের মাঝখানে লইয়া গিয়াছেন। সেই পৃথিবী আমাদের ভোগেবদ্ধারা আবিল হইয়া পড়ে নাই—অতি পরিচয়ের ফলে আমাদের কল্পনা সেখানে বাধাগ্রস্ত হয় না। ঐ মেঘের মতোই সেই পৃথিবীও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ ও ক্লান্তি অবসাদের স্পর্শে মলিন হয় নাই। প্রৌঢ় বয়সের নিশ্চয়তার বেষ্টন তাহাকে বিষয়সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করে নাই।

অপরিজ্ঞাত বিশ্বের সঙ্গে নবীন পরিচয়ই পূর্বমেঘের বিষয়বস্তু। বর্ষার মেঘ ইহা ছাড়াও আমাদের চারিদিকে একটা আনন্দময় পরিমণ্ডল রচনা করিয়া অন্তরের ধনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—সৌন্দর্যলোকবাসী চির-প্রিয়ের জন্য আমাদের অন্তরকে উৎকণ্ঠ করিয়া তোলে।

পূর্বমেঘের মধ্যে বিশ্বের বিচিত্র রূপের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছে আর উত্তর-মেঘে পৃথিবীর সেই বহু বিচিত্রের মধ্য দিয়া যাত্রা করিবার পর স্বর্গলোকে

পরমানন্দদায়ী একের সঙ্গে মিলন। পূর্বমেঘের মধ্যে কালিদাস পৃথিবীর সৌন্দর্য সম্ভারের অজস্র খণ্ডচিত্র রচনা করিয়াছেন; উত্তরমেঘের বিচরণভূমি অলকাপুরী হইলেও সেখানে কবি বিচিত্র রূপের সন্ধানে বাহির হন নাই—বিরহের অত্যুগ্র বেদনাই সেখানে স্ফুটতর হইয়া একমাত্র দয়িতের চিন্তাকেই অবলম্বন করিয়াছে।

আমরা যে বিষয়কর্মবেষ্টিত ক্ষুদ্র সংসারের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকি, ইহা তো একরূপ নির্বাসনই। নিদারুণ অভিশাপই আমাদের এই বন্দী দশার কারণ। নববর্ষায় মেঘরাশি আসিয়া আমাদের বাহিরে যাইবার জন্য আহ্বান জানায়—সেই আহ্বানই পূর্বমেঘের সংগীত; আর সেই যাত্রার পরিণামে যে চিরমিলনের আশ্বাস আছে তাহাই উত্তরমেঘের বাণী।

সব কবির কাব্যের মধ্যেই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের দ্বৈধীধারা নিহিত আছে। সব বড়ো কাব্যেই একদিকে বৃহতের প্রতি আকর্ষণ অপর দিকে নিভৃতের দিকে নির্দেশ আছে। প্রথমে বন্ধন ছেদনের জন্য আহ্বান, তারপর ভূমার সঙ্গে মিলন। যেন একটা দীর্ঘ তানের মধ্যে আবর্তনের পর সংগীত সমে আসিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে।

যে কবির কাব্যে উদ্যম আছে কিন্তু আশ্বাস নাই সেই কবির কবিত্বকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া যায় না। পরিণামে আশ্বাস না থাকিলে যাত্রা নিষ্ফল; মেঘদূতের মতোই প্রতিকাব্যের মধ্যে আমরা দুটি জিনিসের সন্ধান করি—একটি যাত্রার পথ আর একটি যাত্রার লক্ষ্য।

ব্যাখ্যা

(১) মেঘের সহিত আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা চেষ্টা কাজকর্মের কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়।

'নববর্ষা'য় রবীন্দ্রনাথ মেঘকে প্রাত্যহিক কর্মজাল হইতে মুক্তির দূত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

আমাদের মন যখন সংসারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তখন আর আমরা কোনো দিকে চাহিতে পারি না। পরিচিত জগৎ নিত্য অভ্যাসের ফলে আমাদের চারিদিকে একেবারে অচল অনড় হইয়া বসিয়া থাকে। সেই অভ্যস্ত সংসারের মধ্যে এতটুকু নূতনত্ব নাই তাহা তাহার অতি পরিচিতির ফলে প্রয়োজনের সংকীর্ণতার ফলে আপনার মাধুর্যটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু নববর্ষার মেঘ আমাদের প্রয়োজনের সামগ্রী নয়। তাহার মধ্যে যে স্নিগ্ধ ছায়ার সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হইতে থাকে তাহা আবহমান কাল হইতে চির নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া আসিতেছে। এইজন্য যখন আমাদের মন অভ্যস্ত জীবনের কাজে কর্মে একেবারে বাঁধা পড়িয়া যায়, তখন এই মেঘ তাহার কাছে যেন মুক্তির সংবাদ আনিয়া দেয়, কাজ হইতে ছুটির দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

(২) ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী, এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে খর্ব হইয়া গিয়াছে।

'নববর্ষা' নিবন্ধের এই ছত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ নন্দনতত্ত্বের একেবারে গোড়ার কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন।

সৌন্দর্যের মূল কথা হইল তাহার চমৎকারিত্ব। যাহা নিত্য নূতন-ভাবে প্রকাশিত হইয়া আমাদের কাছে ধরা দেয়, যাহার মধ্যে এমন একটা নবীনতা আছে যে, তাহাকে আমাদের অন্তর কখনও পুরাতন বলিয়া উপেক্ষা করে না, তাহাই সৌন্দর্যরূপে আমাদের হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিয়া তুলে।

কিন্তু আমাদের পরিচিত জগতের মধ্যে এই চমৎকারিত্বের, এই নবীনতার, এই বিপুলতার কোনো স্থান নাই। সংসারকে আমরা সৌন্দর্যরসপিপাসুর দৃষ্টিতে দেখি না। তাহাকে আমাদের ব্যক্তিগত ভোগের সামগ্রীরূপেই আমরা দেখি। তাহার মধ্যে আমাদের প্রত্যাশা সীমাবদ্ধ। এইজন্যই পৃথিবী বিপুল ও চিরনবীন হইলেও আমাদের ভোগবাসনার দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায়

তাহা খর্ব হইয়া পড়িয়াছে; তাহার মধ্যে আমরা আর সৌন্দর্য ও আনন্দের উপাদান খুঁজিয়া পাই না।

(৩) হৃদয় পৃথিবীর বনে বনে, গ্রামে গ্রামে, শৃঙ্গে শৃঙ্গে, নদীর কূলে কূলে, ফিরিতে ফিরিতে, অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।

আমাদের অন্তর মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মতো সংসারের ক্ষেত্রে নির্বাসিত হইয়া আছে। নববর্ষার মেঘ একদিন যেমন বিরহী যক্ষের অন্তরকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনই তাকে পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে আকর্ষণ করিয়া তাহার বন্দীদশা ঘুচাইয়া দিতে চায়।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের পূর্বভাগে পৃথিবীর এই বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে বিচরণের চিত্র আছে। আমাদের হৃদয়ে সৌন্দর্যের প্রতি যে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে তাহা মিটাইবার জন্য কবি মেঘের সহিত আমাদের হৃদয়কে পৃথিবীর সৌন্দর্যক্ষেত্রে বিচরণ করাইয়াছেন। পৃথিবীর বনে বনে, গ্রামে গ্রামে, শৃঙ্গে শৃঙ্গে, নদীর কূলে কূলে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহার সহিত আমাদের বিরহী চিত্তের প্রথম পরিচয় ঘটে। সেই পরিচয়ের পর আমাদের হৃদয় নন্দনলোকবাসী বল্লভের জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া সেদিকে যাত্রা করিতে থাকে।

(৪) তানের মধ্যে আকাশপাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।

'নববর্ষা' রচনাটির মধ্যে মেঘদূতের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই আমাদের অন্তরকে একবার বাহিরের বিচিত্র সৌন্দর্যলোকে টানিয়া আনে, তারপর আবার তাহাকে নিভৃতলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। 'মেঘদূত' কাব্যের মধ্যে পূর্বমেঘে কবি পৃথিবীর নদীগিরিবন-জনপদের অপরূপ সৌন্দর্যের সহিত পরিচিত হইতে হইতে অলকাপুরী-নিবাসিনী প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন। প্রথমে বাহিরে যেখানে

রূপলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে সেখানে বিচিত্র রসসম্ভোগের মধ্যে আমাদের হৃদয়কে স্থাপিত করিয়াছেন, আবার পরেই অন্তরের নিভৃত মন্দিরে যেখানে আমাদের পরম আনন্দের নিদান রহিয়াছে, সেখানে আমাদের লইয়া গিয়াছেন।

তান ও সমের উপমাটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় এবং এখানে তাহা অর্থবাহী হইয়াছে। তানের মধ্যে স্বরের প্রবাহের ফলে সুরের বিচিত্ররূপ ফুটিয়া উঠে; আর সমের মধ্যে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়া গানের আনন্দকে পরিপূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলে। পরিপূর্ণতার আনন্দের সার্থকতাটুকুর জন্যই তানের বিচিত্র প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে।

কেকাধ্বনি

"যাহা গভীর তাহা আপাততঃ বহু লোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে, তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে তাহা সহজে জীর্ণ হয় না"—লেখক এই কথাটি কীভাবে উদাহরণযোগে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আলোচনা কর।

লেখকের এক বন্ধু একবার ময়ূরের ডাক শুনিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ময়ূরের ডাক সহ্য করিতে পারেন না—ময়ূরের ডাকের মধ্যে কর্কশতা আছে, অথচ কবিরা যে কেন তাহাকে কাব্যে স্থান দিয়াছেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না।

কবিরা যখন একই সঙ্গে বসন্তের কুহু আর বর্ষার কেকাকে সমান মর্যাদা দিয়াছেন তখন এমন মনে হইতে পারে যে, তাঁহাদের ভালোমন্দ বিচারবোধ নাই; এমন কি ব্যাঙের ডাক বা ঝিল্লির ঝংকারকেও তাঁহারা কাব্যের মধ্যে স্থান দিয়াছেন—বর্ষার সংগীতের সঙ্গে এইগুলিকেও যুক্ত করিয়াছেন।

কোনো কোনো জিনিস স্বভাবতই মিষ্ট—তাহার মিষ্টত্ব আমাদের

ইন্দ্রিয়ের নিকট নিঃসংশয়ভাবে প্রতিভাত হয়। কিন্তু সেই অসন্দিগ্ধ সৌন্দর্য আমাদের মনের আবিষ্কার নয়, তাহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের স্বীকৃতি। সেই মিষ্টত্বকে অন্তঃকরণ দিয়া যাচাই করিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া আমাদের মন অনেক সময় তাহাকে অবজ্ঞা করে। গানের সমঝদার নিছক মিষ্টগানকে নিন্দা করে, কারণ, মিষ্টগান আমাদের ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দেয় বটে, কিন্তু তাহা আমাদের মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনকে নাড়া দেয় না। বাজে রসের মিষ্টতা দিয়া গানের রসের খর্বতা ভরাইতে গেলে সে তাহা গ্রহণ করে না—সেই মিষ্টতা গানের যথার্থ মূল্যকে নামাইয়া দেয়।

যাহা স্বভাবতই মিষ্ট তাহা আমাদের মনে অতি শীঘ্রই আলস্য আনিয়া দেয় বলিয়া বেশিক্ষণ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। মিষ্টত্বের সীমা পার হইয়া গেলেই আমাদের অন্তর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে। এইজন্যই যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়াছে সে গোড়ার দিককার মিষ্ট ও সহজ অংশকে খাতির করে না, কারণ তাহার সীমা তাহার কাছে জানা হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য তাহার অন্তঃকরণ সেটুকুতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই অংশটুকু বুঝিতে পারে অথচ তাহার সীমাবোধ নাই; সেইজন্য সে অগভীর অংশে আনন্দবোধ করে। সমঝদারের আনন্দকে সে কিম্ভূত ব্যাপার এমন কি কপটতা বলিয়া মনে করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। সর্বপ্রকার কলা-বিদ্যার মধ্যেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্নপথগামী এবং উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞার ভাব বর্তমান।

গভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত সংযোগ ও নিকটবর্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ, মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে এই আনন্দ ভোগ করা যায় না। উপর হইতে কেবল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সুখ পাওয়া যায় তাহার তুলনায় ইহার ব্যাপকতা, গভীরতা ও স্থায়িত্ব অনেক বেশি। যাহা অগভীর তাহা লোকের শিক্ষা বা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু যাহা গভীর তাহা আপাতত

বহুজনগম্য না হইলেও তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ থাকে, কাল তাহাকে জীর্ণ করিতে পারে না।

জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' সুমধুর বটে, কিন্তু তাহা আমাদের মনকে জয় করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের কাছে উপভোগ্য করিলেও মন তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। ইহার পাশাপাশি কুমারসম্ভবের একটি শ্লোক স্মরণ করা যাইতে পারে—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥

এই শ্লোকটি জয়দেবের রচনার মতো ললিত নয়, কিন্তু তবুও মনে হয় যে, ইহা ললিতলবঙ্গলতার চেয়ে অধিকতর মিষ্ট। বাস্তবিক পক্ষে মন আপনার সৃজনী শক্তির সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের সুখ পূরণ করিয়া লইতেছে। এখানে শ্রুতিমধুরতা দিয়া ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়াস নাই বলিয়া মন আপনাকে বিস্তৃত করিবার অবকাশ পাইয়াছে। পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা—এই ছত্রটির মধ্যে লয়ের উত্থান পতনে কঠোর ও কোমলের মিশ্রণে ছন্দের যে একটি দোলা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা জয়দেবের কবিতার ছন্দের মতো অতি প্রত্যক্ষ নয়, তাহা নিগূঢ়। তাহা অলস মনের কাছে ধরা পড়ে না, তাহা প্রয়াস করিয়া আবিষ্কার করিতে হয়। ভাবের সৌন্দর্য মনের কাছে এমন একটা অশ্রুতি-গম্য সংগীত রচনা করে যে, মনে হয় যেন কান জুড়াইয়া গেল। এই মায়াবী মনকে সৃষ্টির অবকাশ না দিলে কোনো মিষ্টতাকে অধিকক্ষণ মিষ্ট বলিয়া মনে হয় না। মনের সৃজনশক্তি থাকিলে তাহা কঠোর ছন্দকে ললিত এবং কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। মিষ্টতা ইন্দ্রিয়মাত্র গোচর না হইয়া মানসী সৃষ্টি হইলে গভীর ও কালজয়ী হইতে পারে;

'কেকাধ্বনি' রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সহিত মানব-মনের যে গভীর সংযোগের কল্পনা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দাও।

মহাকবি কালিদাসের কাব্যে দূরের প্রকৃতি মানুষের একেবারে কাছের জিনিস হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা গভীর সংযোগ পরিস্ফুট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কল্পনাকে আর এক ধাপ অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।

বর্ষার কেকাধ্বনির মধ্যে যে মিষ্টতা আছে তাহা বসন্তের কুহুধ্বনির মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র। বর্ষায় মহারণ্যমধ্যে যে মত্ততা দেখা যায়, কেকাধ্বনি তাহারই গান। বর্ষার মধ্যে যে মহোল্লাসের সুর সারা প্রকৃতির মধ্যে ধ্বনিত হয়, কেকাধ্বনি তাহারই প্রতীক।

বিরহিণীর বিরহবেদনাও কেকাধ্বনির মধ্যে প্রকাশিত। ইহা শ্রুতিমধুর বলিয়া যে পথিকবধূকে ব্যাকুল করে তাহা নয়—ইহা বর্ষার সমগ্র মর্মটিকে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয় বলিয়াই পথিকবধূর চিত্তকে কাতর করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করিয়াছেন, "নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে; তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী—তাহা জল স্থল আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকেও নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক একটি ঋতু আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবের মতোই প্রকৃতির নিগূঢ় স্পর্শাধীন। সেইজন্য যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী সুরে বাজিতে থাকে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, জগতে ঋতু আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম জাগানো;

ফুল ফোটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তার আনুষঙ্গিক। তাই যে কেকারব বর্ষা-ঋতুর নিখাদ সুর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।"

প্রকৃতিকে এই যে মানবের হৃদয়াবেগের দ্যোতকরূপে দাবি, মূলত কালিদাসের কাব্য হইতে ইহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেও ইহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনা।

লেখকের নিকট কেকাধ্বনি, ব্যাঙের ডাক ও ঝিল্লিধ্বনি যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় দাও।

বসন্তে কোকিলের কুহুরব যেমন মধুর, বর্ষায় ময়ূরের কেকাধ্বনিও ঠিক সেইরূপ মধুর।—কিন্তু এই দুইয়ের মিষ্টতার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। কোকিলের কুহুধ্বনি বসন্তের গান এবং ময়ূরের কেকারব নববর্ষার সমাগমে গিরিপদবর্তী বিশাল অরণ্যের মধ্যে যে মত্ততা আবির্ভূত হয়, তাহারই গান। নবীন আষাঢ়ে তমালতালী বনের শ্যামশ্রীমণ্ডিত অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠে, অসংখ্য শাখ-প্রশাখা আন্দোলিত হইতে হইতে কলধ্বনিতে তাহাদের অন্তরের মহোল্লাস প্রকাশ করে, সেই উল্লাস-রসময় পরিবেশের মধ্যে ময়ূরপুঞ্জ কেকাধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলে; তাহাতে অরণ্যানীর সুপ্রাচীন বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে মহোৎসবের আনন্দ জাগিয়া উঠে। কবির কাছে কেকাধ্বনি সেই আরণ্য মহোৎসবের সংগীতটুকু বহন করিয়া আনে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াময় অরণ্য নীলমেঘপুঞ্জিত গিরিশিখর, প্রকৃতির সুবিপুল অব্যক্ত আনন্দরাশি লীন হইয়া থাকে।

ব্যাঙের ডাকের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতির কাব্যের দুইটি ছত্রের কথা মনে পড়িয়াছে—

মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

তাঁহার মনে হইয়াছে যে, ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্তভাবটির পরিচয় দেয় না, ইহার মধ্যে ঘন বর্ষার নিবিড় ভাবটি ব্যক্ত হয়। মেঘের মধ্যে কোনো

বর্ণসমারোহ নাই, মেঘের বিভিন্ন স্তরও নাই। সারা আকাশ ব্যাপিয়া ঘন কালো রং। সারা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোর রেখাপাত হয় নাই বলিয়া কোথাও এতটুকু বৈচিত্র্য নাই। ধানের কোমল সবুজ রং, পাটের ঘন সবুজ রং আর ইক্ষুর হরিদ্রাভা এই বিশ্বব্যাপী কালিমার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বাতাসের বেগ নাই। বৃষ্টির আশংকায় পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে অনেকদিন আগেই খেতের সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। পুকুর ছাপাইয়া গিয়াছে। এইরূপ ঔজ্জ্বল্যহীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন ধূসরিমার দিনে ব্যাঙের ডাক ঘনবর্ষার সুরটিকে ফুটাইয়া তুলে। তাহার একটানা সুর কালো মেঘ ও দীপ্তিহীন আলোকের মতো নিস্তব্ধ, নিবিড় বর্ষাকে চারিদিকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, বর্ষার গণ্ডিকে চারিদিকে আরও প্রসারিত করিয়া দিতেছে। তাহার নীরবতার চেয়েও একঘেয়ে একটি ভাব সঞ্চার করিয়া দেয়। ঝিল্লির শব্দ ইহার সহিত বেশ ভালোরকম মেশে। মেঘ ও ছায়ার মতোই ঝিল্লির শব্দও একটা আচ্ছাদনের মতো—ইহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপের মতো রাত্রির নিবিড়তাকে গাঢ়তর করিয়া তুলে।

ব্যাখ্যা

(১) বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিসের মূল্য নামাইয়া দেয়।

'কেকাধ্বনি' রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ শিল্পবোধের দিক হইতে একটি সত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ময়ূরের কেকাধ্বনির মধ্যে মিষ্টত্ব নাই, তবুও তাহা কবিদের কাছে বিশেষ মর্যাদা পাইয়া থাকে। এই ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হয় বটে কিন্তু আমাদের ভালো লাগার মূল কথাটি এখানে স্মরণ রাখিলে আমাদের কাছে ইহার অর্থবোধ কঠিন হয় না।

মিষ্টত্ব উপভোগ্য বটে কিন্তু তাহার আবেদন প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়ের কাছে। যে জিনিষের মধ্যে মিষ্টত্বটা মুখ্য হইয়া উঠে তাহার মধ্যে মিষ্টত্বটাই একমাত্র

গুণ—অন্ত গুণের কমতি এই গুণটি দিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যাহা যথার্থই সারবান্, যাহা যথার্থই সুন্দর বা আনন্দদায়ক তাহার মধ্যে এই আপাতমিষ্টত্ব নাই। যে গায়কের গান বাহ্যত মিষ্ট সে গায়কের গানের মধ্যে সার পদার্থ প্রায়ই থাকে না। মিষ্টত্বের রসে সিক্ত করিয়া সে তাহার গানকে কাটাইয়া দিতে চায়। ইহার ফলে গানের প্রকৃত মর্যাদার হানি ঘটে।

(২) আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না।

জয়দেবের কান্ত কোমল পদাবলীর মধ্যে এমন একটা মিষ্টত্ব আছে যাহা বিনা প্রয়াসেই আমাদের কাছে ধরা দেয়। তাহা আমাদের এতটুকু প্রয়াস করিতে দেয় না। তাহার মধ্যে যে মিষ্টত্ব আছে তাহা সহজেই আমাদের কাছে ধরা পড়ে কারণ তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদন জানায়।

কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কাছে মিষ্ট বলিয়া মনে হইলেও তাহা আমাদের মনের কাছে তেমন আদর পায় না। কারণ যাহা মিষ্টত্বেই অবসিত হইয়া যায় তাহার প্রতি আমাদের মনের কোনো আকর্ষণ থাকিতে পারে না। যাহা কেবলমাত্র শ্রুতিসুখকর তাহার মধ্যে বিস্তৃতি নাই; তাহা মনের মধ্যে এতটুকু আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে পারে না।

অপর পক্ষে কালিদাসের কাব্যে আমরা ছন্দের যে দোলা পাই তাহা কোমলে ও কঠোরে, ললিতে ও কঠিনে মিশ্রিত। আমাদের মন তাহাকে স্পর্শ করা মাত্রেই তাহার সবটুকু পায় না। তাহার মধ্যে এমন উপাদান আছে যাহা মনকে সৃজনকর্মের মধ্য দিয়া তাহাকে লাভ করিবার অবসর দেয়। এই অবসরটি থাকে বলিয়াই কালিদাসের কাব্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ গভীর ও কালাতিশায়ী এবং এই অবসরটুকু নাই বলিয়াই জয়দেবের কাব্য আমাদের কাছে তাহার মিষ্ট স্বাদটুকু পরিবেশন করিয়াই নিঃশেষিত হইয়া যায়।

(৩) জগতে ঋতু আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগানো।

কালিদাস তাঁহার 'ঋতুসংহার' কাব্যে ছয় ঋতুতে নরনারী কিভাবে প্রেমলীলায় দিনযাপন করে তাহার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বিভিন্ন ঋতুতে মানুষের প্রেম কি কি সুরে বাজিতে থাকে তাহাই তাঁহার কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কালিদাস যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনে হইয়াছে যে, কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য বর্তমান। প্রকৃতি কেবল আপনার জগতেই সৌন্দর্য ও মাধুর্যের বিচিত্র লীলা সৃজন করে তাহা নয়, তাহা মানুষের ভাববৃত্তিকেও জাগ্রত করিয়া তুলে। কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির বিচিত্র রূপসৃষ্টি মানুষের প্রেমলীলার সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে মনে হয় যে, কালিদাস মানুষের মনে প্রেম জাগানোকেই প্রকৃতির মুখ্য কাজ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। মানুষের চিত্তের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান বলিয়াই প্রকৃতি মানুষের কাছে অশেষ মূল্যবান্ হইয়াছে। মানুষের মনে যদি ভাব উদ্রেক করিতে না পারিত তাহা হইলে মানুষের কাছে প্রকৃতির কোন মূল্য থাকিত না।

বাজে কথা

'বাজে কথা' প্রবন্ধের বিষয়বস্তুটির বিশ্লেষণ করিয়া ইহার মধ্যে সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে মতটি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার পরিচয় দাও।

অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ মানুষ নিজের খেয়ালেই বাজে খরচ করে। তেমনই বাজে কথাতেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। উপদেশের কথার পথ আবহমান কাল হইতেই এক—তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। বাজে কথা নিজের মতো করিয়া বলিতে হয় বলিয়া তাহাতে বৈচিত্র্য বর্তমান।

যে ব্যক্তি পণ্ডিত তিনি যতক্ষণ উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন ততক্ষণই তাঁহার গরিমা। কিন্তু যে মুহূর্তেই তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন সেই মুহূর্তেই তাঁহার বিপদ। যে ব্যক্তি যখন কোনো বিশেষ কথা বলিবার না থাকিলে চুপ করিয়া থাকেন, তিনি অরসিক—রবীন্দ্রনাথ সেরূপ ব্যক্তির সাহচর্য ত্যাগ করিতে চাহিয়াছেন।

পৃথিবীতে সব জিনিষই প্রকাশধর্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে জ্বলে না, অথচ স্ফটিক অকারণেই ঝক্‌ঝক্ করে। কয়লা আবশ্যকের সামগ্রী, কিন্তু স্ফটিক প্রিয়জনের কণ্ঠের শোভা—তাহা মূল্যবান্। এক একজন মানুষ স্ফটিকের মতো স্বভাবতই ঝল্‌মল্ করিতে থাকে। কোনো উপলক্ষ ব্যতীতই সে আপনাকে সহজেই প্রকাশ করিতে পারে। কেহ তাহাকে দিয়া কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহে না। তাহার স্বতোদীপ্যমানতা দেখিয়াই আনন্দ। মানুষ প্রকাশকে এত ভালোবাসে যে, আবশ্যককে বিসর্জন দিয়াও সে উজ্জ্বলতার জন্য কাতর হইয়া উঠে। উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া যে জাতি প্রাণ দিতে পারে তাহার বিস্তারিত পরিচয় অনাবশ্যক।

কিন্তু সকলের মধ্যেই জ্যোতির প্রতি এইরূপ অনুরাগ নাই। অনেকেই বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক। তাঁহারা গুহা দেখিলে তাহার গভীরতার পরিমাপ করিতে চাহেন, কিন্তু আলো দেখিলে পতঙ্গের মতো উড়িবার বাসনা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কাব্য হইতে তত্ত্ব খুঁজিতে চাহেন, গল্প শুনিলে ভূয়সী গবেষণার পর তাহার নিন্দা বা সাধুবাদ করেন। অকারণ বা অনাবশ্যকের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ নাই।

যাঁহারা আলোক উপাসক তাঁহারা ইঁহাদের প্রতি বিরাগ পোষণ করিয়াছেন। বররুচি ইঁহাদের অরসিক বলিয়াছেন—অতটা বলা আমাদের কাছে রুচি-বিগর্হিত। আমরা মনে যাহা ভাবি মুখে তাহা বলি না; কিন্তু প্রাচীনরা অত সামলাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। তাঁহারা ইঁহাদের ভীল রমণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন যে পাকা কুল ভ্রমে গজমুক্তা কুড়াইয়া আপনার

ভ্রম বুঝিতে পারিয়া উহা দূরে ফেলিয়া দিয়াছে। যাঁহারা সৌন্দর্যের কথা বিস্মৃত হইয়া শুদ্ধমাত্র প্রয়োজনের মাপকাঠিতে কোনো জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করেন, কবি তাঁহাদের বর্বরনারীর সমান বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে, কবি ইঁহাদের সম্পর্কে নীরব থাকিলেই ভালো করিতেন। ইঁহারাই সাহিত্য বিচারের কর্তা, সুতরাং ইঁহাদের ক্ষোভ উদ্রেক না করাই সংগত।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলিতে কোনো বিশেষ একটা কথা বলার অবসর ঘটে না—সংস্কৃত সাহিত্যের মেঘদূতের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ধর্মকর্মের কথা বা পুরাণ বা ইতিহাস নয়। ইহা চেতন-অচেতনের বিচার বিলুপ্ত হওয়ার অবস্থার প্রলাপ। ইহা আমাদের প্রয়োজনের সামগ্রী নয়—ইহার মধ্যে যে ঔজ্জ্বল্য আছে তাহা মুক্তার সৌন্দর্যের সহিতই তুলনীয়।

কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এই কাব্যটি স্বচ্ছন্দভাবে যেন মেঘের মতোই উড়িয়া গিয়াছে এবং বিরহীর হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া নিরুদ্দেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

টেনিসন্ যে অকারণ অশ্রুবিন্দুর কথা বলিয়াছেন মেঘদূত তাহারই কাব্য। নির্বাসিত যক্ষের বিরহজনিত অশ্রুকে অকারণ বলা যায় না এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। কিন্তু যক্ষনির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার তো কাব্য রচনার উপলক্ষ মাত্র। এই বিরহটুকু অবলম্বন করিয়া তিনি কাব্যটি রচনা করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে কালিদাস অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন যে, সৌন্দর্য দেখিলে বা মধুর ধ্বনি শুনিলে আমাদের মনে অকারণ বিরহের বেদনা জাগিয়া উঠে—মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের প্রলাপ। এইজন্যই বিরহী তড়িৎকে দূত না পাঠাইয়া, মেঘকে সারা দেশের উপর দিয়া ধীর মন্থর গতিতে বিচরণ করাইতে পাঠাইয়াছে।

কাব্য পড়িবার সময় যদি একটা কিছু পাইলাম এ কথা মনে করিয়া কাব্য পড়িতে হয়, তাহা হইলে আমরা মেঘদূত পাঠান্তে এইটুকু মাত্র বলিতে

পারি যে, কালিদাসের সময়েও মানুষ ছিল এবং সে সময়েও আষাঢ়ের প্রথম দিন এমনই আসিত। কিন্তু বররুচি যাহাদের প্রতি অশিষ্ট উক্তি করিয়াছেন, তাঁহারা এইটুকু পাইয়া সন্তুষ্ট হইবেন না। সুতরাং অকারণ আনন্দ রসিকদের জন্যই তোলা থাক।

রবীন্দ্রনাথ অপ্রয়োজনের আনন্দকে কাব্যের মূল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে যে আনন্দ আমরা পাই তাহা প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় নাই, তাহা একটা অকারণ আনন্দের ফলে রসরূপে প্রকাশিত হয়। এই অকারণ প্রকাশের উপায় আছে বলিয়াই মানুষের পক্ষে শিল্পসৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে।

ব্যাখ্যা

(১) যাঁহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন, তাঁহারা তটবর্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উদ্‌বেজিত না করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

সংসারে সবাই কাব্যরসিক নয়। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন পাণ্ডিত্যই যাঁহাদের প্রধান পরিচয়। তাঁহারা বুদ্ধিমান্ বা বিবেচক বলিয়া প্রথিত—কিন্তু তাঁহারা কাব্যের মধ্য হইতে তত্ত্ব এবং কাহিনীর মধ্য হইতে ইতিহাস বা দর্শন আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। বররুচি এই ধরণের পণ্ডিতদের অরসিক বলিয়াছেন। অপর একজন প্রাচীন কবি একটি সংস্কৃত শ্লোকে ইঁহাদের প্রকারান্তরে প্রয়োজনীয়তাবোধমাত্রসম্পন্ন, সৌন্দর্যবোধহীন ও বর্বর বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই সব গবেষক পণ্ডিতদের রসিক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি আমাদের এরূপভাবে রূঢ় আঘাত করিবার পক্ষপাতী নন। তিনি জানেন যে, এই পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যায় পারঙ্গম ও শক্তিশালী এবং তাঁহারাই শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। কবিদের যদি সরস্বতীর কমলবনবাসী বলা যায়, ইঁহাদের বেত্রবনবাসী বলা যাইতে পারে—

বাস্তবিকপক্ষে গুরুমহাশয়ের হাতের বেতটিও স্মরণীয়। যাঁহারা কমলবনে বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে এই সব বেত্রবনবাসীদের বিক্ষুব্ধ না করাই ভালো। যাঁহারা কাব্যরসস্রষ্টা তাঁহাদের পক্ষে এই সব তথাকথিত কাব্যরস বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতাদের কোনোভাবে আক্রমণ না করাই সংগত।

(২) আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে যক্ষের নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার, ও-সমস্তই কালিদাসের বানানো, কাব্যরচনার ও একটা উপলক্ষ্যমাত্র।

'বাজে কথা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অকারণ প্রকাশকে সাহিত্যের মূল বলিয়া স্থাপনা করিয়াছেন। তিনি মেঘদূত কাব্যকে অকারণ অশ্রুধারা বলিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তিব প্রতিবাদে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মেঘদূতের অশ্রুধারা অকারণ নয়। এখানে যে যক্ষের কথা আছে সে রামগিরিতে নির্বাসিত হইয়া বিরহের বেদনা ভোগ করিতেছিল—বিরহীর সেই বেদনা তো অকারণ নয়।

ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, মেঘদূত কাব্যে যে যক্ষের কথা বলা হইয়াছে তাহা কবির কল্পনামাত্র—বাস্তবে উহা ছিল না। কালিদাস এই যে বিরহী যক্ষের কল্পনা করিয়াছেন সে তাঁহার কাব্যরচনার উপকরণ মাত্র। বস্তুতঃ, কালিদাসের কবিচিত্তে যে অকারণ বিরহের বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহাই কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মেঘদূত কাব্যের মধ্যে যে বিরহসংগীত ধ্বনিত হইয়াছে বাস্তবে তাহার মিল বা উৎস খোঁজা চলে না তাহা কবিহৃদয়ের অকারণ অশ্রু ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনও মানুষ ছিল এবং তখনও আষাঢ়ের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

রবীন্দ্রনাথ অকারণ প্রকাশকে কাব্যের মূলকথা বলিয়াছেন। মেঘদূত



কাব্যের মূলে যে কোনো তথ্য আছে ইহা তিনি স্বীকার করিতে চাহেন নাই। কবিহৃদয়ের অকারণ বেদনাই এই কাব্যের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘ দেখিয়া সুখীর হৃদয়েও বেদনা জাগিয়া উঠে—এই কাব্যে সেই বেদনার গাথা প্রকাশিত হইয়াছে।

তবে যাঁহারা কাব্য পড়িয়া একটা সারবান্ কিছু পাইতে চাহেন তাহাদের পন্থা অনুসরণ করিতে হইলে মেঘদূত কাব্যের মধ্য হইতে একটিমাত্র তথ্য আবিষ্কার করা যায়। তাহা এই যে, কালিদাসের কালেও মানুষ ছিল এবং তখনও আষাঢ়ের প্রথম দিনের মেঘজাল তাহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। কিন্তু এ তথ্য গবেষককে তৃপ্তি দিবে না, কারণ মানব প্রকৃতির অকারণ উচ্ছলতাই ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে এবং ইহার যথার্থ আবেদন একমাত্র রসিকের কাছেই সম্ভব হইতে পারে।

মা ভৈঃ

'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু বহুস্থলেই একটা আদর্শায়িত মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এখানে তিনি মৃত্যুকে একটি প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যেখানে সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হয়। পৃথিবীতে মৃত্যু না থাকিলে ছোটো বড়ো মাঝারির প্রভেদ নির্ণয় করা যাইত না। যে সব জাতি মৃত্যুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের আর কোনো কুণ্ঠা নাই। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা যেমন দানে, যথার্থ প্রাণবানের পরীক্ষাও তেমনই প্রাণ দিবার শক্তিতে। প্রাণহীনই মরিতে কাতর হয়।

যে মরিতে পারে সেই সুখের অধিকারী। যে সুখকে আঁকড়াইয়া থাকে, সে সুখের উচ্ছিষ্টমাত্র ভোগ করিতে পারে। আর যে মৃত্যুর

আহ্বানে সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, সে-ই সুখ কি তাহা জানে। সবলে ত্যাগ করিতে পারিলেই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারা যায়। যাহারা মরিতে পারে না, উপকরণের বাহুল্যের মধ্যেও তাহাদের দৈন্য ধরা পড়ে। ত্যাগের কঠোরতার মধ্যে যে পৌরুষ আছে তাহা স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারিলে সমস্ত লজ্জা হইতে মুক্তি ঘটিতে পারে।

এই দুইটি পথ আছে—একটি ক্ষত্রিয়ের আর একটি ব্রাহ্মণের। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিলে সুখসম্পদ লাভ করা যাইবে; যাহারা সুখকে অগ্রাহ্য করেন তাঁহারা আনন্দের অধিকারী। প্রাণ দিব বলার মতোই সুখ চাই না একথা বলাও কঠিন। পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের গৌরব লাভ করিতে হইলে এই দুইটির একটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। বীর্যের সহিত চাহিতে বা 'চাই না' বলিতে হইবে। শক্তিহীনভাবে 'চাই' বলা বা উদ্যম নাই বলিয়া 'চাই না' বলার মধ্যে কোনো সার্থকতা নাই—তাহা মৃত্যুরই তুল্য।

বাঙালী বর্তমানে জগতে স্থান করিয়া লইতেছে। কিন্তু তাহাকে কখনও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে তাহার আস্ফালন বেসুর বলিয়া মনে হয়। আমাদের পিতামহদের বিরুদ্ধে ইহাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ। তাঁহারা যদি মরিতে পারিতেন তাহা হইলে আমাদের মরিবার শক্তিতে আস্থা থাকিত। তাঁহারা যে অন্নের সংগতি রাখিয়া গেলেও মৃত্যুর সংগতি রাখিয়া যান নাই ইহা আমাদের পক্ষে পরম দুর্ভাগ্যের কথা।

ইংরেজ আমাদের দেশের যোদ্ধা জাতিদের বলে যে, তাহারা প্রাণ দিতে জানে; যাহারা প্রাণ দিতে জানে না কেবল বকিতে পারে তাহারা কংগ্রেস করিয়াছে—তাহাদের দলে তাহারা কেন যাইবে—তর্ক করিয়া ইহার উত্তর দেওয়া গেলেও লজ্জা ঘোচে না। যাহারা মরিতে পারে না তাহারা শান্তির সময়েও পরস্পরের সহিত মিশিয়া থাকিতে পারে না। ইহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা না গেলেও সত্য।

অথচ যখন দেখি যে, আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিয়াছেন তখন আমাদের আশা হয় যে, মরাটা কঠিন হইবে না। তাঁহাদের সকলেই স্বেচ্ছায় না মরিলেও অনেকেই যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বিদেশীরা তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। কোনো দেশেই সকলে স্বেচ্ছায় ও নির্ভয়ে মরে না। স্বল্প একদল মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করে—অপর দলগুলি তাহার সঙ্গী হয়।

মন হইতে ভয় যাইতে চায় না। মন হইতে ভয় দূর করিবার শিক্ষাই ছেলেদের প্রথমে দেওয়া উচিত—ভয়কে যেন তাহারা অস্বীকার করিতে পারে; সাহসের মিথ্যা গর্বও মার্জনীয়। কারণ ভয়ই মানুষের চরিত্রের সকল দৈন্য ও মূঢ়তার কারণ। ভয় নাই বলিয়া মিথ্যা অহংকার করিলেও তাহাতে ভীরু বলিয়া পরিগণিত হইবার লজ্জা যে আছে তাহা প্রমাণিত হয়। যথার্থ নির্ভীকতা না থাকিলেও লজ্জাও অনেক সময় মানুষকে শক্তি দান করে—লোকলজ্জায় প্রাণবিসর্জনও করা যায়। সুতরাং আমাদের পিতামহীদের কেহ কেহ লোকলজ্জায় প্রাণবিসর্জন দিলেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদের প্রাণবিসর্জন দিবার শক্তি ছিল—তাহার কারণ লজ্জা, প্রেম বা ধর্মোৎসাহ যাহাই হোক না কেন। বস্তুতঃ, রণক্ষেত্রে মরা সহজ; কিন্তু একাকিনী চিতাগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দেওয়ার বীরত্ব বহু গুণে কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনকারিণী পিতামহীদের প্রণাম নিবেদন করিয়া তাঁহাদের সন্তানদের মৃত্যু ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাঁহাদের আত্মবিস্মৃত বীরত্ব বীরপুরুষদেরও লজ্জা দিয়াছে। তাঁহারা মাধুর্যমণ্ডিত দাম্পত্যলীলার অবসানে বধূবেশে পতির চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত্যুকে সুন্দর, শুভ ও পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহাদের আত্মদানের স্পর্শে পবিত্র অগ্নি আমাদের মৃত্যুভয় দূর করিয়া অভয় ঘোষণা করুক—ইহাই তাঁহার একান্ত কামনা।

ব্যাখ্যা

(১) যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে তাহারাই প্রবলতাকে ভোগ করিতে পারে।

'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে ধ্বংসের পরিবর্তে শক্তির পরিচায়ক রূপে দেখিয়াছেন। মৃত্যু সকলের জীবনেই আসে, কিন্তু মৃত্যুকে মানুষ যে-ভাবে গ্রহণ করে তাহার মধ্যেই তাহার পৌরুষ বা মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না—মৃত্যুভয় যাহার কাছে তুচ্ছ, সেই যথার্থ প্রাণবান্। মনুষ্যত্বের শক্তি তাহার মধ্যে প্রকট। আর যে মরিতে ভয় পায়, সে প্রাণ দিতে সাহস পায় না। তাহার মধ্যে জীবনের ঔজ্জ্বল্য নাই, সে বাঁচিয়া থাকিয়াও মৃত, জগতের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে না, তুচ্ছ সুখের মোহে আবদ্ধ না হইয়া আপনার প্রাণশক্তিকে অসংখ্য বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়াও প্রকাশ করিতে পারে, সে-ই জীবনের জয়গৌরব লাভ করিতে পারে। যে আপনার আরাম ও তুচ্ছ সুখের মোহ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ বরণ করিতে পারে, তাহার শক্তি বিকশিত হইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখগুলি আহরণ করিতে পারে। যাহার মধ্যে ত্যাগ করিবার মতো প্রবল বীর্য আছে, সে-ই যথার্থভাবে ভোগ করিতে থাকে। জীবনকে প্রবলভাবে ভোগ করিবার জন্য যে প্রাণশক্তির প্রয়োজন, সবলে ত্যাগেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

(২) বিশ্বকর্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেই জন্য পৃথিবীতে অযৌক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাই।

'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে জীবনের শক্তির পরীক্ষা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে সমস্ত জাতি মৃত্যুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, যাহারা বীরের মতো মৃত্যুকে বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, তাহারাই পৃথিবীতে জয়ী হইয়াছে। আর যে সমস্ত জাতি মৃত্যুর জয়টিকা লাভ করে নাই,

তাহারা জীবনকে সবলভাবে অধিকার করিতে পারে নাই। এমন কি তাহাদের প্রাণশক্তি কম হইলেও তাহারা যে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে বাস করে তাহা নয়। তর্কশাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে সেই সব জাতির পক্ষে নিরীহ ও শান্তি-প্রিয় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখা যায় যে, তাহারা শান্তির সময়েও পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না—তুচ্ছ বিষয় লইয়া অশান্তি তাহাদের মধ্যে লাগিয়াই থাকে।

• রবীন্দ্রনাথ এখানে মৃদু কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন যে, বিশ্বকর্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না—তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যুক্তিবিদ্যায় পারঙ্গম হইয়া তাহার পর বিশ্বসৃষ্টিতে অগ্রসর হন নাই, এই জন্যই পদে পদে এমন অনেক ব্যাপার দেখা যায়, যুক্তি দ্বারা যেগুলির ব্যাখ্যা করা যায় না। লেখকের সরস কৌতুকটি লক্ষণীয়।

• (৩) দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনি চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মতো বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল।

বাঙালীর অন্যতম লজ্জা এই যে, তাহার পূর্বপুরুষেরা বীর্যের পরিচয় দিয়া মৃত্যুবরণ করিয়া তাহার জন্য মৃত্যুর উত্তরাধিকার রাখিয়া যান নাই। মৃত্যুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ঐতিহ্য নাই বলিয়া বাঙালী সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আমাদের পিতামহীরা যে সমান গরিমার সঙ্গে জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। তাঁহারা যে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতেন তাহাতে তাঁহাদের যে শক্তি ব্যক্ত হইত তাহা সামান্য নয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও এমন বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকিলেও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে সেখানে এভাবে আগাইয়া যাওয়া হয় না। তাহা ছাড়া দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করা হয় বলিয়া দলগত প্রেরণায় মৃত্যু বরণ করা কঠিন হয় না। কিন্তু পিতামহীরা স্বামীর চিতায় যেভাবে আরোহণ করিতেন তাহাতে তাঁহাদের যে বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত, রণক্ষেত্রে তাহা ছিল না। একাকী মৃত্যুবরণ দল বাঁধিয়া মরার চেয়ে অনেক কঠিন।

পরনিন্দা

'পরনিন্দা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিন্দার ধর্ম ও প্রয়োজন সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দাও।

সমুদ্রের লোনা জল যেমন পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে, পরনিন্দাও তেমনই জগৎ-সংসার জুড়িয়া আবহমান কাল হইতে বিরাজ করিতেছে। লবণজল না থাকিলে পৃথিবী যেমন পচিয়া যাইতে পারিত, নিন্দার অভাবে সমাজে তেমনই একটা বড়ো রকমের অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা বর্তমান। নিন্দার ভয়ে সমাজ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া রহিয়াছে।

নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের কোনো গৌরব থাকিত না। কোনো কাজের মধ্যে কেহ যদি গূঢ় মন্দ অভিপ্রায় দেখিতে না পাইল, তাহা হইলে সাধুতা যেন নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে। মহত্ত্বকে প্রতি পদে নিন্দা সহ্য করিতে হয়। ইহাতে হার মানিলে চলে না। কেবলমাত্র দোষীকে সংশোধন করা নিন্দার কাজ নয়, মহত্ত্বকে গৌরব দান করা তাহার একটা বড়ো কাজ।

অল্পলোকেই নিন্দাবিরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন। হৃদয়বান্ ব্যক্তিরই বেদনাবোধ অধিকতর। অথচ পৃথিবীতে হৃদয়বান্ পুরুষেরাই বড়ো কাজে হাত দেন এবং তাঁহাদের দেখিলেই লোকের নিন্দা প্রখর হইয়া উঠে। যেখানে অধিকার বেশী, সেখানে দুঃখ ও পরীক্ষাই বেশী। গুণী ব্যক্তির ভাগ্যেই নিন্দা, দুঃখ প্রভৃতি বেশী করিয়া জুটে। অযোগ্য ব্যক্তির উপর নিন্দাবর্ষণ করিয়া কোনো লাভ নাই।

সরলহৃদয় ব্যক্তিরা বলিতে পারেন যে, পৃথিবীতে নিন্দার উপকার থাকিলেও নিন্দা শুদ্ধমাত্র দোষীর দোষ না ধরিয়া যে দোষ করে না তাহার প্রতিও বর্ষিত হয়; এই মিথ্যা সংগত নয়। কিন্তু তাহা হইলে নিন্দা টেঁকে না। দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা নিন্দা নয়, তাহা বিচার। বিচারের গুরুভার লইবার শক্তি বা সময় খুব কম ব্যক্তিরই আছে। তাহা ছাড়া নিন্দুককে সহ্য করা যাইতে পারে কিন্তু বিচারককে সহ্য করা যায় না।

বাস্তবিকপক্ষে আমরা সামান্য কারণেই নিন্দা করিয়া থাকি—নিন্দার এই লঘুভার না থাকিলে সমাজ নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইত। নিন্দা এত লঘু যে নিন্দিত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহা উড়াইয়া দিতে পারেন। নিন্দা বিচারকের ন্যায় হইলে গুরুতর হইত। সংসারের প্রয়োজনে নিন্দার যতটুকু গুরুত্ব প্রয়োজন তাহা আছে, যতটুকু লঘুতা থাকা দরকার তাহারও অভাব নাই।

সহৃদয় ব্যক্তি এমন কথাও বলিতে পারেন যে, নিন্দা যদি করিতে হয় তাহাতে সুখ অনুভব না করিয়া দুঃখের সহিতই তাহা করা যাইতে পারে। কিন্তু নিন্দিত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিন্দুকও যদি বেদনা অনুভব করে তাহা হইলে সংসারে দুঃখের আর সীমা থাকে না। তাহা ছাড়া মানুষ সুখ না পাইয়া নিন্দা করিতে চায় না। বিধাতা মানুষকে ক্ষুধানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে রুচি-পরিতৃপ্তির সুখও অর্পণ করিয়াছেন।

আবিষ্কারের মধ্যেই একটা সুখের অংশ আছে। মৃগ যেখানে সেখানে পাওয়া গেলে তাহাকে শিকার করার মধ্যে সুখ থাকিত না। মৃগ গহন-বনচারী ও পলায়নপটু বলিয়া তাহাকে শিকার করিতে হয়—নতুবা তাহার প্রতি আমাদের অন্য কোনো আক্রোশ নাই।

মানুষের চরিত্র বিশেষ করিয়া তাহার দোষগুলি গহনচারী এবং পলায়ন-তৎপর—এইজন্য নিন্দার সুখ এত বেশী। নিন্দুক অপরের দোষগুলি জানে বলিয়া গর্ব করে। সে গুপ্ত অংশটিকে টানিয়া বাহির করে। বস্তুতঃ, যাহা লুকাইয়া থাকে বা পলাইয়া যায় তাহাকে বাহির করা বা বাঁধাতে মানুষের সুখ—তাহার জন্য সে অনেক কিছুই করিতে পারে।

মানুষ দুর্বলতাকে অনেক সময় বড়ো করিয়া দেখে। যাহা সুলভ তাহাকে আবরণমাত্র জ্ঞান করিয়া যাহা গুপ্ত তাহাকে সত্য জ্ঞান করা মানুষের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই গোপনতার পরিচয় পাইলে মানুষ সেটিকেই সত্য পরিচয় বলিয়া মনে করে; উপরের সত্যটাই যে বেশী সত্য হইতে পারে এবং ভিতরে যাহার আভাসমাত্র পাওয়া যাইতেছে তাহা মিথ্যা হইতে পারে-

এই কথাটি বিশ্বাস করানো শক্ত। এই মোহ আছে বলিয়াই পাঠক কাব্যের সরল সৌন্দর্যের চেয়ে গভীরতত্ত্বকেই সত্য বলিয়া মনে করে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রকাশিত সাধুতার চেয়ে অপ্রকট পাপকেই বেশী বাস্তব বলিয়া মনে করেন। এইজন্যই মানুষের নিন্দা শুনিলেই তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর বহু লোকের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ অসম্ভব হইলেও ইহার জন্য ব্যগ্রতা মানুষের বিশিষ্ট ধর্ম। যাহা বাহ্যত সুন্দর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঠকিবার ভয় মানুষের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে। অবশ্য সেই ঠকাই পৃথিবীতে চরম ঠকা নয় বা সেই না-ঠকার লাভকে চরম লাভ বলিয়া মনে করার কোনো কারণ নাই।

কিন্তু মনুষ্যচরিত্র এভাবে গঠিত যে, মানুষ নিন্দা করিয়া সুখ পায় এবং এই সুখ বিদ্বেষের সুখ নয়। বিদ্বেষ সুখকর নয় এবং তাহা সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হইলে সমাজের পক্ষে তাহা পরিপাক করা কঠিন হইয়া উঠে। অনেক ভালো লোক এবং নিরীহ লোকও নিন্দা করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের ভালো-ত্ব বা নিরীহ-ত্ব খর্ব হয় না, কারণ নিন্দার মূল প্রস্রবণটা মন্দ ভাব নয়। কিন্তু সংসারে বিদ্বেষমূলক নিন্দা যে নাই এ কথা বলা যায় না। কিন্তু সেরূপ নিন্দা যাহারা করে তাহারা কৃপার পাত্র।

ব্যাখ্যা

(১) বিধাতা যেখানে অধিকার বেশি দিয়াছেন সেইখানেই দুঃখ ও পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করিয়াছেন।

যাঁহারা হৃদয়বান্ তাঁহারা আপনাদের জীবন কোনো সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। তাঁহারা তাঁহাদের জীবনকে জগতের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দেন। পৃথিবীর দুঃখ দূর করিবার ব্রত তাঁহারা বরণ করেন। সেজন্য তাঁহাদের বহু দুঃখের ভার বহন করিতে হয়, বহু কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হয়। যাঁহারা মহৎ প্রাণ, এই পৃথিবীতে তাঁহাদের জীবন দুরূহ সাধনায় কঠিন।

তাঁহাদের কেবল যে কঠিন সাধনার সম্মুখীনই হইতে হয় তাহা নয়, তাঁহাদের আরও একটি দুঃখ অকারণে বহন করিতে হয়। পৃথিবীতে নিন্দুকের অভাব নাই এবং তাহারা যে সব সময় যথাযোগ্য বিচার করিয়া যে দোষী কেবল তাহাকেই নিন্দা করে তাহা নয়। তাহারা অবকাশ পাইলেই নিন্দা করিতে ছাড়ে না। যাহারা অল্পপ্রাণ তাহাদের জীবন সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ সুতরাং তাহাদের গায়ে নিন্দার ঝাপট লাগে না। কিন্তু যাঁহারা মহৎপ্রাণ তাঁহাদের জীবন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত বলিয়া তাঁহাদের বহু নিন্দা সহ্য করিতে হয়। তাঁহারা হৃদয়বান্ হওয়ায় তাঁহাদের চিত্ত অল্পেই প্রভূত বেদনা ভোগ করে। সুতরাং নিন্দার ভার তাঁহাদের কাছে গুরু বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সেদিক দিয়াও তাঁহাদের কঠিন দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

(২) যাহা লুকায় তাহাকে বাহির করা, যাহা পালায় তাহাকে বাঁধা, ইহার জন্য মানুষ কী না করে।

'পরনিন্দা' প্রবন্ধের এই ছত্রে রবীন্দ্রনাথ পরনিন্দার কারণ সম্পর্কে তাঁহার অভিমতটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

তিনি বলিতে চাহেন, মানুষ যে পরনিন্দা করে তাহার কারণ এই যে, তাহার মধ্যে আবিষ্কারের সুখ পাইবার জন্য একটা বাসনা রহিয়াছে। যে হরিণ বনের মধ্যে লুকাইয়া থাকে তাহাকে সে খুঁজিয়া বাহির করে, তাহা পলাইয়া যায় বলিয়া তাহাকে বন্দী করে। যাহা দুর্লভ তাহাকে আয়ত্ত করার সুখই শিকারের মূল কথা।

মানুষ যে সমস্ত বিষয়ের নিন্দা করে তাহা মানুষের মধ্যে গোপনে থাকে এবং মানুষের পদশব্দ পাইলেই পলাইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহার বিশেষ আগ্রহ থাকে। যে নিন্দা করে সে মানুষের দুর্বলতার সন্ধান লইতে চেষ্টা করে এবং সেজন্য তাহার প্রয়াসের অন্ত নাই। স্বভাবজ কৌতূহলের সহিত মিশিয়া দুর্লভের সন্ধান পাইবার আকাঙ্ক্ষা নিন্দুকের মধ্যে প্রবল।

(৩) ঠকাই কি সংসারে চরম ঠকা? না-ঠকাই কি চরম লাভ?

'পরনিন্দা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মানুষের নিন্দাবৃত্তির মূল সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষ মানুষের দুর্বলতাটুকু জানিয়া ফেলিতে চাহে। যাহা গূঢ় তাহাকে জানিবার জন্য মানুষের অন্তরে একটা প্রবল কামনা বিদ্যমান। এমন কি যে অংশটা বাহিরে প্রকাশিত তাহার তুলনায় যে অংশ গোপন তাহার সামান্য মাত্র জ্ঞাত হইলেও সেইটুকুকেই মানুষ চরম পরিচয় বলিয়া মনে করিতে চাহে।

পৃথিবীর মধ্যে অনেক জিনিসেরই সৌন্দর্যের সীমা নাই। কিন্তু গূঢ় অংশকে জানিবার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে এত প্রবল যে, সে 'সু'র অন্তরালে একটা "কু' আছে বলিয়া অনুমান করে। বাহির হইতে ভালো বলিয়া মনে করিয়া সে ঠকিতে চাহে না। কিন্তু এইরূপ না-ঠকা বিজ্ঞতার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বড়ো লাভ বলিয়া মনে করেন নাই। এইরূপ ভাবে ভালো জিনিসকে ঠুকরাইয়া ঠুকরাইয়া তাহার মন্দত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসের চেয়ে ঠকাও অনেক ভালো; তাহাতে উপভোগের লাভটা পুরাপুরি থাকে।

পনেরো আনা

রবীন্দ্রনাথ 'পনেরো আনা' কাহাদের বলিয়াছেন? সংসারে পনেরো আনাকেই প্রয়োজনীয় বলার তাৎপর্য কী?

'পনেরো আনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—পনেরো আনা ও বাকি এক আনা। এই এক আনা মানুষ অসাধারণ—তাঁহারা পৃথিবীতে আদর্শ পুরুষ বলিয়া খ্যাত। বাকি পনেরো আনা সাধারণ মানুষ, তাহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। তাঁহারা কেবল অগণিত জনসমাজের সংখ্যাকে পুষ্ট করিয়াছেন।

যাঁহারা অসাধারণ তাঁহাদের জীবনে শক্তির প্রকাশ এত বেশী যে, তাহার প্রতিই সব মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাদের জীবনকেই আদর্শ বলিয়া

পরিগণিত করা হয়। এই জন্যই যে সমস্ত মানুষের জীবনে শক্তির প্রকাশ নাই, তাহাদের জীবনকে ব্যর্থ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। নীতিজ্ঞেরা এই সাধারণ মানুষদের জীবন নিস্ফল বলিয়া ধিক্‌কার দিয়া তাহাদের কর্মে প্রণোদিত করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ বলিয়া মনে হইলেও এই পনেরো আনা যে সংসারের পক্ষে একেবারে নিষ্প্রয়োজন এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। একথা সত্য বটে যে তাহাদের জীবন এই জগৎ-সংসারে বুদ্‌বুদের মতো বিলীন হইয়া যায়, মৃত্যুর পর সংসারে তাহারা বিন্দুমাত্র চিহ্ন রাখিয়া যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, তাহারাই মহৎ মানবতার উপাদান। পৃথিবী এত সংকীর্ণ যে, তাহাতে যদি সর্বকালের সর্বমানুষের চিহ্ন রাখিবার চেষ্টা করা হইত তাহা হইলে তাহা তাহার পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়া উঠিত। জগতের বেশীর ভাগ লোকই বিস্মৃতি-লোকে নির্বাসিত হইয়াছে বলিয়া পৃথিবীর পরিসর এখনও সংকীর্ণ হইয়া উঠে নাই।

এই পৃথিবীর পনেরো আনা লোক যে জগতের ক্ষেত্রে ছায়াপাত না করিয়া চলিয়া যায় ইহা বিধাতার অন্তহীন সৃজনশক্তির প্রাচুর্যেরই পরিচয় দান করে। আমাদের কত জীবন ব্যর্থ হইয়া ঝরিয়া যায় অথচ মানবতার কত উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিতেছে—ইহাতে তাঁহার ঐশ্বর্যই ব্যক্ত হইতেছে।

এই বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে অনেক জিনিসই অকারণে বহিয়া যাইতেছে। জীবনকে সার্থক হইয়া উঠিবার অবকাশ দিবার জন্য অনেক খানিকেই নিস্ফল করিয়া দিবার একটা প্রয়োজন আছে। সব কিছুই পরিপক্ক পরিণতি লাভ করিতে পারে না—প্রকৃতির মধ্যেও অজস্র ব্যর্থতা সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্য হইতে সার্থকতাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার প্রয়াস দেখা যায়। সুতরাং পনেরো আনার ব্যর্থতারও একটা ভূমিকা বা সার্থকতা আছে।

বস্তুতঃ, পৃথিবীশুদ্ধ লোক যদি জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া

পড়িয়া লাগিয়া যাইত, তাহা হইলে জীবনের শান্তি নষ্ট হইত। অপরপক্ষে জীবনে ব্যর্থতার বিরাট পরিসর আছে বলিয়াই মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ সহজ হইয়াছে।

'পনেরো আনা' প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রচিত্তের যে ভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ কর।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটা উপাদান ছিল যাহা তাঁহার বাল্যকাল হইতে সকল বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য অধীর কামনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি প্রচলিত শিক্ষাবিধিকে স্বীকার করিতে পারেন নাই, সমাজের আচার বা বিধিব্যবস্থার মধ্যে যে কৃত্রিমতা আছে তাহার প্রতি তিনি চিরকালই বিরাগ পোষণ করিয়াছেন। জীবনকে কোনো একটা বিশেষ ছাঁদে ফেলিয়া তাহাকে সেইভাবে পালন করার আদর্শকে তিনি কোনো দিনই বড়ো বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, মানবজীবনের মধ্যে যে বিরাট প্রসারতা আছে তাহাকে তিনি কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না।

এইজন্যই যেসব বিজ্ঞ ব্যক্তি জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য অহরহ উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথায় তিনি কর্ণপাত করেন নাই। কোনো একটা নির্দিষ্ট আদর্শে জীবনকে গড়িয়া না তুলিলে যে জীবন বৃথা হইয়া গেল এমন কথা তাঁহার কাছে অবজ্ঞাতই হইয়াছে এবং জীবনের তথাকথিত সার্থকতার আদর্শের বিরুদ্ধে তিনি একাধিকবার উষ্মাপ্রকাশ করিয়াছেন।

লোকহিতের সংকীর্ণ আদর্শের দিক হইতে দৃষ্টিপাত করিলে সাধারণ মানুষের জীবনকে ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু বৃহত্তর জীবন-বোধ লইয়া পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি করা কঠিন হইবে না, যে, অসংখ্য মানুষ যে সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাহার মধ্যে একটা সার্থকতা বর্তমান। আম্রশাখায় অজস্র মুকুল ধরে কিন্তু তাহার বেশীর ভাগই ঝরিয়া যায় অথচ আমরা যে ফলগুলি পাই তাহাই আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত। পৃথিবীতে

অসংখ্য মানুষ গতানুগতিকভাবে জীবন যাপন করিলেও তাহারই মধ্যে কয়েকজন মানুষ আপনাদের জীবনকে এভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে যাহাতে মনুষ্যত্বের গৌরব উজ্জ্বলতর হইতে পারিয়াছে। তাহাদের বিকাশের জন্য যে অবকাশ প্রয়োজন, অগণিত সাধারণ মানুষ তাহাই করিয়া দিয়াছে।

মানুষের জীবনের সার্থকতা যে কী তাহা সুনির্দিষ্ট নহে। সুতরাং কোনো বিশেষ আদর্শকে চরম বলিয়া মনে করিয়া অনর্থক ছুটাছুটিও বিরাট ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা অধিকাংশ মানুষ হাসি-কান্নায় স্নিগ্ধ যে শান্তিময় জীবন যাপন করি, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে ব্যর্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'আমরা সাধারণ পনেরো আনা···আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে মানুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনস্বত্ব। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁকড়াইয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই। সংসারের সমস্ত কলগান আমাদের দ্বারা ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক আমাদের উপরেই স্পন্দমান।···আমরা···অধিকাংশই পরস্পরকে সঙ্গদান ও গতিদান ছাড়া আর কোন কাজে লাগি না; সে জন্য নিজেকে ও অন্যকে কোন দোষ না দিয়া, ছটফট না করিয়া, প্রফুল্ল হাস্যে ও প্রসন্ন গানে সহজেই অখ্যাত অবসানের মধ্যে যদি শান্তি লাভ করি, তাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই যথার্থভাবে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি।'

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ পদ্মাবক্ষে অবস্থানকালে বাংলার পল্লীর নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্যে অবগাহন করিয়াছিলেন এবং সেই শান্ত জীবনধারা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নাগরিক জীবনের উত্তেজনার তুলনায় তাহার সার্থকতা যে কম নয় এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল। সেই অখ্যাত জীবনধারার মধ্যেও যে একটা গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে ইহা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। 'পনেরো আনা' প্রবন্ধের মধ্যে তাহার আভাস ব্যক্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা

(১) বাহুল্য মানুষটিই আপনাকে সর্বতোভাবে দিতে পারে।

'পনেরো আনা' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন যে, প্রয়োজনই জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা নয়। পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস দেখা যায়, যাহার কোনো প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবুও আমাদের জীবন হইতে তাহাদের বাদ দেওয়া যায় না বরং তাহাদের জীবনের মধ্যে এমন একটা উপাদান থাকে যাহার জন্য তাহাদের উপেক্ষা করা যায় না।

মানুষের জীবন প্রয়োজন দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজনের চাহিদা সর্বদাই পূরণ করিতে হয়; কিন্তু তাহাই মানুষের সব কিছু নয়। মানুষের মধ্যে এমন একটা অতিরিক্ত উপাদান আছে, যাহার মধ্যে মানুষের স্বধর্ম প্রকাশিত হয়। এই বাহুল্যটুকুর জন্যই মানুষ সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। এই বাহুল্যটুকু কোনো প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় বলিয়া তাহার মধ্যে মানুষের আনন্দের প্রকাশ হইতে পারে। ইহা দিয়াই মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে পারে। বস্তুতঃ, মানুষের সর্ববিধ প্রকাশ এই বাহুল্যের জন্যই সম্ভবপর।

(২) দেশে থাকিয়া শেয়াল শিকার করিয়া ও ঘোড়দৌড় জুয়া খেলিয়া দিন-কাটানোকে যদি ব্যর্থতা বল, তবে তাহা চীন-উদ্ধার চেষ্টার মতো এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা নহে।

'পনেরো আনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রাকে ব্যর্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সেই সাধারণ হাসি-কান্না, নিতান্ত তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদের মধ্যেও জীবনের একটা শান্তিমণ্ডিত সুস্থ প্রকাশ সম্ভবপর হয়। যাহারা পরহিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায় তাহারা যে জীবনে সুখশান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তাহা নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাহারা ঘোরতর অশান্তি সৃষ্টি করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ দুই শ্রেণীর ইংরেজের কথা বলিয়াছেন। একশ্রেণীর

ইংরেজ দেশে থাকিয়া শেয়াল-শিকার বা ঘোড়দৌড়ের মতো নিশ্চিন্ত আমোদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। আর একশ্রেণীর ইংরেজ পরহিত-ব্রত লইয়া মিশনরী হইয়া চীন বা অন্য প্রাচ্য দেশে ধর্মপ্রচার করিতে যায়। প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ আর যাহাই করুক অপর কাহারও শান্তিতে হস্তক্ষেপ করে না। আমোদের জন্য তাহাদের জীবন ব্যর্থ একথা জোর করিয়া বলা যায় না। অথচ যে-সব মিশনরী পরহিতের দায় বহন করিয়া বিদেশে অশান্তি উৎপাদন করে তাহারা বৃহত্তর মানব জীবনে কতখানি সার্থকতা আনয়ন করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

বসন্তযাপন

'বসন্তযাপন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার পরিচয় দান কর।

বসন্তের দিনে শালবনের কচি পাতার মধ্য দিয়া যখন বাতাস বহিতেছে তখন রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা নিবিড় সংযোগ উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার মনে হইয়াছে যে, অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। মানুষ যে এক সময় শাখামৃগ ছিল আমাদের প্রকৃতি হইতে তাহা অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহেন যে, আমরা নিজেরা এক সময় নিশ্চয়ই গাছ ছিলাম, তাহার কথা আমরা ভুলিতে পারি নাই। সেই আদিকালে জনহীন মধ্যাহ্নে বসন্তের বাতাস যখন হু হু করিয়া প্রবাহিত হইত, তখন আমরা সারা দিন দাঁড়াইয়া আনন্দে কাঁপিয়াছি, আমাদের সারাদেহ মর্‌মর্‌ শব্দ করিয়া গান করিয়াছে, আমাদের দেহের সবটুকু অংশ রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে বাহিরে স্থাপিত করিতে চাহেন নাই। আমাদের অন্তরের সহিত তাহার যে একটা গভীর সংযোগ আছে ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। অবশ্য এ কথা সত্য যে, মানুষের জীবনে প্রয়োজনের তাগিদ

বলিয়া একটা জিনিস আছে এবং ইহার জন্যই তাহার জীবন প্রকৃতির ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে। সেইজন্য ফাল্গুন যখন দূরাগত পথিকের মতো দ্বারের কাছে আসিয়াছে মাত্র তখনই গাছগুলিতে কিশলয় গজাইতে আরম্ভ করিয়া বসন্তোৎসবের সূচনা করিয়া দেয়; অথচ মানুষের জীবনে কাজের তাড়া সমানভাবে বর্তমান এবং তাহার জীবনযাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

বসন্তের দিনে মানুষের কর্মজীবনে ব্যস্ততার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই, অথচ প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যেখানে প্রাণের আশ্বাস নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে; ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, মানুষের কর্মব্যস্ততাই বড়ো ব্যাপার নয়—প্রকৃতির মধ্যে জীবনের যে লীলা ব্যক্ত হইতেছে তাহার মূল্যই সবচেয়ে বেশী। সেকালে আমাদের দেশে মেঘ ডাকিলে অনধ্যায় ছিল, বর্ষার সময় প্রবাসীরা বাড়ি ফিরিয়া যাইতেন। বর্ষায় অধ্যয়ন বা বিদেশে কাজ করা যে অসম্ভব তাহা নয়, কিন্তু প্রকৃতির সহিত বিরুদ্ধতা করিয়া চলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। বিশ্বের সঙ্গে মানুষের নিজের কুটুম্বিতা স্বীকার করিলে মানুষের জীবনটা জগৎ-সংসারে বেসুরো বলিয়া মনে হয় না। পাঁজিতে বিশেষ তিথিতে বিশেষ আহারের নিষেধ আছে। রবীন্দ্রনাথ ঋতুবিশেষে কাজ বন্ধ করাকেও এমনই নিয়মের মধ্যে ফেলিতে চাহেন বলিয়া সরস মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্তমানে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক আমরা একরকম ছেদন করিয়াছি। প্রকৃতির মধ্যে অজস্রতার সীমা নাই। মানুষ যে এই অজস্রতার স্রোত রোধ করিবে ইহা তিনি চাহেন নাই। তিনি চাহিয়াছেন যে, প্রকৃতির মতোই মানুষও তাহার জীবনকে অজস্রভাবে বিকশিত করিয়া তুলিবে, কুণ্ঠাহীনভাবে দান করিবে। যে প্রকৃতি আমাদের জীবনকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহা যখন বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তখন আমরা যে কাজের মধ্যে নিজেদের বাঁধিয়া রাখিব তিনি একথা স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তর গাছপালার সঙ্গে বহুকালের আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চাহিয়াছে। বসন্তের

বাতাস যখন হু হু করিয়া প্রবাহিত হইবে তখন তাঁহার মনের মধ্যে যে সুর বাজিয়া উঠিবে তাহা যেন প্রকৃতির সুরের অনুরূপ হয়। বসন্তের প্রকৃতির মতোই তিনি আপনার জীবনকে কাঁচা করিয়া সবুজ করিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন।

মানবসমাজের কাছে তাঁহার বক্তব্য এই যে, মানুষ বিশ্বের সঙ্গে স্বতন্ত্র নয়, তাহার মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই সে বড়ো। প্রকৃতির সর্বস্তর তাহার কাছে উন্মুক্ত। পরিপূর্ণ মানুষ হইতে হইলে তাহাকে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইলে, বিচ্যুত হইলে চলিবে না—প্রকৃতির সঙ্গে সব দিক দিয়াই সংযোগ রাখিতে হইবে। মানুষকে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির একেবারে মাঝখানে স্থাপন করিয়া দেখিতে চাহেন। নিজে প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া যে রস আস্বাদনের অধিকারী হইয়াছেন সমগ্র মানবসমাজকে তাহার অংশ দিতে উৎসুক হইয়াছেন।

'পনেরো আনা' ও 'বসন্তযাপন' প্রবন্ধে কর্মব্যস্ততা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনকে কর্মভার-জর্জরিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। যাঁহারা বিজ্ঞলোক তাঁহারা কাজকে এত বড়ো করিয়া দেখেন যে, কাজের বাহিরে যে বিশাল জগৎটা পড়িয়া আছে তাহাকে তাঁহারা প্রকারান্তরে অস্বীকারই করেন। যাহারা কাজের মধ্যে জীবনকে প্রসারিত করিয়া দেয় নাই তাহাদের জীবনকে তাঁহারা একরূপ ব্যর্থ বলিয়াই মনে করেন।

'পনেরো আনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই ধারণাকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন। তাঁহার মতে পৃথিবীতে এক আনা লোক অসাধারণ, তাঁহারা আপনাদের জীবনকে নিরলস কাজের মধ্য দিয়া বিকশিত করিয়া তুলেন। বাকি পনেরো আনা সাধারণ মানুষ—তাহারা তাহাদের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা দিয়া পৃথিবীতে একটা অন্তহীন গতিপ্রবাহ রচনা করে। তাহারা নিরন্তর কর্মোদ্যমের মধ্যে নিজেদের ডুবাইয়া দেয় নাই বলিয়াই সংসার ছোটোখাটো আনন্দ-বেদনায়

ঝল্মল্ করিতেছে। সর্বদাই কাজ করিবার, পরের উপকার করিবার উপদেশকে তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'বিধাতা যদি আমাকে ব্যর্থ করিয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আমি ধন্য; কিন্তু যদি উপদেষ্টার তাড়নায় আমি মনে করি আমাকে উপকার করিতেই হইবে, কাজে লাগিতেই হইবে, তবে যে উৎকট ব্যর্থতার সৃষ্টি হইবে তাহা আমার স্বকৃত। তাহার জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে।'—পৃথিবীতে কাজ আছে বটে কিন্তু জীবনের স্বচ্ছন্দ গতির জন্য, শান্তির জন্য বিরাট অবকাশের প্রয়োজন। পনেরো আনার জীবন সেই স্বচ্ছন্দগতি, সেই শান্তির উপকরণ।

'বসন্তযাপন' প্রবন্ধে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, আমাদের নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টার জন্য প্রকৃতির জগৎ হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। প্রকৃতির মধ্যে জীবনের লীলা যখন নানাভাবে ব্যক্ত হইতেছে তখন এইভাবে জীবনকে বিরামহীন কর্মোদ্যমের মধ্যে আবদ্ধ করা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ প্রকৃতি হইতে যে একেবারে স্বতন্ত্র তাহা নয়, তাহার মধ্যে প্রকৃতির সকল বৈচিত্র্যের সমাবেশ হইয়াছে বলিয়াই সে বড়ো, তাহার জীবন প্রকৃতির গাছপালারই অভিব্যক্তি—একথা ভুলিয়া যাওয়া চলে না। প্রকৃতির মধ্যে যে অজস্রতা রহিয়াছে, প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইতেছে বলিয়াই তাহা আমরা হারাইতেছি। কর্মের বন্ধনকে একটু শিথিল করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করিতে চেষ্টা না করিলে আমাদের জীবন অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কর্মবদ্ধ মানুষের এই অপূর্ণতার কথা স্মরণ করিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, 'হায় রে সমাজ-দাঁড়ের পাখি! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখদুটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল, তবু তোর পাখা দুটা আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম!'

ব্যাখ্যা

(১) রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য যদি সহজে আশ্রয় করা যায়, তবে সান্ত্বনার বর্ষাধারা যখন দশদিক পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে, তখন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পুরাপুরি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

বসন্তের হাওয়া যখন হু হু করিয়া বহিতে থাকে তখন গাছগুলির সারা-দেহ আনন্দে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মর্মর্ শব্দে গান করিতে থাকে, তাহার শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া কচি ডগাগুলি পর্যন্ত সবই রসপ্রবাহে চঞ্চল হইয়া উঠে। বসন্তের উন্মাদন-রসকে সে উপেক্ষা করে না। ইহার পর দাহের দিন যখন আসে সে অবিচলিত ধৈর্যের সঙ্গে সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করে। তাহার পর বর্ষা আসিয়া যখন বৃষ্টিধারায় বিশ্বতল প্লাবিত করিয়া দেয়, তখন সে সেই স্নিগ্ধ রসধারা আপনার মজ্জায় মজ্জায় টানিয়া লয়।

রসের দিনে ভোগকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না—তাহাকে অস্বীকার করিবার কোনো সার্থকতা নাই। আবার দুঃখের দিনে অশেষ ধৈর্য প্রয়োজন—তখন বিমূঢ় হইলে চলিবে না। এইভাবে যখন যাহা আসে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলে পরে, জীবনে যখন রসধারার আবির্ভাব হয় তখন তাহা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা যাইবে।

(২) মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ির নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা।

বর্তমানে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে ঋতুসমাগমে যখন আনন্দের, উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায় তখনও সে আপনার কাজের দাবিকেই বড়ো করিয়া দেখিয়া কাজ করিতে

বাহির হইয়া পড়ে। প্রকৃতির অন্য কিছু হইতে সে স্বতন্ত্র বলিয়াই যে তাহার গৌরব, এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা তাহার মনে স্থান পাইয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে মানুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই বড়ো নয়—তাহার মধ্যে প্রকৃতির সর্ববিধ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই সে বড়ো। জড়, তরুলতা, পশু-পাখি, কোনো কিছুর সঙ্গেই তাহার বিচ্ছেদ নাই—তাহার জীবন সর্বত্রই প্রসারিত। জড়-জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণের বিচিত্র প্রকাশ যাহাদের মধ্যে, তাহারা সকলেই মানুষের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সকল বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই মানুষ বিশ্বের মধ্যে বিশেষ গৌরবের অধিকারী।

মন্দির

'মন্দির' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বটি উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বাহিরের সমস্তটাই ভাস্কর্যশিল্পে আবৃত—মন্দিরভিত্তির সর্বাঙ্গে ছবি খোদা। এই ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়। এই ছবিগুলির মধ্যে স্বর্গের দেবকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যের মানবের জীবনের নানা ছোটো-বড়ো ভালোমন্দ ঘটনা, তাহার প্রতিদিনের নানা কাজ ও খেলা সমানভাবে বিরাজ করিতেছে। মানুষের সংসার যে কিভাবে চলিতেছে তাহাকে রূপায়িত করিবার একটা প্রয়াস এখানে দেখা যায়। এমন কি এই চিত্রগুলির মধ্যে এমন অনেক জিনিস দেখা যায় যাহা দেবালয়ে আঁকিবার যোগ্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তুচ্ছ ও মহৎ, গোপনীয় ও ঘোষণীয় সকলই এখানে স্থান লাভ করিয়াছে।

কিন্তু ইংরেজের গির্জায় এমন জিনিস দেখা যায় না। সেখানে সংসারের জীবনযাত্রার চিহ্নমাত্র নাই—'কারণ গির্জা সংসারকে সর্বতোভাবে মুছিয়া ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মানুষ সেখানে

লোকালয়ের বাহিরে আসে—তাহা যেন যথাসম্ভব মর্ত্যসংস্পর্শবিহীন দেবলোকের আদর্শ।'—ভুবনেশ্বরের মন্দিরে দেখা যায় যে, মানুষ দেবতার একেবারে কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। 'গতিশীল, কর্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসংকোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।' —বস্তুত ভারতবর্ষে দেবত্বকে সংসার হইতে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হয় নাই—ধর্ম এখানে প্রাত্যহিক জীবন হইতে বহিষ্কৃত আদর্শ মাত্র নয়, তাহা জীবনের গভীরতর স্তরেও আপনার মূল প্রসারিত করিতে চাহিয়াছে। ভুবনেশ্বরের বহু শিল্পমণ্ডিত মন্দিরের ভিতরে অনলংকৃত মৌনের মধ্যে দেবতা যেমন রহিয়াছেন, তেমনই দেবতা 'জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য মিলন-বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনোকালে নূতন নহে; কোনোকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্তমান; অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না—কারণ এই চঞ্চল বৈচিত্র্যের মধ্যে এক নিত্য সত্য প্রকাশ পাইতেছেন।'

'উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে: বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। যিনি এক তিনি আকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির সেই মন্ত্রকেই আর একটু বিশেষভাবে এই বলিয়া উচ্চারণ করিতেছে—যিনি এক তিনি এই মানব-সংসারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আছেন। জন্মমৃত্যুর যাতায়াত আমাদের চোখের উপর দিয়া কেবলই আবর্তিত হইতেছে, সুখদুঃখ উঠিতেছে পড়িতেছে, পাপপুণ্য আলোকে ছায়ায় সংসার-ভিত্তি খচিত করিয়া দিতেছে, সমস্ত বিচিত্র, সমস্ত চঞ্চল—ইহারই অন্তরে নিরলংকার নিভৃত, সেখানে যিনি এক তিনিই বর্তমান। এই অস্থির-সমুদয় যিনি স্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন, এই পরিবর্তন-পরম্পরা যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ। দেব-মানব-স্বর্গ-মর্ত বন্ধন ও মুক্তির এই অনন্ত সামঞ্জস্য, ইহাই প্রস্তরের ভাষায় ধ্বনিত।'

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে উপনিষদের আর একটি মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই মন্ত্রটিতে দুইটি সুন্দর পক্ষীর কথা বলা হইয়াছে যাহারা একত্রে একটি বৃক্ষে বাস করিতেছে; তাহাদের একটি স্বাদু পিপ্পল আহার করিতেছে, অপরটি তাহা কেবল দেখিতেছে—জীবের সঙ্গে ভগবানের গভীর সাযুজ্য এই মন্ত্রের মধ্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। 'ইহারা দুইটি পাখি ডানায় ডানায় সংযুক্ত হইয়া আছে; ইহারা সখা, ইহারা এক বৃক্ষেই পরিষক্ত, ইহাদের মধ্যে একজন ভোক্তা, আর একজন সাক্ষী, একজন চঞ্চল, আর একজন স্তব্ধ। ভুবনেশ্বরের মন্দিরও যেন এই মন্ত্র বহন করিতেছে; তাহা দেবালয় হইতে মানবত্বকে মুছিয়া ফেলে নাই, তাহা দুই পাখিকে একত্র-প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘোষণা করিতেছে।

'কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দিরে আরও যেন একটু বিশেষত্ব আছে। ঋষিকবির উপমার মধ্যে নিভৃত অরণ্যের একান্ত নির্জনতার ভাবটুকু রহিয়া গিয়াছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন একাকি-রূপেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত।....কিন্তু এই একের সহিত একের সংযোগ ভুবনেশ্বর মন্দিরে লিখিত নহে। সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছ-বৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া সমগ্রভাবে এক হইয়া আপনার মাঝখানে অন্তরতররূপে, সাক্ষিরূপে ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতেছে। নির্জনে নহে, যোগে নহে—সজনে, কর্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে, লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে; তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ সংসারজীবন ও অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে কোনো পার্থক্যকে স্বীকার করে নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশে নৈতিক জীবন ও ধর্মজীবনের মধ্যে যে পার্থক্য কল্পিত হইয়াছে অন্যত্র তিনি তাহার কঠোর সমালোচনাও করিয়াছেন। মানবতাকে তিনি মানুষের ধর্মজীবনের ভিত্তিরূপে স্থাপন করিয়াছেন।

'বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন'—আলোচনা কর।

প্রাচীন ভারতে জাতিবিভাগ ও যাগযজ্ঞ একটা বড়ো স্থান অধিকার করিয়াছিল। তখন জাতিবিশেষই ধর্মচর্চার অধিকারী ছিল এবং দেবতারাই সেই ধর্মসাধনার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষের দাবি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই—মানবতা তখনকার ধর্মাচার্যদের কাছে বড়ো হইয়া উঠে নাই।

বুদ্ধদেবই প্রথম বেদবিহিত ধর্মের সেই আদর্শকে অতিক্রম করিয়া মানবতার আদর্শ প্রচার করেন। মানুষের মধ্যে যে আত্মশক্তি বর্তমান, তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে দয়া ও কল্যাণ প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহার আবির্ভাব কামনা করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়া তিনি মানুষের অন্তরের জ্ঞান, শক্তি ও উদ্যমকে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছিলেন। মানুষের জীবন যে একেবারে দৈবের অধীন, হীনপদার্থ নয়, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

তাঁহার এই ঘোষণায় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু তখন উপলব্ধি করিয়াছে যে, মানুষ দীন-হীন নয়, কারণ মানুষের যে শক্তি তাহার মুখে ভাষা দিয়াছে, যাহা তাহার ধী, তাহার নৈপুণ্য ও তাহার সমাজ ও সংসার-গঠনের মূলে রহিয়াছে তাহাই দৈবশক্তি। মানুষকে বাদ দিয়া দৈবশক্তির অস্তিত্ব সম্ভবপর হয় না।

বুদ্ধদেবের এই মানবতার আদর্শের প্রচার হইবার পর হিন্দুসমাজ নব-জাগ্রত হইয়া এই আদর্শের মধ্যেই দেবতাকে নূতনভাবে লাভ করিল। ইহার পূর্বে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধবাদী একটা ধর্মরূপেই দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার অন্তর্গত হইয়া গেল। 'মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহূর্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার,

ইহাই নব হিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মানুষের ক্ষুদ্র কাজে-কর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহ-প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটো-বড়োর ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল, তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল; প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস আছে।

ব্যাখ্যা

(১) মানুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছে যে, তিনি যেন নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছে যে, এই মন্দিরের পাথরগুলির মধ্যে একটা গভীর কথা আছে—তাহা যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছে। মানুষ অনন্তের কাছ হইতে একটা পরম বাণী লাভ করিয়াছিল। সেই পরম বাণীটি সে পাথরের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এই প্রস্তরপুঞ্জের মধ্যে যে ভাষা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে মানুষের ভাষা তাহার কাছে হার মানিয়া যায়। মানুষের ভাষায় বাক্যের পর বাক্য গাঁথিয়া চলিতে হয়—তাহা ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া একটি ভাবকে ব্যক্ত করে, তাহার মধ্যে সমগ্রতার অভাব আছে। কিন্তু এই প্রস্তরময় দেবালয়-শ্রেণী মানুষের কাছে যাহা বলিতে চাহে তাহা একেবারেই বলিয়া ফেলে—তাহা একটা অখণ্ড ভাবরূপে মানুষের অন্তরে আবির্ভূত হয়। পাথরের ভাষাকে মানুষের ভাষার মতো খণ্ড খণ্ড বাক্যে প্রকাশ করিতে হয় না, তাহা একেবারে তাহার সমগ্রতা দিয়া মানুষের মনকে অধিকার করিয়া ফেলে।

(২) এই অস্থির সমুদয় যিনি স্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন, এই পরিবর্তন পরম্পরা যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বহির্গাত্রে ভাস্কর্যের প্রাচুর্য বর্তমান। সেখানে যে চিত্র খোদাই করা আছে তাহা যে কেবলমাত্র দেব-দেবীর চিত্র তাহা নয়, তাহার সঙ্গে মানুষের সংসারের অনেক কিছুই রূপায়িত হইয়াছে। মানুষের প্রাত্যহিক দিনযাত্রার তুচ্ছ ও মহৎ, গোপনীয় ও ঘোষণীয় অনেক বিষয়ই তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সংসার জীবনের এই যে অস্থিরতা দেবালয়ের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে, ইহাকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের সত্যদৃষ্টির পরিচায়ক বলিয়াছেন। উপনিষদের একটি মন্ত্রে আছে—যিনি এক তিনি আকাশে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হইয়া আছেন। সংসারের অস্থিরতা ও পরম স্থিরের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। এই সংসারেই সেই স্থিরের অধিষ্ঠান—তিনি মানবসংসারের বাহিরে নাই। যিনি নিত্য তাঁহারই বিবর্ত, তাঁহারই প্রকাশ এই পরিবর্তমান জগৎ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দার্শনিকদের মতোই রবীন্দ্রনাথ জগৎকে ব্রহ্মেরই প্রকাশ এবং জগৎ যে ব্রহ্মের মধ্যেই তরঙ্গিত এই কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পনাটি তাঁহার অধ্যাত্মবোধের একটি মূলসূত্র।

পাগল

'পাগল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাগলকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ কর।

রবীন্দ্রনাথ 'পাগল' শব্দটির মূলে অবজ্ঞার ভাব আছে বলিয়া মনে করেন না। আমাদের দেশে পাগল শব্দটির মধ্যে ঘৃণা নাই। আমাদের কাছে খ্যাপা নিমাই ভক্তির পাত্র, খ্যাপা মহাদেব আমাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা। প্রতিভা খ্যাপামির একটি রূপ কি-না তাহা লইয়া ইউরোপে প্রচুর তর্ক চলিতেছে। আমাদের দেশে এ সম্পর্কে সংশয় নাই। প্রতিভা আমাদের কাছে একরকম খ্যাপামি—তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, ওলট-পালট করাই তাহার কাজ; তাহা লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দেয়, কেহ তাহাকে গালি পাড়ে আবার কেহ তাহাকে লইয়া মাতিয়া উঠে।

পাগল দেবতা মহেশ্বরের সব কিছুই অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণে ক্ষণে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইয়া তিনি আমাদের সমস্ত হিসাব একেবারে গোলমাল করিয়া দেন। লেখক নিজেও ভোলানাথের খ্যাপামির এক কণা পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার জীবনেও সব কিছু ওলট-পালট হইয়া যায়।

সৃষ্টির মধ্যে একজন পাগল আছেন যিনি অভাবনীয়কে আমাদের কাছে আনিয়া দেন। তাঁহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি বিশ্বকে নিয়মের বাহিরের দিকে ক্রমাগতই আকর্ষণ করিতেছে। যাহা আছে তাহাকেই চিরস্থায়ী করিয়া তুলিবার জন্য পৃথিবীতে একটা নিরন্তর চেষ্টা চলিতেছে। তিনি সেই চেষ্টাকে ধ্বংস করিয়া যাহা নাই তাহার জন্য পথ খুলিয়া দিতেছেন। সামঞ্জস্য তাঁহার ধর্ম নয়, তাঁহার প্রভাবে একটা অপূর্বতা সৃষ্ট হয়। তাঁহার আকর্ষণে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায় সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অপূর্ব সুরে বাজিতে থাকে সে হয় প্রতিভাবান্। পাগল ও প্রতিভাবান্ দুইই অসাধারণ। •

আমাদের প্রতিদিবসের বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যেও মাঝে মাঝে তাহার আবির্ভাব হয়। তখন তাহা প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাতরূপে, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন বিশ্বের কত কি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। অই আত্মভোলার ললাটের অগ্নির একটি মাত্র কণা অন্ধকারে গৃহ-প্রদীপের মতো জ্বলিয়া উঠে, আবার তাহাতেই সহস্রের হাহাকারে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। এই নটরাজের নৃত্যের তালে তালে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। প্রাতদিনকার জড়তায় সংসারে যে একটা সামান্যতার আবরণ পড়িয়া যায় তাহাকে তিনি কখনও ভালো দিয়া, আবার কখনও মন্দ দিয়া আঘাত করিতে থাকেন এবং প্রাণের প্রবাহকে অভাবনীয় উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোলেন।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীচিত্ত এই আত্মভোলা পাগলের খ্যাপামির সুরে সুর মিলাইতে চাহিয়াছে। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, 'পাগল, তোমার

এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ-কোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

আমাদের এই খ্যাপাদেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে, সৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগলামি অহরহঃ লাগিযাই আছে, আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহঃই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান্ করিতেছে। যখন পরিচয় পাই তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।'

এই পাগল আমাদের কাছে যাহা অতিনিকট বলিয়া একান্ত আপনার বলিয়া বোধ হইতেছিল তাহাকে দূরে সরাইয়া দেন, আর যাহার কথা আমরা চিন্তাও করি নাই তাহাকে অপরূপ রূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত করিয়া দেন। যাহাকে আমাদের অতি সামান্য বস্তু বলিয়া মনে হইত, তাহা তাঁহার স্পর্শে সহসা অভিনব হইয়া উঠে। তাঁহার মূর্তি চোখে পড়িলে প্রতিদিনের জড়তার হাত হইতে, অভ্যস্ততার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। তখন প্রাত্যহিকের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মহা-অপূর্বের কোলে খেলা করা সম্ভবপর হয়। প্রত্যহ আমরা সংসারের নিরেট হিসাবের মধ্যে একেবারে আবদ্ধ হইয়া থাকি—পাগলের বিরাট অট্টহাস্যে সমস্ত হিসাবের আয়োজন একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। লেখক তাঁহার জরুরি কাজের বোঝা ঐ নটরাজের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিতে চাহিয়াছেন—তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিতে পরিণত হইবে।

'পাগল' প্রবন্ধটি অবলম্বন করিয়া 'রবীন্দ্রকল্পনায় শিব' এই বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা কর।

ভারতীয় পৌরাণিক দেব-দেবীর কল্পনার মধ্যে বিশেষ করিয়া শিব রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে। ইহার অনেকগুলি কারণ বর্তমান। তাহার মধ্যে একটি এই যে, শিবচরিত্রের মধ্যে একাধারে ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্যের যে কল্পনা আছে তাহা তাঁহার কবিকল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, বাল্যেই কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য পাঠ করায় শিবচরিত্র তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করে এবং তাঁহার প্রথম জীবনের কয়েকটি কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বয়সের বহু কবিতা ও অন্যান্য রচনার মধ্যেও শিবচরিত্রের কল্পনায় পরিচয় পাওযা যায়। তাঁহার বহু উল্লেখযোগ্য কবিতায় শিবের বা শিব-শিবানীর কল্পনা স্থান পাইয়াছে। তাঁহার কয়েকটি নাটকে ও প্রবন্ধে শিব প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কল্পিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনায় শিব ধ্বংসের দেবতা, প্রলয়ের বিধাতা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। অথচ শিবকে তিনি ভীষণ বা ভয়াল বলিয়া রূপায়িত করেন নাই; বরং মৃত্যুর মধ্যেও একটা মাধুরী আছে বলিয়া তাঁহার এ-যুগের রচনায় কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পর শিবের শান্ত রূপও তাঁহার কল্পনায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্' এই মন্ত্রাংশটুকু মিলাইয়াই যেন তাঁহার কবিচিত্ত শিবের মোহন মূর্তি কল্পনা করিতে প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

মধ্যবয়সের রচনা 'পাগল' প্রবন্ধটিতে শিবের খেয়ালী মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। শিবকে তিনি খ্যাপা দেবতা বলিয়াছেন। আষাঢ়ের ঘনাবৃত দিনে সূর্যালোক-দীপ্ত নীলাকাশের অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে যে, আমাদের শাস্ত্রে যে আনন্দময় দেবতা ভোলানাথের কল্পনা আছে তিনিও সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপছাড়া। এই দেবতা পরম ঐশ্বর্যবান্ হইলেও জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুতরূপে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত হিসাব

কিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছেন। এই প্রলয়ের দেবতা আমাদের প্রতিদিনের তুচ্ছতাকে ধ্বংস করিয়া দিয়া নূতন সৃষ্টির অবকাশ করিয়া দেন। এই খেয়ালী দেবতা নটরাজ—তাঁহার নৃত্যে, তাঁহার 'দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।' সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়তার ফলে যখন একটা তুচ্ছতার আবরণ পড়িয়া যায়, তখন তিনি তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তও এই শিবের মতোই খেয়ালী সন্দেহ নাই। তিনিও কোনোদিন কোনো বন্ধন স্বীকার করিতে পারেন নাই—নূতনের আহ্বান বার বার তাঁহার চিত্তের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তিনি তাহাতে সাড়া দিতে দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করেন নাই। নৃত্যের মধ্যে সৌন্দর্যের যে শিল্প ও আনন্দমণ্ডিত ভঙ্গিটি মূর্ত হইয়া উঠে, তাহার প্রতি অনুরাগই তাঁহার কবিহৃদয়ের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় নয় কি?

ব্যাখ্যা

(১) সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আনন্দ দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতে সুখ এবং আনন্দ এই দুইটি আপাতদৃষ্টিতে সমার্থবাহীশব্দ ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। সুখ বলিতে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আরাম বুঝাইতে চাহিয়াছেন আর আনন্দ চিত্তের প্রসাদ যাহা বাহ্য সুখ বা দুঃখে মলিন হইতে পারে না।

আমরা জীবনে প্রতিদিনই সুখের কামনা করিয়া থাকি। কিন্তু আনন্দ প্রতিদিনের চাওয়ার অতীত। সুখ প্রতিনিয়তই এতটুকু মালিন্য বাঁচাইয়া চলিতে ব্যস্ত, কিন্তু আনন্দের মধ্যে এমন একটা নির্মলতা আছে যে, তাহা

ধূলায় আবৃত হইলেও তাহার বিন্দুমাত্র মালিন্য হয় না। সুখ হারাইবার ভয়ে অস্থির, সে ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে নিয়মের শৃঙ্খলে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু আনন্দ সর্বস্বান্ত হইতে ভয় করে না—সকল বন্ধন, সকল নিয়ম ছিন্ন করিয়া তাহা নূতন নিয়ম নিজেই সৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য লালায়িত। কিন্তু আনন্দের কাছে সুধা ও বিষ দুই-ই সমান—আনন্দের মূর্ত প্রতীক খেয়ালী দেবতা সানন্দে বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। আনন্দ সকল দুঃখকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

(২) ইহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্যের সুর ইহার নহে, পিনাক বংকৃত হয়, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায় এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।

'পাগল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাগল বলিয়া খ্যাত মহেশ্বরের খ্যাপামি বলিতে বলিতে বিশ্বের নিয়মহীন খেয়ালের বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বের মধ্যে সর্বদাই যাহা আছে তাহাকে রক্ষা করিবার একটা প্রয়াস সকলের মধ্যেই আছে। কিন্তু সেই প্রয়াসের ফলে সঞ্চয়ের অনড় স্তূপ দিন দিন বাড়িয়া উঠে এই মাত্র। পাগল সেই সঞ্চয়কে সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার হাতে বাঁশি নাই, যাহা আছে তাহাকেই মধুরতর ও সুসমঞ্জস করিয়া তুলিবার প্রয়াস তিনি করেন না। তাঁহার হাতে যে প্রচণ্ড পিনাক আছে তাহার টংকারে পৃথিবীতে ওলট-পালট হইয়া যায়। পুরাকালে দক্ষের বিধিবিহিত যজ্ঞ যেমন নষ্ট হইয়াছিল, তেমনই বিধিবিহিত কত কর্ম নষ্ট হইয়া যায়। সমস্ত ধ্বংস করিয়া একটা অপূর্বতা আবির্ভূত হয়—যাহা নিশ্চিত ছিল তাহাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া অভাবনীয়ের প্রকাশ হয়।

(৩) উহার সঙ্গে গৌরীশঙ্করের তুষারবেষ্টিত দুর্গমতা, মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপন সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

লেখকের দৃষ্টির সম্মুখে যে যে দৃশ্যগুলি নিত্য উদ্ভাসিত হইত তাহার

মধ্যে তিনি কোনোদিন দর্শনীয় কিছু দেখিতে পান নাই, অতি পরিচয় সেগুলির সৌন্দর্য অপহরণ করিয়াছিল।

সহসা একদিন আষাঢ়ের নিবিড় মেঘপুঞ্জ ধৌত করিয়া সূর্যকিরণোজ্জ্বল নির্মল নীলাকাশ প্রকাশিত হইল। সেই অভাবনীয় ব্যাপারে জগতের সব কিছুই তাঁহার নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হইয়াছে। গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের তুষারময় দুর্গমতা ও সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছল অপারতা মানুষের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন মুদির দোকানের খোড়ো চালও তাঁহার চোখের সম্মুখে সমান শ্রী ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের খেয়ালী দেবতার খেয়ালকে এমনই বিচিত্র বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার খেয়ালে বিশ্বের সবকিছুর মধ্যেই একটা অপূর্বতা, একটা অভাবনীয়তা, একটা অপরূপত্ব ব্যক্ত হয়।

আষাঢ়

'ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে।'—লেখক এই বর্ণ ও বৃত্তির ভেদ যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

'আষাঢ়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন বৃত্তি কল্পনা করিয়াছেন। অবশ্য মাঝে মাঝে বর্ণসংকর যে ঘটে তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। শ্রাবণের মেঘপুঞ্জে জ্যৈষ্ঠের মেঘের পিঙ্গলতা দেখা যায়, ফাল্গুনের শ্যামলতার মধ্যে পৌষের পীতরেখা দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্য এইরূপ বিপর্যয় প্রকৃতির রাজ্যে বেশীদিন প্রশ্রয় পায় না।

গ্রীষ্মকে তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। 'সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া, তপস্যার আগুন জ্বালিয়া, সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্র সাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে কখনও বা সে নিঃশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না; আবার যখন

সে রুদ্ধ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে।' ব্রাহ্মণের উপযোগী ফলাহারের ব্যবস্থাও এই ঋতুতে হয়।

বর্ষা তাঁহার কাছে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। 'তাহার নকিব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে, মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিকচক্রবর্তী হইয়া বসে। তমালতালী বনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাঁহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণবাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এদিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘন পল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগ্‌বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধ-বারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণিজড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।'

শীতকে তিনি বৈশ্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। 'তাহার পাকাধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রস্তর ব্যস্ত, কলাই, যব, ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোরুর পাল রোমন্থন করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে-মন্থর হইয়া চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন ও পিঠা-পার্বণের উদ্যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।'

শরৎ ও বসন্ত এই দুইটি ঋতুকে তিনি শূদ্র বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শরৎ শীতের ও বসন্ত গ্রীষ্মের তলপি বহিয়া আনে। প্রকৃতির সভায় শূদ্রের অমর্যাদা নাই। যাহারা ভার বহন করে তাহাদের আভরণের সীমা নাই। 'শরতের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কল্‌কা, বসন্তের

সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুলকাটা। ইহারা যে পাদুকা পরিয়া ধরণীপথে বিচরণ করে তাহা রঙবেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার; ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই।'

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে এই পাঁচটা ঋতুকেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, লোকে যে ছয়টা ঋতুর কথা বলিয়া থাকে তাহা কেবল জোড় মিলাইবার জন্য।—তবে ছয় ঋতু গণনার আরও একটা কারণ আছে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন। 'বৈশ্যকে তিন বর্ণের মধ্যে সব নীচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নীচের বড়ো ভিত্তি ঐ বৈশ্য। একদিক দিয়া দেখিতে হইলে সম্বৎসরের প্রধান বিভাগ শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ঐখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল ঋতুতেই, কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ঐ সময়েই। এইজন্য বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য-যৌবন-বার্ধক্যের তিন মূর্তিতে বৎসরের সফলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণতিরূপে সঞ্চিত হয়।'

'শরৎ-হেমন্ত-শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত, কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে-থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালোবাসে।····এইজন্য ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, সেইজন্য সেখানে তাহার তিন মহল; ঐখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল—বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ঐখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বনভোজনের ব্যবস্থা; ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ঘ্রাণগ্রহণ আর গ্রীষ্মে স্বাদগ্রহণ।'

"বর্ষা ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু।"—লেখকের যুক্তি অনুসারে আলোচনা কর।

বর্ষা ঋতুর সঙ্গে মানুষের সংসার-ব্যবস্থার তেমন ঘনিষ্ঠ যোগ নাই। তাহারই দাক্ষিণ্যে সারাবৎসর ফল, ফসল হয়, কিন্তু সে আপনার দানের কথা ঘোষণা করে না। মানুষের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক দেনা-পাওনার নয়—সে যেটুকু ফল দেয় তাহা গ্রীষ্মেরই ফলভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত। বর্ষা ঋতুতে ফলের চেষ্টা কম এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্মের প্রতিকূল। সেইজন্য বর্ষায় আমাদের হৃদয় ছাড়া পায়। কবি ফলও চাহেন না বা কর্মের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ নাই—তিনি কেবল হৃদয়ের দিকে, আপনার দিকে আপনার হৃদয়কে খুলিয়া দেন। 'বর্ষায় আমাদের হৃদয়-বধূর পর্দা থাকে না। বাদলার কর্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে, তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্য হইতে কৈলাস পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন।'

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা অপসারিত হইয়া যায় বলিয়া এই সময়টা বিরহী-বিরহিণীর পক্ষে সহজ নয়, কারণ হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দাবি তখন বড়ো হইয়া উঠে। কাজের তাড়ার মধ্যে সে যদিও বা একটু চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু যখন কাজের পালা থাকে না, তখন তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

কবি নিষ্প্রয়োজনের, বর্ষাঋতুও নিষ্প্রয়োজনের। 'তাহার সংগীতে, তাহার সমারোহে, তাহার অন্ধকারে, তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে, তাহার গাম্ভীর্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু।' সকল ঋতুরই একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্ ঋতু বিনা কারণে হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা দেখিতে হইলে সংগীতের মধ্যে সন্ধান করিতে হয়। সকল ঋতুরই শাস্ত্রসংগত রাগিণী থাকিলেও বসন্ত এবং বিশেষ করিয়া বর্ষার রাগিণীই বেশী। মেঘমল্লার, দেশ প্রভৃতি লইয়া বর্ষা একেবারে জমজমাট। এই সুরসজ্জার বাস্তবের সভায় হাজিরা দেয় না—যেখানে অখণ্ড অবকাশ, সেখানেই সে আসর জুড়িয়া বসে। কাজের তাড়া যেখানে নাই সেই ছুটির মধ্যে, যেখানে মানুষের হৃদয়টি

আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয় সেইখানে বর্ষার সংগীতসভায় কবি আপনার বীণাটি বাজান। মহাকবি কালিদাস 'আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তা ছন্দের অম্লান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন।...এই মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণ-মঞ্জীরমুখর মাসটি সকল কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পসরায় কেবল বাজে কথার পণ্য।' রবীন্দ্রনাথ আষাঢ়ের এই কর্মহীনতা, প্রয়োজন-হীনতার কথা স্মরণ করিয়া আষাঢ়কে আমন্ত্রণ জানাইয়া বলিতেছেন, 'সকল-কাজের-বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নব ঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি।' অবকাশের মধ্যে যে অপরিসীম মাধুর্য আছে আষাঢ় তাহার পসরা লইয়া আসে এবং কবি তাহাকে মাধুর্যপিয়াসীদের কাছে পরিবেশন করিয়া দেন।

'বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্টমেণ্ট আছে, সেটা বিনা কাজের।'—এই বিনা কাজের ডিপার্টমেণ্টটিকে রবীন্দ্রনাথ যে মর্যাদা দিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

আমাদের জীবনে কাজকর্মের একটা বড়ো স্থান আছে, কিন্তু তাহাই আমাদের জীবনের একমাত্র পরিচয় নয়। সেই কাজের বাহিরে একটা মস্ত বড়ো ছুটির আয়োজন আছে। যাহা প্রয়োজনের, তাহাকে ঘিরিয়া একটা নিষ্প্রয়োজনের অবকাশ বর্তমান। সেই অবকাশটা বেহিসাবি। প্রকৃতির রাজ্যে আকাশে যে নীলিমা দেখিতে পাই, অরণ্যে লক্ষ লক্ষ রূপময় ফুলের যে ফোটার পরই ঝরিয়া যাওয়া দেখিতে পাই তাহা অকারণ—তাহা প্রয়োজনের সীমায় বাঁধা নাই। শক্তির এই যে অপব্যয়, বুদ্ধি দিয়া ইহার বিচার করিতে গেলে ইহাকে মায়া বলিয়া মনে হয়।

এই নিষ্প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই হৃদয়ের প্রকাশ। এইজন্যই তাহার কাছে ফলের চেয়ে ফুলের বেশী তৃপ্তি এবং এই অপ্রয়োজনের আনন্দই কাব্যের

বিষয়বস্তু। যাহারা কেবল বস্তুকেই চায় তাহাদের কাছে ইহা অবস্তু ও শূন্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার মূল্য কম নয়। পৃথিবীকে ঘেরিয়া যে আকাশ বর্তমান তাহা ভূমিখণ্ডের মতো বিক্রয় হয় না বটে, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া আলোকের দূত পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায়। ধূলিতে পৃথিবীর প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সমস্ত লাবণ্য, সমস্ত সংগীত ঐ বায়ুমণ্ডলে বিধৃত—সেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

'মানুষের চিত্তের চারিদিকেও একটা বিশাল অবকাশের বায়ুমণ্ডল আছে। সেইখানে তাহার নানা রঙের খেয়াল ভাসিতেছে; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে। সেইখানেই ঝড়-বৃষ্টি; সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতি চৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখিতে চায়, তাহারা মাটিকে মান্য করে বটে, কিন্তু এই বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সংগীত। এই সংগীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কী কাজ হয় জানি না, কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাতবেগে অতিচৈতন্য লোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।'

মানুষের ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র অর্থ নাই, অর্থের চারিদিকে সুরের একটা পরিমণ্ডল বর্তমান। তাহা যেটুকু জানায় তাহার চেয়ে অনেক বেশী ইশারা করে। 'এই সমস্ত অবকাশওয়ালা কথা লইয়া অবকাশবিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ুমণ্ডলেই নানা রঙিন আলোর রঙ ফলাইবার সুযোগ; এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভঙ্গিতে হিল্লোলিত হয়।'

ভাষার মধ্যে এই যে একটা অবকাশ আছে, ইহার আবেদন আমাদের বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে। হৃদয় শুদ্ধমাত্র অর্থ খোঁজে না, অর্থকে অতিক্রম করিয়া যে একটা অনির্বচনীয়তা থাকে তাহাকেই সে গ্রহণ করিতে

চায়। বুদ্ধি গতিকে চায়, কিন্তু হৃদয় নৃত্যকে কামনা করে। অনবকাশের মধ্যেও গতি সম্ভবপর, কিন্তু অবকাশ না হইলে নৃত্য সম্ভবপর নয়। ছন্দের মধ্যে যে যতি আছে তাহা বিরতির চিহ্ন নয়। সেই ফাঁকটুকুর মধ্যে ছন্দের ইশারা ফুটিয়া উঠে—সেইখানেই ছন্দের ঐশ্বর্য পরিপূর্ণতা লাভ করে।

তেমনই, 'বিশ্বরচনায় কেবলই যে-সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ কাজ করিতেছে।...অণুপরমাণুর মধ্যে কেবলই ছিদ্র ;...সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ তো সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগসাধন হইতেছে—অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদ-মহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত কিছু লীলা-খেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছুতে নহে, বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই, তার বেশী নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলই আপনিই ছাড়াইয়া যাইতে পারে।'

ব্যাখ্যা

(১) বিশ্বসভায় অমিল-শয়তানটা এই কাজ করিবার জন্যই আছে, সে মিলের স্বর্গপুরীতে কোনো মতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না; সেই তো নৃত্যপরা উর্বশীর নূপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয়, সেই বেতালটি সামলাইবার সময়েই সুরসভায় তালের রস-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

বৎসরের ঋতুগুলির পরিচয় দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত ও বসন্ত এই পাঁচটি ঋতুর নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঋতু বাস্তবিকপক্ষে এই পাঁচটিই—কেবল জোড় মিলাইবার জন্য ছয়টি ঋতুর কল্পনা করা হইয়াছে। বৎসরের তিনশত পঁয়ষট্টি দিনকে দুই দিয়া ভাগ করিলে মেলে না—এই অমিলটাকেই তিনি সকল গতির, সকল সংগীতের মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

যাহা মিলিয়া যায় তাহার জন্য বিন্দুমাত্র উদ্বেগ থাকে না। তাহা যেন গতিকে ঘুম পাড়াইয়া দেয়। অমিল সেই ঘুমঘোর ভাঙিয়া জাগাইয়া তোলে এবং গতির ছন্দকে প্রবাহময় করিয়া তোলে।

স্বর্গের উর্বশীর নৃত্যের সময় ছন্দ যদি মিলের মধ্যে শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে নৃত্যের অবসান ঘটিত। ছন্দের মধ্যে কোথা হইতে একটা অমিল জুড়িয়া বসে। ফলে, সেই অমিলটাকে অতিক্রম করিবার জন্য ছন্দ নূতন গতিলাভ করিয়া নৃত্য রস সম্ভবপর করিয়া তোলে। অমিলের মধ্য দিয়া ছন্দটিকে উপলব্ধির আনন্দই সংগীত বা নৃত্যের রস জাগাইয়া দেয়।

(২) প্রাণ সেই মহা অবকাশ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলই আপনি ছড়াইয়া চলিতে পারে।

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে অথর্ববেদের একটি মন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ঋত সত্য তপস্যা রাষ্ট্র শ্রম ধর্ম কর্ম ভূত ভবিষ্যৎ বীর্য সম্পদ বল সমস্তই উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ উদ্বৃত্তে আছে। অর্থাৎ মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতিরিক্ততা থেকে। জীবজগতে মানুষ বাড়তির ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে কুলোলো না।...প্রত্যেক জীবকোষ তার অতিরিক্তের মধ্যে বাস করে। সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য আনন্দশক্তি, সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার করে আছে সৌন্দর্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত ভূত, ভবিষ্যৎ। জীবকোষ এই সমগ্র দেহগত বিভূতি উপলব্ধি করে

না। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিনির্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে পেরিয়ে যায়; পেরিয়ে গিয়ে যে-আত্মিক সম্পদকে উপলব্ধি করে অথর্ববেদ তাকেই বলেছেন ঋতং সত্যং। এ সমস্তই বিশ্বমানবমনের ভূমিকায়, যারা একে স্বীকার করে তারাই মনুষ্যত্বের পদবীতে এগোতে থাকে। অথর্ববেদ যে সমস্ত গুণের কথা বলেছেন তার সমস্তই মানবগুণ। তারযোগে আমরা যদি আমাদের জীবধর্ম-সীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি তবে বলতে হবে সে সত্তা কখনোই অমানব সত্তা নয়, তা মানবব্রহ্ম। আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি।"

যাহা অতিরিক্ত, যাহা অবকাশ, যাহা প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ নয় তাহাই মানুষের প্রাণকে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে। নিছক বস্তু, নিছক প্রয়োজনের দ্বারা যাহার সীমারেখা নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা নিশ্চলতার মৃত্যুর মধ্যে বিলুপ্ত, সেখানে প্রাণের প্রকাশ সম্ভবপর নয়। অবকাশরূপী প্রাণ নিজেকে বহুরূপে প্রকাশমান করিতে গিয়া বস্তুসৃষ্টি সম্ভবপর করিয়া তুলে। বস্তু যখন অবকাশের মধ্যে সৃষ্ট হয় তখন তাহা মৃত্যুর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না।

সোনার কাঠি

রবীন্দ্রনাথ এ দেশের সংগীত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সংগীতের ক্ষেত্রে আধুনিকতার সমর্থন করিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও।

রূপকথার রাজকন্যা রাক্ষসের যাদুতে ঘুমাইয়া থাকেন—বাহির হইতে কেহ পাছে তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দেয় সেজন্য সতর্ক পাহারা আছে। এইরকম পাহারার ফলে মনের বেগ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা তাহা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে।

আমাদের দেশের সংগীতকলারও এই অবস্থা। রূপকথার রাজকন্যার

মতোই সে তাহার ঘরটুকুতে অসীম ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত—তাহার স্বল্প পরিসরটুকু ঘেরিয়া শিল্পসৃষ্টির অন্ত নাই। ওস্তাদি পাহারা দিয়া বসিয়া আছে, পাছে বাহির হইতে কোনো আগন্তুক আসিয়া তাহার মোহনিদ্রা ভাঙিয়া দেয়। ফলে, প্রতিদিনের নূতন ব্যবহারের সহিত তাহার যোগ নাই—সে আপনার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের মধ্যে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে। কলাকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া কাল তখন আগাইয়া চলে। কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদে উভয়েরই ক্ষতি সাধিত হয়।

আমাদের দেশে গানের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটিতেছে না—ওস্তাদরাও বলিতেছেন যে, গানের পরিবর্তন সাধন করা চলিবে না। কিন্তু যাহা স্থির হইয়া আছে তাহার মুখ চাহিয়া পরিবর্তনশীল আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না। কালের গতিকে যাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, তাহাকে কেহই বহন করিতে চাহে না।

পঞ্চাশ বৎসর আগে বড়ো বড়ো গাইয়েরা দূরদেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া ধনীদের গৃহে যখন মজলিস জমাইতেন তখন সমঝদারের একেবারে অভাব ছিল না। এখন বক্তৃতার মজলিসের অভাব নাই, কিন্তু বৈঠকি গান পুরাপুরি সম্ভোগ করিতে পারে এমন যুবকের সংখ্যা বিরল। 'চর্চা নাই' এই যুক্তি অসংগত, কারণ মন নাই বলিয়াই চর্চা নাই। আকবরের আমল নাই বলিয়া সে আমলের গানকে যে লুপ্ত হইতে হইবে এমন কথা বলা চলে না—কিন্তু তাহা যে বর্তমানকালের সহিত সম্পর্ক ছেদন করিয়া নিজেকে অচল করিয়া রাখিবে তাহাও হইতে পারে না।

আমাদের দেশের সাহিত্যের দিক হইতে উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান প্রভৃতি এক সময়ে এদেশে ছিল বলিয়া এখনও ঐগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে গেলে চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র সাগরপারের রাজপুত্রকে আনিয়া সাহিত্যরাজকন্যার মাথায় সোনার কাঠি ঠেকাইলেন—অমনি তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে।

চলতিকালের সঙ্গে তাহার নিত্য পরিচয়। যাহারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলিন্যকে বড়ো বলিয়া মনে করে তাহারা ঐ নূতনত্বকে ভূয়া ও প্রাচীন সাহিত্যকে খাঁটি বস্তু বলিয়া নির্দেশ করিতে চায়। কিন্তু মানুষ নিছক বস্তুকে চায় না, যাহা তাহার প্রাণের সঙ্গে চলিয়া মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করে তাহাকেই সে চায়।

বিদেশের সোনার কাঠি আমাদের দেশের সাহিত্যকে স্পর্শ করায় আমাদের দেশের সাহিত্য এখন গৌরবলাভ করিয়াছে। সম্প্রতি আমাদের দেশের চিত্রকলার মধ্যেও যে নবজীবনের লক্ষণ দেখা যায় তাহার মূলেও সাগর-পারের রাজপুত্রের সোনার কাঠির ছোঁয়া আছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে ও চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র আসিয়া পৌঁছিলেও সংগীতে পৌঁছায় নাই। সেইজন্য সংগীতের জাগরণ আজিও হয় নাই। আধুনিকের দল গান বর্জন করে নাই। কিন্তু যে গানে তাহারা আনন্দ পাইতেছে তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নাই—কীর্তন, বাউল, বৈঠকি প্রভৃতি মিলাইয়া তাহা আচারভ্রষ্ট সংগীত। ওস্তাদের দল তাহার নিন্দা করিতেছে—তাহার মধ্যে নিন্দনীয়তাও আছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহা আনন্দ দিতেছে। তাহার পঙ্গুতা ঘুচিয়া গিয়াছে। তাহার প্রথম চলিবার ভঙ্গিটা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, তাহার মধ্যে হাস্যকরত্ব ও কুশ্রীতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা যে প্রথাকে ছাড়িয়া প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্র রচনা করিয়াছে তাহাই সবচেয়ে বড়ো কথা।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লাগিয়াছে বলিয়া অনেকে তাহাকে হিন্দু সংগীতের বাহিরে রাখিতে চাহেন। দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া থাকিলে তিনি বাণীর আশীর্বাদই লাভ করিবেন। যথার্থ হিন্দুসংগীতের জাত বাঁচাইবার প্রয়োজন নাই—বিদেশের সংস্পর্শে তাহা আপনাকে বড়ো করিয়াই পাইবে।

লেখক সোনার কাঠি কাহাকে বলিয়াছেন? সোনার কাঠির ছোঁয়ার যে কয়টি দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন সেগুলির পরিচয় দাও।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন কালকে সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

রূপকথার রাজকন্যার মতোই কলা রাক্ষসের মায়ায় সোনার পালঙ্কে ঘুমাইয়া আছে অর্থাৎ প্রাচীন কলা আপনার সংকীর্ণ গতির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে—রাজকন্যার মতোই বাহির বিশ্বের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ নাই। রূপকথায় আছে যে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া এক রাজপুত্র সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া নিদ্রিতা রাজকন্যাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বর্তমানে সাত সাগর পার হইয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিদেশী রাজপুত্রের মতোই আসিয়াছে। তাহার প্রভাবকে রবীন্দ্রনাথ সোনার কাঠির স্পর্শ বলিয়াছেন। আমাদের দেশের কলা বহুকাল ধরিয়া সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকায় তাহার প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—তাঁহার বিশ্বাস এই যে, প্রাশ্চাত্ত্য কলার সংস্পর্শে আসিলে তাহার মধ্যে নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হইবে।

বিদেশী রাজপুত্রের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় যে আমাদের দেশের কলা জাগিয়া উঠে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের দেশের সাহিত্যেই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মঙ্গলকাব্যের ধারাটি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। এককালে ঐ সাহিত্যের সঙ্গে দেশের লোকের প্রাণের যোগ ছিল। কিন্তু ইউরোপের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের পর আমাদের দেশের সাহিত্যের পক্ষে নূতন প্রকাশের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। বঙ্কিম আমাদের সাহিত্যে রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আনিলেন—তাহার সোনার কাঠির স্পর্শে সাহিত্যসুন্দরীর ঘুম ভাঙিয়াছে। ফলে, বাংলা সাহিত্য নূতন কালের উপযোগী হইয়া নূতন প্রাণশক্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আধুনিকের দল যে সাহিত্যকে স্পর্শ করিতে চাহিত না, তাহাই তাহাদের নিত্য ব্যবহার ও গৌরবের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, বার বার সমুদ্রপারের রাজপুত্র আসিয়া মানুষের মনে সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া দিয়াছে। আপনার পূর্ণশক্তি পাইবার জন্য মানুষের মনকে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা করিতেই হয়। কোনো সভ্যতাই গোড়া হইতে একেবারে সৃষ্ট হয় নাই।

প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতার পূর্বেও অন্য সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজিপ্ট ও এসিয়ার সভ্যতা হইতে আঘাত পাইয়াছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা দ্রাবিড়মন ও আর্যমনের সংঘাত ও সম্মিলনে গড়িয়া উঠিয়াছে—গ্রীস, রোম ও পারস্যের সভ্যতা তাহার উপর আঘাত হানিয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। ইউরোপের সভ্যতার ইতিহাসে যে সমস্ত যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলা হয় সেইসব যুগ অন্য দেশ ও অন্য কালের সংঘাতের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষের মন বাহির হইতে নাড়া পাইলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে এবং সর্বপ্রকার গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া আপনার অধিকারকে বিস্তৃত করিয়া দিতে পারে।

ব্যাখ্যা

সত্য হিঁদুর সত্য নয়, পলতের করে কৌটা কৌটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় না; চারিদিক থেকে মানুষের নাড়া খেলেই সে আপনার শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে।

'সোনার কাঠি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান হিন্দুসংগীতের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় সংগীত একসময়ে উৎকর্ষ ও বিকাশলাভ করিলেও বর্তমানে কালের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারায় তাহা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ও আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছে। এখনকার ওস্তাদরা সংগীতের জাত বাঁচাইয়া রাখিতে চাহেন—বিদেশী সংগীতের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাঁহারা বিদেশী সংগীতের প্রভাবকে পুরাপুরিভাবে এড়াইয়া যাইতে চাহেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লাগায় তাঁহার সংগীত প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এইজন্যই অনেকে তাঁহার গানকে হিন্দু সংগীতের গণ্ডি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে চাহেন। এইভাবে সংগীতের জাতিরক্ষা করাকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করিতে পারেন নাই। এইভাবের জাতিরক্ষা হিন্দুত্ব নয়—হিঁদুয়ানিমাত্র। প্রাচীন বিধান অনুসারে কোনো

সত্যকে জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে তাহা সফল হইতে পারে না—মানুষের প্রাণশক্তির সহিত যোগ থাকিলেই সে আপনার জীবনীশক্তির পরিচয় দিতে পারে।

শরৎ

'শরৎ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শরৎকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও।

ইংরেজি সাহিত্যে শরৎকে প্রৌঢ়রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। তাহার যৌবন একেবারে শেষ হইয়া যায় নাই অথচ মরণের দিকে টানও আছে। জনৈক আধুনিক ইংরেজ কবির কাব্যে দেখা যায় যে, তিনি শরৎকে ভাঙা হাটের ঋতু বলিয়াছেন—তাহার মধ্যে অতীতের সমৃদ্ধির স্মৃতিশেষ ও ভাবী রিক্ততার আভাস আসিয়া মিলিয়াছে।

কিন্তু আমাদের দেশে শরতের মূর্তি একেবারে আলাদা। আমাদের দেশের শরতে যৌবনপ্রান্তের বিষাদ নাই—আমাদের শরৎ বর্ষার গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া শিশুর মতো আবির্ভূত হয়। আকাশে, বাতাসে তাহার কাঁচা গায়ের ও তাজা প্রাণের রং ছড়াইয়া পড়ে। প্রাণের যে রং, তাহা কোমলতার রং। ঘাসে, পাতায় এবং মানুষের গায়ে সেই রং দেখিতে পাই। জন্তুর দেহে সেই রং নাই বলিয়া প্রকৃতি তাহার দেহকে লোমে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে অথচ মানুষের গাটিকে অনাবৃত রাখিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেছে।

যাহাকে বাড়িতে হয় তাহাকে বড়ো না হইয়া কোমল হইতে হয় বলিয়াই প্রাণ কোমল। তাহার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা বর্তমান। সেই ব্যঞ্জনা ঘুচিয়া গেলে, মৃত্যুর সময় প্রাণের সে রং থাকে না। শরতের রং প্রাণের রং—তাহা কাঁচা ও কোমল। রৌদ্রের স্বর্ণাভা, শষ্পের হরিৎ, আকাশের নীলিমা—সবই তাজা। এইজন্যই বর্ষা যেমন আমাদের হৃদয়কে বা বসন্ত যেমন আমাদের যৌবনকে নাড়া দেয়, শরৎ তেমনই আমাদের প্রাণকে নাড়া দেয়।

শরতের মধ্যে এই হাসি এই কান্না—ঠিক শিশুর মতো। এই হাসি-কান্নায়

মধ্যে এতটুকু গভীরতা বা গুরুত্ব নাই, তাহা বিন্দুমাত্র দাগ রাখিয়া যায় না।—ছেলেদের হাসি-কান্না হৃদয়ের জিনিস নয়, তাহা প্রাণের জিনিস। প্রাণের মধ্যে হাসি-কান্নার ভার আদৌ নাই—লঘুগতিতে ছুটিয়া যাওয়াই তাহার ধর্ম। হৃদয় হাসি-কান্নাকে ধরিয়া রাখে—তাহাকে ঝরাইয়া ফেলিয়া দেয় না। প্রাণ যেন ঝরণার মতো ঝলমল করিতে করিতে ছুটিয়া চলে, তাহার মধ্যে হাসি-কান্নার আলো-ছায়া স্থায়িভাবে বাসা বাঁধিতে পারে না। কিন্তু হৃদয় সরোবরের মতো—সেখানে আলো ও ছায়া দুই-ই গভীরের মধ্যে অবগাহন করিতে চায়, সেখানে স্তব্ধতা আপনার ধ্যানের আসন পাতিয়াছে।

প্রাণকে চলিতেই হয়। সেইজন্যই শরতের হাসিকান্না আমাদের প্রাণের উপরিতল মাত্র স্পর্শ করে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আটকা পড়ে না। শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া আমাদের মন কেবলই চলি-চলি করে—সে চলা অভিসারের নয়, অভিমানের।

বর্ষায় চোখ যায় আকাশের দিকে, শরতে যায় মাটির দিকে। আকাশের মেঘের আস্তরণ সরিয়া গিয়া মাটিতে সভার আয়োজনে সবুজ আস্তরণ বিছানো হইয়া যায়। শিশু শরৎকে দেখিতে দেখিতে মাতা ধরণীর দিকে দৃষ্টি যায়; ফসলের খেতগুলি নবীন প্রাণের শোভায় একেবারে ভরিয়া গিয়াছে; এ ঋতু বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়—এ ঋতু ছোটো ছোটে চারাগাছে মাটির কোল ছাইয়া দিয়াছে।

এই ছোটো চারাগুলি ধরণীতে দু'দিনের শোভা ও আনন্দ আহরণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করে। ইহারা সূর্যের কিরণটুকু মাত্র পান করে—বনস্পতির মতো জল, বাতাস, মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই। ইহারা পৃথিবীতে আবাস পায় নাই, কেবল আতিথ্য পাইয়াছে। শরৎ এই ক্ষণ-জীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন উৎসবের হাস্যে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। আকাশের মেঘের মতো ইহারা ক্ষণকালের জন্য আপনাদের সৌন্দর্য ও আনন্দটুকু ঝরাইয়া দিয়া চলিয়া যায়।

সেইজন্যই শরৎকে উদ্দেশ করিয়া বলা যায় যে, সে শিশিরাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গত ও আগতের মিলনশয্যা পাতিয়াছে। সে প্রস্থায়ী বর্তমানটুকুকে মুখচুম্বন করিতেছে—তাহার হাসিতে অশ্রু ঝরিতেছে।—মাটির কন্যার আগমনী গান সবেমাত্র বাজিয়াছে— কিন্তু বিজয়ার গান হইতে আর বেশী দেরী নাই। ললাটে হাসির চন্দ্রকলা ও জটায় কান্নার মন্দাকিনী লইয়া পাগল আসিল বলিয়া।

পশ্চিমের শরৎ ও পূর্বের শরৎ এক জায়গায় গিয়া অবসিত হয়—বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন যে, শরতের ইঙ্গিতে বসন্তের পাতাগুলি ঝরিতে ঝরিতে বৎসর শেষ করিয়া মাটিতে মিশিয়া গেল। তিনি বলিতেছেন—বসন্তের রসব্যাকুলতা, জ্যৈষ্ঠের তপ্ত নিঃশ্বাস, ক্ষুব্ধ হৃদ্‌স্পন্দন ঘুচিয়া গিয়াছে। ঝ'ড়ো বাতাসের দল মৃত্যুশোকের জন্য বিলাপগান গাহিতে চাহিতেছে। তাহার বিনাশের শ্রী, সৌন্দর্যের বেদনা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে।

পশ্চিমে যে শরৎ ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আসে এবং আমাদের দেশের যে শরৎ মেঘের ঘোমটা সরাইয়া আসে তাহাদের মধ্যে রূপ ও ভাবের পার্থক্য বর্তমান। আমাদের শরতে আগমনীই প্রধান, তাহাতে বিজয়ার উৎসবের তান লাগিয়াছে এই মাত্র—শরতের বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যেও নূতন করিয়া ফিরিয়া আসার জন্য আগমনী গানের অন্ত নাই; তাহার মধ্যে হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব। কিন্তু পশ্চিমের শরতের গানে কেবল হারাইবার কথাই রহিয়াছে। যাত্রা ও বিদায়ের সুরই সেখানে একমাত্র সুর—জীবন সেখানে মৃত্যুপথগামী এবং সমারোহের পূর্ণতা মায়া বলিয়া কবি কল্পনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা

(১) শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি-চলি করে; বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, অভিমানের চলা।

'শরৎ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শরতের মধ্যে প্রাণের ধর্ম প্রকাশিত হইয়াছে-

বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। প্রাণের ধর্ম শিশুর মতো চঞ্চলতা—তাহার মধ্যে হাসি-কান্না কোনো কিছুই স্থায়িভাবে থাকিতে পারে না; সকলেই আলো-ছায়ার মতো ছুটিয়া চলিয়া যায়। শরতের মেঘ বা রৌদ্র কোনোটাই দীর্ঘ-কালব্যাপী নয়—তাহা বিন্দুমাত্র ভার বহন না করিয়া কেবলই চলিতেছে।

বর্ষার মধ্যে আমাদের হৃদয় ব্যক্ত নয়। তাহার মেঘের ঘনঘটা, সঘন বর্ষণ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে গভীর উল্লাস ও বেদনা সঞ্চার করিয়া দেয়। আমরা কাব্যে বর্ষাকালে অভিসারের বর্ণনা পাই। নিবিড় বর্ষায় মনটা অভিসারে বাহির হইয়া পড়িতে চায়। শরতের রৌদ্রের স্বর্ণাভ সৌন্দর্য দেখিয়া আমাদের মন চলিতে চায়। কিন্তু সে চলা অভিমানের চলার মতো। তাহার মধ্যে হাসি আছে, কান্নাও আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে ভার নাই। অভিমান যেমন অল্পেই মিটিয়া যায় তাহার দাগ থাকে না, শরতে প্রাণ তেমনই দাগ না রাখিয়া চলিয়া যায়।

(২) ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না।

'শরৎ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শরৎ প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের নৃত্য অনুভব করিয়াছেন। প্রাণের মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ চপলতা আছে—তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে গভীরতর স্থানে অনুসন্ধান করিতে হয় না,—তাহার মধ্যে স্বভাবতঃই এমন একটা চাঞ্চল্য আছে যাহা ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। শরতে আকাশের মেঘ মুছিয়া গিয়া মাটিতে যে কোমল সৌন্দর্যের প্লাবন বহাইয়া দেয় তাহাতেও ক্ষীণজীবী প্রাণচাঞ্চল্যের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

শরতে বড়ো বড়ো বনস্পতি তেমন করিয়া আত্মঘোষণা করে না। এই ঋতুতে মাটির কোল তৃণশস্যে ভরিয়া যায়। ইহাদের শোভা যুগ যুগ ধরিয়া নানা স্তরের মধ্য দিয়া আপনাকে বিকশিত করিয়া তোলে না—যেমন সহসা ইহাদের জন্ম, তেমনই সহসা ইহাদের অবসান। এই হরিৎ সৌন্দর্যের দূত-গুলি পৃথিবীতে চিরস্থায়ী বাসা বাঁধিতে আসে নাই—পৃথিবীতে তাহাদের

আবাস নাই। কিন্তু ধরণীর আতিথ্য ইহারা লাভ করিয়াছে। মাটির বুক সরস হইয়া ইহাদের জন্য কয়েকদিনের মতো অপরিসীম স্নেহ বিতরণ করে।

(৩) আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল।

পাশ্চাত্ত্য দেশের শরৎ ও আমাদের দেশের শরতের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের শরতের প্রকৃতিতে বিচ্ছেদের সুর, বিদায়ের সুরই স্পষ্ট হইয়া উঠে। সারা প্রকৃতি জুড়িয়া এমন একটা রিক্ততার আভাস ফুটিয়া উঠে যে, হারানোর বেদনাই তাহার অন্তিম পরিণতি বলিয়া অনুভব করা যায়।

কিন্তু আমাদের দেশের শরতের রূপ ও ভাব অন্যরকম। আমাদের দেশের শরতে শীতের পূর্বাভাস থাকিলেও সৌন্দর্যের যে প্রকাশ সেখানে দেখা যায় যে, ভাবী বিদায়ের সম্ভাবনাকে অতিক্রম করিয়া একটা মাধুর্যের সুর ধ্বনিত হইতে থাকে। তাহা ছাড়া, আমাদের দেশে শরৎকালে আগমনীর সুরটিও স্পষ্ট হইয়া উঠে। বিচ্ছেদের, বিজয়ার করুণ সুরটিও ইহার শেষে আছে বটে, কিন্তু তাহাই শরতের প্রধান অঙ্গ নয়। শরতের মূল ভাবটি আগমনীর সুরের মধ্যে প্রকাশিত। বিজয়ার পরেও আবার আগমনীর আশা থাকে বলিয়া বিজয়ার পূরবী আগমনীর আশাবরীকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে না।

B. A. BENGALI SECOND LANGUAGE

প্রবন্ধ সংগ্রহ

(প্রমথ চৌধুরী)

বর্তমান বঙ্গসাহিত্য

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থী সমালোচকদের অভিযোগ কী? প্রমথ চৌধুরী সেগুলি যেভাবে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা আলোচনা কর।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার তুলনায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যকে যে নিন্দা করা হয় ইহার মূলে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বর্তমানকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তির অভাব বর্তমান বলিয়া প্রমথ চৌধুরী মনে করেন। অতীত সাহিত্যের যে প্রশংসা করা হয় তার কারণ অতীত একটা স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে এবং ঐ অতীত জনশ্রুত প্রশংসায় ভক্তির পাত্র বলিয়া এমনভাবে প্রচারিত যে, আমরা নূতন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু বর্তমান সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য উক্তি না থাকায় নিজেদেরই চিন্তা করিয়া তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নিন্দা করা সহজ, যথার্থ বোধ লইয়া প্রশংসা করা কঠিন।

নব্য সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়, তাহা প্রধানতঃ এই —'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য অপর্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন ও প্রতিভাহীন, চুটকি ও নকল।'—বর্তমান বঙ্গসাহিত্য যে অপর্যাপ্ত সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বর্তমানে ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় সুপ্রচুর পত্রপত্রিকা প্রকাশিত। বাংলা-সাহিত্যে এই জনসমাগমের একটা আশাপ্রদ দিক এই যে, বাঙালী এযুগে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য যে পরিমাণ রচনা

প্রকাশিত হইতেছে তাহার তুলনায় বাঙালীর আত্মপ্রকাশ অতি সামান্তই ঘটিতেছে। কিন্তু ইহার কারণ এই যে, বাঙালীর জাতীয় আত্মা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। সাহিত্য এই জাতীয় আত্মাকে গড়িয়া তুলিবার অন্যতম প্রধান উপায়। মানসবৃত্তিগুলির উপযুক্ত কর্ষণা হইলে আত্মা গড়িয়া উঠিতে পারে। বাঙালী যে সুপ্রচুর সাহিত্য রচনা করিতেছে তাহা অবশ্যই তাহার চিত্তে একটা ছাপ রাখিয়া যাইতেছে। বাঙালীর এই সাহিত্যিক মুখরতার ফলে অনেক বাজে কথা বা ভুল মতও প্রচারিত হইতেছে সন্দেহ নাই। পুচ্ছগ্রাহিতা ইহার জন্ত দায়ী। অবশ্ত ইহাতে ভাবী গুণীর আবির্ভাব সহজ হইবে ; তাহা ছাড়া, ইহাতে পাঠক-সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে।

এযুগে লেখকের সংখ্যা অজস্র হওয়ায় ক্ষুদ্র লেখক বড়ো লেখক বলিয়া পরিগণিত হইবেন না। উনবিংশ শতাব্দীতে কোনো কোনো অল্পশক্তি লেখক সভক্তি প্রচারের গুণে মহৎ লেখক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন।—বর্তমানে যে সাহিত্য রচিত হইতেছে তাহা আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় সন্দেহ নাই। 'ছোট গল্প, খণ্ড কবিতা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং প্রক্ষিপ্ত দর্শনই এ সাহিত্যের প্রধান সম্বল।' এই 'কৃশতা'কেই বর্তমান সাহিত্যের দুর্বলতার চিহ্ন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী রচনার কলেবরের খর্বতাকে লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন না। সাহিত্যজগতে এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নাই যে, সকলকেই মহাকাব্য রচনা করিতে হইবে। ইংরেজি ভাষায় 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর পর আর অপর মহাকাব্য রচিত হয় নাই, ফরাসি ভাষায় মহাকাব্য আদৌ নাই—কিন্তু তাই বলিয়া মিলটনের পরবর্তী ইংরেজি সাহিত্য বা ফরাসি সাহিত্য দুর্বল বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। বর্তমানে বাংলা সাহিত্য যে নাতিদীর্ঘ তাহাতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে লেখকরা কেবল সারটুকুই পরিবেশন করেন এবং তাঁহারা পাঠকদের মান্ত করেন। পাঠকদের বুঝাইবার জন্ত অল্প বিষয়কে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বলার পক্ষপাতী তাঁহারা নন।

এযুগে কোনো প্রতিভাশালী স্রষ্টা জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া সমালোচকরা যে অভিযোগ করেন, তাহা বর্তমান সাহিত্যের দোষ নয়, দুর্ভাগ্য। প্রতিভা যে কিভাবে উদ্ভূত হয় তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তবে প্রতিভার বিকাশের জন্য অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর লেখকবৃন্দ নূতন সাহিত্য গড়িবার যে সুযোগ পাইয়াছিলেন তাহা আমরা পাই নাই। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো কথা। এই 'একটি সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রভূত ঐশ্বর্য ও অপূর্ব সৌন্দর্যশালী সাহিত্যের সংস্পর্শেই উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য জন্মগ্রহণ করে। সে সাহিত্যের উপর প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের বঙ্গসাহিত্যের কোনোরূপ প্রভুত্ব ছিল না।' —মধুসূদন পূর্ববর্তী যুগের প্রধান কবি ভারতচন্দ্রের ভাষার অনুকরণ করেন নাই বা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে তাঁহার আখ্যায়িকার অনুসরণ করেন নাই।—কিন্তু বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয় অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ায় তাহা হইতে আমরা নূতন উদ্দীপনার উপাদান খুঁজিয়া পাই না। প্রথম পরিচয়ের চমক ভাঙিলেও আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই নাই। ফলে, আমরা পূর্ববর্তীযুগের সাহিত্যেরই অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। এই অবস্থায় নূতন কিছু করা একরূপ অসম্ভব। ভিতর হইতে বা বাহির হইতে নূতন ভাবের প্রবাহ না বহিলে প্রতিভাশালী লেখকের উদ্ভব হইতে পারে না। গত যুগের ভাবপ্রবাহের বেগ এখন প্রশমিত হইয়াছে, অথচ এখন নূতন কোনো ভাব উদ্ভূত হয় নাই। বরং সমাজ যেন ভাটাপথে পূর্বতন ভাবের প্রবাহের দিকে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে কোনো কিছু রচনা করিলে সমালোচকের নিন্দা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। কারণ, যদি আমরা পূর্ববর্তীযুগের সাহিত্যের অনুসরণ করি, তাহা হইলে আমরা অনুকারক বলিয়া নিন্দিত হইব; আবার যদি আমরা নূতন কিছু করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলেও আমরা পূর্বতন উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া

অভিযুক্ত হইব। অথচ লেখকমাত্রেই কিছুটা অতীতের ও কিছুটা বর্তমানের অনুসরণ করিতে বাধ্য। বর্তমানে সাহিত্যিকরা যে মেঘনাদবধ বা দুর্গেশ-নন্দিনীর মতো সাহিত্য সৃষ্টি করেন না তাহার প্রধান কারণ এই যে, বর্তমানে পূর্বযুগের প্রভাব মুছিয়া যাইতে বসিয়াছে। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যই কাব্যসাহিত্যের একমাত্র আদর্শ বলিয়া বর্তমান কাব্যসাহিত্যের যে কোনো মর্যাদা নাই এই অভিমতকে প্রথম চৌধুরী অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন। এই সাহিত্যকে নকল সাহিত্য বলিবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। কারণ, অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না একথা সত্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ অনুসরণের নিদর্শন আছে। জার্মান সাহিত্যে শিলার গ্যেটের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ফরাসি সাহিত্যে মুসে ও গী দ্য মোপাসাঁ, হুগো ও ফ্লোবেয়রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস, অনন্তদাসের রচনা যে চণ্ডীদাসের ও বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুসরণে রচিত বলিয়া অপাংক্তেয় একথা কেহ বলেন না। আর যদি অনুকরণকেই নিন্দা করিতে হয় তাহা হইলে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যকে নিন্দা করা উচিত, কারণ, তাহা বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য আত্মপর ভেদ ত্যাগ করিয়া মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে রচিত সাহিত্যকে নকল বলা চলে না।

এযুগের কবিদের রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা যে পূর্ববর্তীযুগের কবিদের রচনার তুলনায় ভাষার পারিপাট্য ও আকারের পরিচ্ছন্নতায় অনেক ভালো তাহা সহজেই চোখে পড়ে। মনের ভাবমাত্র প্রকাশ করিলেই তাহা কবিতা হয় না—সেই ভাবকে মূর্ত করিয়া তুলিতে হইবে। ছন্দ মিল প্রভৃতি লইয়া কাব্যের যে দেহ গড়িয়া উঠে তাহার সাধনায় একালের লেখকরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এখানে আপত্তি উঠিতে পারে যে, কাব্যের ভাবের অভাবের ফলেই এই বাহ্য পরিপাট্যের উদ্ভব। কিন্তু

সুঠাম দেহ না হইলে সুঠাম ভাব মূর্ত হইতেই পারে না। কবিতা রচনার শিল্পগত দিকটা বর্তমানে যে লেখকদের আয়ত্ত হইয়াছে তাহা লইয়া আক্ষেপের কারণ নাই। তাহা ছাড়া, বাহ্য শিল্পকলারও প্রয়োজন আছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যের বাহ্য সৌন্দর্য না থাকিলে তাহার কতটুকু মূল্য থাকিত?

মহাকাব্যের দিন যে আর নাই তাহা আজ বিশ্বময় স্বীকৃত। ফরাসি লেখক আঁদ্রে জীদ বলেন যে, গীতাঞ্জলি ক্ষুদ্রকায় বলিয়াই ওদেশের পাঠকরা তাহাকে সযত্নে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। ইউরোপে যে কারণে মহাকাব্য লেখা বন্ধ হইয়াছে এদেশেও সেই একই কারণে মহাভারত রচিত হয় না। বরং কথাসাহিত্যের অন্যতম বাহন উপন্যাস বর্তমানে ধীরে ধীরে মহাকাব্যের বিরাট কলেবর পরিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তবে ইউরোপে একদিকে যেমন বিরাটকায় উপন্যাস রচিত হইতেছে অপর দিকে তেমনই খর্বকায় ছোট গল্প রচিত হইয়াছে। আমাদের দেশে যে উপন্যাসের তুলনায় গল্পেরই আধিক্য ইহা একরূপ দৈন্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মূল আমাদের জাতীয় জীবনেই বর্তমান। বিগত যুগের কথা-সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং সঞ্জীবচন্দ্রের দুই-একটি রচনা ও তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' ব্যতীত উল্লেখযোগ্য রচনা নাই। আমাদের জীবন ও মন এতই বৈচিত্র্যময় এবং সে মনে ও জীবনে ঘটনা এত অল্পই ঘটে, এবং যা ঘটে তাও এত বিশেষত্বহীন যে, তার থেকে কোনো বিরাট কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করা যায় না। এইজন্যই ছোট গল্পের যে পথ রবীন্দ্রনাথ খুলিয়া দিয়াছেন তাহাতেই বেশী ভিড়। বস্তুতঃ, নূতন পথে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখকই যাত্রা করেন—সুতরাং বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের আক্ষেপের কারণ নাই।

প্রমথ চৌধুরী বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও।

অনেক প্রাচীনপন্থী সমালোচক ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বর্তমান যুগের বাংলাসাহিত্য যে নীচে নামিয়া গিয়াছে এই অভিযোগ করিলে প্রমথ

চৌধুরী সে অভিযোগ খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার আলোচনায় বর্তমান বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রমথ চৌধুরী বর্তমান বঙ্গসাহিত্যকে উনবিংশ শতকের বঙ্গসাহিত্যের তুলনায় অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই। স্বকীয় চিন্তা দিয়া তিনি বাংলা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

বাংলাসাহিত্যের যে জিনিসটি বাহ্যত আমাদের চোখে পড়ে, তাহা ইহার পরিমাণের প্রাচুর্য। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে পত্রিকাদি ও গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। 'আজকের দিনে বাংলার সাহিত্যসমাজ লোকে লোকারণ্য; এবং এ জনতার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আছেন।'—বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে মহিলাদের প্রবেশ এযুগের একটি নূতন ঘটনা। তবে রচনার মধ্যে নারীদের স্বভাবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না—নারী ও পুরুষের রচনার মধ্যে যে পার্থক্য নাই ইহা লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

কিন্তু এই সুপ্রচুর রচনার মধ্যে বাঙালীর আত্মপ্রকাশের আকুলতা থাকিলেও তাহার আত্মা যে প্রকাশিত হইতেছে না তাহা লেখক স্বীকার করিয়াছেন। তবে লেখকদের অক্ষমতা ইহার কারণ নয়, ইহার কারণ এই যে, বাঙালীর আত্মা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে রচনার প্রাচুর্যের ফলে অনেক মিথ্যা কথা স্থান পাইতেছে। কালক্রমে এই সকল মিথ্যাকথা ঘুচিয়া গিয়া সত্যটা থাকিয়া যাইবার কথা—বিভিন্ন মতবাদ থাকা অসঙ্গতও নয়। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে, এক একটি ভুল মত বহুজন-স্বীকৃত হইয়া সত্যরূপে চলিয়া যাইতেছে। আমাদের জীবনের সুরে বৈচিত্র্যের অভাব থাকায় আমাদের সাহিত্যও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে—তাহার উপর সাহিত্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের পরিবর্তে একটি সুরের অনুসরণ করাই আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাবের পুনরুক্তির কারণ এই যে, আমাদের চিন্তাশক্তি এখনও জাগ্রত হয় নাই।

সুতরাং আমরা গুণীর জন্য আসর জাগাইয়া বসিয়া আছি এই কথা বলিতে পারি মাত্র। ইহার ফলে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং পাঠকের মধ্যেই কেবল কৌতূহল জাগ্রত হইতেছে।

এযুগে কোনো প্রতিভাবান্ লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া আমরা নূতনের স্বাদ হইতে বঞ্চিত। (লেখক রবীন্দ্রনাথকে পূর্বযুগে ফেলিয়াছেন)। উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা লেখনী ধারণ করেন ইংরেজি সাহিত্যের সহিত নব পরিচয়ের উন্মাদনায় তাঁহারা বিচিত্র উপভোগ্য সামগ্রীতে বাংলা-সাহিত্যকে ভরিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যের সহিত প্রথম পরিচয়ের চমক ভাঙিয়াছে, অথচ তাহার সহিত আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই নাই। সুতরাং একদিকে প্রতিভাশালী লেখক আবির্ভূত হওয়ায় সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন বিষয় উদ্ভূত হয় নাই। অপরদিকে ইংরেজি সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে ইংরেজি সাহিত্য হইতেও নূতন ভাবের স্রোত আমাদের সাহিত্যকে ভরিয়া দেয় নাই। সুতরাং পূর্বতন আদর্শই অনুসৃত হইতেছে। কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতা একমাত্র আদর্শ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

বর্তমান যুগের কবিদের রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, এযুগের রচনা 'ভাষার পারিপাট্যে এবং আকারের পরিচ্ছন্নতায় পূর্বযুগের কবিতা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।' ছন্দ, মিল, ধ্বনি প্রভৃতির শোভন ব্যবহারে এযুগের কবিদের শিল্পদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে এ শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউশনের এক ধাপ উপরে' উঠিয়া গিয়াছে। 'রচনার আর্ট নবীন কবিদের অনেকটা করায়ত্ত' হইয়াছে। তবে ভাবের অভাব হইতেই এই ভাষার কারিগরি যে জন্মলাভ করিয়াছে এই অভিযোগ প্রমথ চৌধুরী পুরাপুরি অস্বীকার করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র এইটুকু বলিয়াছেন যে, যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য নাই তাহার যে আত্মার

সৌন্দর্য থাকিতে পারে ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। 'প্রচ্ছন্নমূর্তি ও পরিচ্ছন্ন মূর্তি একরূপ নয়।' বর্তমানে কবিদের রচনায় যে দৈহিক সৌন্দর্য প্রকাশিত তাহাই আত্মার সৌন্দর্যকে ধারণ করিতে পারে। বর্তমান কবিদের রচনায় ভাবসম্পদের প্রাচুর্য না থাকিলেও ভাবসম্পদের দিক হইতে তাহা যে একেবারে রিক্ত একথা তিনি আদৌ স্বীকার করেন না।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে পূর্বযুগের মতো মহাকাব্য রচিত হয় না—মহাকাব্যের যুগ যে বিগত হইয়াছে তাহা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনুধাবন করা যায়। এযুগের কবিতায় হৃদয়ের ভাবকণিকা প্রকাশিত, সুতরাং তাহা দীর্ঘ না হইয়া হ্রস্বই হয়। বর্তমানে আখ্যায়িকা গদ্যভাষায় উক্ত হয়। গদ্যে এযুগে যে সকল উপন্যাস রচিত হইতেছে, সেগুলি পূর্বযুগের মহাকাব্যের স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। ইউরোপে উপন্যাস ও ছোট গল্প উভয়েরই প্রাচুর্য দেখা যায়, কিন্তু এদেশে ছোট গল্পেরই প্রাচুর্য। ইহা বাংলাসাহিত্যের দুর্বলতার অন্যতম লক্ষণ। অবশ্য আমাদের জীবনে যে উপন্যাসের উপজীব্য হইবার মতো বিচিত্র উপকরণের নিতান্ত অভাব তাহা লেখক স্বীকার করিয়াছেন।

প্রমথ চৌধুরী যে সময় এই প্রবন্ধটি রচনা করেন সে সময়ে বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপ্রতিহত। কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁহার রচনাই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি যেখানে গল্প-সাহিত্যের পথ খুলিয়া দিয়াছেন সেখানে এদেশের লেখকরা দলে দলে সমবেত হইয়াছেন। এযুগে অসাধারণ কোনো ঔপন্যাসিক না থাকিলেও এমন অনেক কথাসাহিত্য রচিত হয় যাহার উৎকর্ষ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর বৈদগ্ধ্য ও রসজ্ঞতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

বিংশ শতাব্দীর বিদগ্ধ ও রসজ্ঞ সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর

নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপের প্রায় সবদেশের সাহিত্যের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন এবং এদেশের বাংলা বা সংস্কৃত সাহিত্যও তাঁহার অপঠিত ছিল না। তবে তাঁহাকে ফরাসি সংস্কৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। তাঁহার রচনার মধ্যে ফরাসি সাহিত্যসুলভ পরিমার্জিত ভাষণ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমান বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, ফরাসি সাহিত্য ও জার্মান সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন।—অনুকরণ দ্বারাও যে মনোজ্ঞ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব ইহা দেখাইবার জন্য তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক মনোহারী কাব্য বা নাটক পূর্ববর্তী রচনার অনুসরণে রচিত হইয়াছে। রত্নাবলী মালবিকাগ্নিমিত্রের অনুসরণে লিখিত হইলেও একটি উপাদেয় নাটক। তবে 'ও উপায়ে অবশ্য কালিদাস হওয়া যায় না, কিন্তু শ্রীহর্ষ হওয়া যায়।'—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও বহু কাব্য অনুকরণের ফলে রচিত হইয়াছে। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ পদকর্তাগণ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন।—ফরাসি ও জার্মান সাহিত্য হইতেও তিনি অনুকরণের অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ফরাসি সাহিত্যে মুস্‌সে ভিক্তর হুগোর অনুসরণ করিয়াছিলেন, গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁ ফ্লোবেয়রের নিকট শিক্ষানবিসি করিয়াছিলেন। জার্মান সাহিত্যে শিলার গ্যেটের অনুসরণ করিয়াছিলেন—অন্যত্র তিনি শিল্পসর্বস্বতার দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতচন্দ্রের কাব্যের কথা তুলিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে বহিরঙ্গের সৌন্দর্যই সব, তাহার ভাববস্তু যে অসার এবং কলঙ্কময় তাহা তাঁহার মার্জিত বুদ্ধির অগোচর ছিল না।

আধুনিক যুগে ইউরোপে যে মহাকাব্য রচিত হয় না প্রমথ চৌধুরী সে সন্ধান বিভিন্ন দেশের সাহিত্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হইতেই বলিয়াছেন।

মিলটনকে শেষ মহাকাব্যরচয়িতা বলিয়া তিনি তাঁহার পরবর্তীকালের কাব্যের আকৃতিগত হ্রস্বতার কথা বলিয়াছেন। বর্তমান কাব্য যে হৃদয়ের স্বগতোক্তি এই উপলব্ধিটি তাঁহার রসজ্ঞতার পরিচয় দেয়। বর্তমানে কেন যে মহাকাব্য রচিত হয় না সে সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই বটে, কিন্তু বর্তমান যুগে উপন্যাস যে মহাকাব্যের স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না। ইউরোপীয় সাহিত্যে একদিকে বৃহৎকায় উপন্যাস অপর দিকে ছোট গল্প দুই-ই যে অজস্র পরিমাণে রচিত হইতেছে এই ঘটনাটিকে তিনি ইউরোপের সাহিত্যের শক্তির পরিচায়ক বলিয়াছেন। সেই সঙ্গে এ দেশের সাহিত্যে কেবলমাত্র ছোট গল্পের প্রচলন যে দুর্বলতার পরিচায়ক তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এদেশের জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য না থাকায় তাহা যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় উপন্যাসের উপাদান হইতে পারে না ইহা তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত।

প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি নিরতিশয় স্বচ্ছ। বিপক্ষের মতকে নিরস্ত করিবার জন্য তিনি যে যুক্তি-বাণ নিক্ষেপ করেন তাহা কোনো কোনো স্থলে প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে তীক্ষ্ণ হইলেও তর্কযুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যে তিনি অযৌক্তিক কথা বলেন নাই। বর্তমান যুগের সাহিত্য যে দীন নয় তাহা তিনি নানাভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে বাংলা-সাহিত্যে যে-কোনো যথার্থ প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয় নাই তাহা তিনি অস্বীকার করিতে চাহেন নাই। বর্তমান কবিদের শিল্পদক্ষতার প্রশংসা তিনি করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে ভাবগত উৎকর্ষের অভাব যে আছে তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। বর্তমানযুগে বাংলাদেশে যে প্রচুর সাহিত্য রচিত হইতেছে তাহার মধ্যে বাঙালীর আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই সাহিত্যের মধ্যে বাঙালীর আত্মা যে প্রকাশিত হয় নাই তাঁহার এই উপলব্ধি অসাধারণ সাহিত্যবোধের পরিচয় দেয়।

বাস্তবিকপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর রচনায় এই যে মূল্যবোধ নিরূপণ আছে,

তাহা অল্প শক্তির পরিচায়ক নয়। ইহার জন্য একদিকে যেমন সাহিত্যের সহিত সুবিস্তৃত পরিচয় আবশ্যক, অন্যদিকে তেমনই যথার্থ রসজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যের তুলনায় এযুগের বাংলাসাহিত্য যে নিতান্ত তুচ্ছ—সমালোচকদের এই জাতীয় উক্তির প্রতিবাদে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিচারশক্তির পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো রচনাকে ভালো বা মন্দ বলা সহজ। কিন্তু সমগ্রভাবে কোনো যুগের সাহিত্যকে বিচার করিতে গেলে বিশ্লেষণ নৈপুণ্য থাকা প্রয়োজন। কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া প্রমথ চৌধুরী বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত রূপটি যেভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে সমালোচনায় তাঁহার অসামান্য শক্তির পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। পরবর্তী যুগের সমালোচনা সাহিত্য তাঁহার এই প্রবন্ধের অভিমত দ্বারা বহু স্থলেই যে প্রভাবিত হইয়াছিল বাংলা সাহিত্যের পাঠকের নিকট তাহা অজ্ঞাত নয়।

ব্যাখ্যা

(১) যদি আমরাই চিন্তামার্গে ক্লেশ করব, তাহলে গুরুর দরকার কি? আর যদি আমরাই পূজা করব তাহলে পুরোহিতের দরকার কি?

গুরু শিষ্যকে জ্ঞান দান করেন। গুরু নিজে বহু শ্রমে যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন শিষ্য গুরুর নিকট তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারে। তাহার জন্য তাহাকে বিশেষ পরিশ্রম বা চিন্তা করিতে হয় না। গুরু পরিপক্ক বুদ্ধি দিয়া শিষ্যকে যে জ্ঞানদান করেন শিষ্য তাহা সহজে লাভ করে।—পুরোহিত আমাদের হইয়া দেবতার পূজা করেন। দেবতার পূজার মধ্যে বহুবিধ প্রক্রিয়া ও জটিলতা আছে; তাহা সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। সেইজন্য পুরোহিত আমাদের নামে 'সংকল্প' করিয়া পূজা করেন।

সমাজজীবনে গুরু ও পুরোহিত আমাদের সাধনার দায় হইতে মুক্তি দেন।

প্রমথ চৌধুরী বলিতেছেন যে, বর্তমানে চিন্তাজগতেও আমরা গুরু-পুরোহিতের মতোই প্রাচীন বাক্যের উপর নির্ভর করিতে চাহি। নিজেরা চিন্তা করিলেই কোনো বিষয় বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর। কিন্তু আমরা নিজেরা কোনোরূপ চিন্তা না করিয়া পূর্ববর্তীরা কী বলিয়াছেন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাকেই বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করি না। এইভাবে পরমতের উপর নির্ভর করার ফলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, গত যুগের সাহিত্যের প্রশংসা শুনিয়া আমরা তাহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া জানি, বর্তমান যুগের সাহিত্য সম্পর্কে প্রশংসাবাণী না শুনিয়া তাহার নিন্দাই করি।

(২) আর্ট-জগতে এই অদ্বৈতবাদের হাত থেকে উদ্ধার না পেলে বঙ্গসাহিত্য মুক্তি লাভ করবে না এবং যতদিন এ দেশে আবার নূতন চৈতন্যের আবির্ভাব না হবে ততদিন আমরা এক কথাই একশবার বলব, কেন না সে কথা বলার ভিতরেও মন নেই, শোনার ভিতরেও মন নেই।

বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে রচনার প্রাচুর্য দেখা যাইতেছে। ইহার ফলে যাহা বলা হইতেছে তাহার মধ্যে কিছু কিছু অসত্য থাকাই স্বাভাবিক। যেখানে অনেকে কথা বলিতেছেন সেখানে মতগত পার্থক্যই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে একটা সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখা যাইতেছে। সকলে মিলিয়া যে কথাটি বলিতেছেন সে কথাটি সত্য নয়—একটি অসত্য লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন।

এই অবস্থার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদের চেতনা অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। তীক্ষ্ণভাবে এবং যথার্থভাবে কোনো কিছু বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। যে কথা একবার বলা হইয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিকপক্ষে মিথ্যা হইলেও তাহার চতুর্দিকেই আমাদের চিন্তা আবর্তিত হইতেছে।

বাংলাদেশে আর একবার এই অবস্থা হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপে বিদগ্ধ সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের চর্চাতেই নিমগ্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের জীবনে অদ্বৈতবাদের জীবনবিমুখ জ্ঞানসর্বস্বতা স্থান পাইয়াছিল। এই জ্ঞানের ঊষরতার ক্ষেত্রে চৈতন্যদেব প্রেম-ভক্তির স্রোত বহাইয়া বাঙালীর চিত্তকে সরস ও উর্বর করিয়া তুলিয়াছিলেন। বর্তমানে দেশব্যাপী যে অস্পষ্ট জ্ঞান অদ্বৈতরূপে জাতীয় চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে নূতন চৈতন্যের আবির্ভাব প্রয়োজন। একটা নবীন চেতনা জাগ্রত হইলেই বাঙালীর জ্ঞানগত অসাড়তা ঘুচিয়া যাইবে।

(৩) এ যুগের কবিতা হচ্ছে হৃদয়ের স্বগতোক্তি, সুতরাং সে উক্তি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের চাইতে দীর্ঘ হতে পারে না।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী এযুগে মহাকাব্য যে রচিত হয় না তাহা বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছেন। পূর্বযুগে যে মহাকাব্য রচিত হইত তাহা দীর্ঘ কাহিনীর আধার হওয়ায় তাহার বিস্তৃতি ছিল। রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য সেই বিস্তৃতির অন্যতম দৃষ্টান্ত।

কিন্তু এযুগে কাব্যে গল্প বলা হয় না। বর্তমানে গদ্যই গল্প বলার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কাব্যও বাহ্য কাহিনীকে ত্যাগ করিয়া মানুষের হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এযুগের কবিতায় মানুষের অন্তরই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি বা মানুষ তাহার হৃদয়ে যে ভাববিশেষ সঞ্চার করে তাহাই এযুগের কাব্যের বিষয়বস্তু। সুতরাং তাহাকে হৃদয়ের স্বগতভাষণ বলা যাইতে পারে।

হৃদয়ের উক্তি প্রায়ই একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া থাকে। প্রমথ চৌধুরী বলিতে চাহেন যে, বর্তমানে কাব্য যখন হৃদয়েরই স্বগতোক্তি

তখন তাহার দৈর্ঘ্য দীর্ঘনিঃশ্বাসকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। বাস্তবিক-পক্ষে বর্তমানে কাব্যের মধ্যে চিত্তের এক-একটি ভাব ঘনীভূত আকারে প্রকাশিত হয়—তাহার স্বল্প পরিসরের মধ্যে অন্তরের ভাবনা মুক্তার মতো দানা বাঁধিয়া উঠে। আধুনিক যুগের কবিতা অতি সঙ্গত কারণেই হ্রস্ব।

(৪) কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, কোনো মহাজন কর্তৃক একটি সুগম পন্থা অবলম্বিত হলে সেখানে চিরদিনই এমনি জনসমাগম হয়ে থাকে, তার মধ্যে দু-চারজন শুধু এগিয়ে যান।

পৃথিবীতে কেবলমাত্র প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাই ধর্ম বা সাহিত্যে নূতন পথ খুলিয়া দিতে পারেন। চিরাচরিত পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথ গ্রহণ করা প্রতিভার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ।

কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিভার সংখ্যা নিতান্ত বিরল। সুতরাং কোনো প্রতিভা একবার যে পথের সন্ধান দিয়াছেন, বহুব্যক্তি সেই পথ অবলম্বন করিয়াই চলিতে থাকে। নূতন পথ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকে না। যখন কোনো প্রতিভাবান্ ব্যক্তি কোনো একটি ধর্ম-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন, তখন তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে—তাঁহাকে ধর্মগুরু বলিয়া মানিয়া লইয়া অনেকে তাঁহার পথ অবলম্বন করিতে অগ্রসর হয়। যখন কোনো শক্তিধর সাহিত্যিক সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন একটি ধারার প্রবর্তন করেন, তখন তাঁহার সেই ধারা অনুসরণ করিয়া অনেক দিন পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্ট হইতে থাকে। এদেশে রবীন্দ্রনাথের রচনা ঐভাবে আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

যাঁহারা প্রতিভাশালী বলিয়া পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নন, অথচ বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী, তাঁহারা পূর্বপ্রদর্শিত পথেই আরও কিছুটা আগাইয়া যাইতে পারেন। তবে পূর্ববর্তী আদর্শের পরিবর্তে নূতন আদর্শের সন্ধান একমাত্র প্রতিভাশালী ব্যক্তিই দিতে পারেন।

বীরবল

প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছেন কেন? তিনি বীরবলের জীবনের যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও।

প্রমথ চৌধুরী বাল্যকালে একবার শীতকালে মজঃফরপুরে বেড়াইতে যান। সেখানে সন্ধ্যার পর তাঁহার পিতা একটি উর্দু বই হইতে তাঁহাদের গল্প শোনাইতেন। সেই গল্পের বেশীর ভাগই আকবরের প্রশ্ন হইতে সুরু এবং বীরবলের উত্তরে পরিসমাপ্ত। আকবরের প্রশ্নের উত্তরে বীরবলের 'চোখা চোখা জবাব' শুনিয়া প্রমথ চৌধুরী বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মহাভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।—পরে যখন তিনি 'দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্যকথা' শোনাইতে মনস্থ করেন, তখন তিনি বীরবলের নাম গ্রহণ করিলেন, 'এ নামের দুইটি স্পষ্ট গুণ আছে : প্রথমতঃ, নামটি ছোট, দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতিমধুর।' যৌবনে তিনি তাঁহার মুসলমান বন্ধুদের মুখে মৌলবী দো-পিঁয়াজা নামক জনৈক উচ্চঃশ্রেণীর রসিকের নাম শোনেন—যাঁর নামে প্রচলিত গল্পে বীরবল বার বার অপদস্থ হইয়াছেন। কিন্তু দো-পিঁয়াজাকে তিনি বীরবলের প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড় করানো কাল্পনিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তাহা ছাড়া, নামটি শ্রুতিকটু বলিয়া তিনি ইহা গ্রহণ করিতে আগ্রহবোধ করেন নাই।

মৌলবী দো-পিঁয়াজার উল্লেখ কয়েকটি কাল্পনিক গল্প ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তিনি যে ছিলেন একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে না। কিন্তু বীরবল যে বাস্তবিকপক্ষে ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। আকবরের সমসাময়িক লেখকরা তাঁহার মৃত্যুর বর্ণনা সোৎসাহে করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে এক সময়ে বর্তমান ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বীরবল আকবরের প্রিয় পাত্রবর্গের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত—সুতরাং আকবরের প্রসাদপ্রার্থী অনেকের নিকটই তিনি নিতান্ত অপ্রিয়রূপে গণ্য হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ের অধিকারী লোকেদের নামই ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ ফারসি ভাষার গ্রন্থাদি হইতে বীরবলের পরিচয় উদ্ধার করিয়াছেন। বীরবল নামটি রাজদত্ত। তাঁহার প্রকৃত নাম মহেশ দাস। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে কাম্পি নগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের আশ্রয়ে বাস করিতেন, পরে রাজা তাঁহাকে বাদশাহ্ আকবরের নিকট পাঠাইয়া দেন। 'মহেশ দাসের কবিতা, তাঁর সংগীত, তাঁর রসালাপ, তাঁর গল্প আকবরকে এত মুগ্ধ করে যে, তিনি তাঁকে "কবিরায়" উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐতিহাসিকেরা তাঁকে কখনো আকবরের মন্ত্রী কখনো বা প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। পরে আকবর শাহ্ তাঁকে "রাজা বীরবল" উপাধি দেন, এবং সেই সঙ্গে বুন্দেলখণ্ডের কালঞ্জর রাজ্য ও কাংড়া প্রদেশ জায়গীর দেন। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বীরবলকে সেনাপতি করে কাবুল যুদ্ধে পাঠান, এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানদের হস্তে তিনি ভবলীলা সংবরণ করেন।'

ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ ছাড়াও আবদুল কাদিরের রচনা হইতেও বীরবল সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। তাঁর তারিখ-ই-বাদাউনি গ্রন্থে বীরবলের নামে কটূক্তি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু বীরবলের উপর জাতক্রোধ হইলেও বাদাউনি তাঁহার সম্পর্কে অহেতুক মিথ্যা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাদাউনি বলেছেন যে, 'বীরবল প্রথমে রেওয়ার রাজা রামচন্দ্রের আশ্রয়ে ছিলেন, তিনিই বীরবল ও তানসেনকে তাঁর সভার দুটি রত্ন হিসেবে বাদশাহকে উপঢৌকন দেন।'

ভিনসেণ্ট্ স্মিথের রচনায় বীরবলের যে জীবনী পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কিছু কিছু ভ্রান্তি আছে। বীরবল 'একাধারে কবি গায়ক গল্পরচয়িতা ও সুরসিক'—কিন্তু স্মিথ্ তাঁহাকে কেবল ভাঁড় বলিয়াই তাঁহার পরিচয় সমাপ্ত করিয়াছেন। বীরবল আকবরের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, নিতান্ত অদ্ভুতভাবে ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ তাহা ভুল বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আকবর ফতেপুর সিক্রীতে বীরবলের বাসের জন্য একটি

প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাসাদের নিকটে নাকি আস্তাবল ছিল। ইহা হইতে স্মিথ্ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বীরবল আকবরের 'আস্তাবলের জমাদার' ছিলেন।—বাদাউনির গ্রন্থে এইরূপ কোনো অভিযোগ নাই।

স্মিথ্ সাহেবের গ্রন্থে বীরবলের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আছে। কাবুলের যুদ্ধে বীরবলের মৃত্যুকে তিনি inglorious death বলিয়াছেন। তাহা ছাড়াও তাঁহার মতে বীরবল যুদ্ধ ব্যাপারে অজ্ঞ এবং অক্ষম ছিলেন। তাঁহার মতো অপদার্থকে যুদ্ধে পাঠানোই আকবরের মতো দূরদর্শী সম্রাটের ভুল হইয়াছিল। বীরবল কাবুলের যুদ্ধে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

বীরবলের সমসাময়িক অপর ঐতিহাসিক বাদাউনি বা ফৈজীর রচনায় এইরূপ অভিযোগ না থাকায় স্মিথের এই মতটিকে স্বকপোলকল্পিত ও ভ্রান্ত বলিতে হয়। ফৈজী বলিয়াছেন যে, কাবুলের এই যুদ্ধে প্রায় পাঁচশত লোক মারা যায়—বীরবল ইহাদের অন্যতম। বীরবলের মৃত্যুতে আকবর যে শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

মুসলমানদের অনেকে বীরবলের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন, তাহার কারণ এই যে, আকবরের উদার ধর্মনীতির মূলে যাঁহাদের প্রেরণা ছিল তাঁহাদের মধ্যে বীরবল অন্যতম। কিন্তু সেকালের হিন্দুরা যে বীরবলকে শ্রদ্ধা করিতেন তাহার পরিচয় প্রখ্যাত হিন্দী কবি কেশবদাসের কাব্যে পাওয়া যায়। বীরবলের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কেশবদাস যে শোকসূচক কবিতাটি রচনা করেন তাহাতে দেখা যায় যে, 'বীরবলের মৃত্যুতে একদিকে মিথ্যা কথার ঢাকঢোল ও ঘোর ভেদের ভেরী বেজে উঠেছিল।...অপর দিকে আবার তেমনি শোকশঙ্খের ধ্বনিও লোকের কানে ও মনে বেজে উঠেছিল। বহু দরিদ্রের দরবারে তাঁর সুযশ ঘোষিত হয়েছিল।'—সুতরাং বীরবল যে একজন যথার্থই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

বীরবলের বিরুদ্ধে যে সকল অপবাদ প্রচারিত হইয়াছে প্রমথ চৌধুরী তাহা যেভাবে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা আলোচনা কর।

বীরবলের শক্তিকে খর্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন কতকগুলি গল্প প্রমথ চৌধুরী যৌবনে তাঁহার কয়েকজন মুসলমান বন্ধুর মুখে শোনেন। বীরবল আকবরের রাজসভার একজন সুরসিক সভাসদ্-রূপে প্রখ্যাত। তাঁহার চেয়ে বড়ো আর একজন রসিক ছিলেন যাঁহার নিকট বীরবলকে পদে পদে উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছে—ইহাই এই সকল গল্পের বিষয়বস্তু। ঐ রসিক পুরুষের নাম মৌলবী দো-পিঁয়াজা। এই মৌলবীর কোনো পরিচয় বা উল্লেখ পর্যন্ত সমসাময়িক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এইজন্য প্রমথ চৌধুরী মনে করেন যে, দো-পিঁয়াজা কাল্পনিক ব্যক্তি—তাঁহার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। 'বীরবল ছিলেন আকবরশাহের বিদূষক, আর তিনি জাতিতে ছিলেন হিন্দু। বিদূষক হিসেবে হিন্দুস্থানে এমন দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বলে তাঁর পাল্টা জবাব দিতে পারে এমন একজন মুসলমানি রসিক কল্পিত হয়েছে। তাঁর নামেই প্রমাণ যে, উক্ত নামধারী কোনো মৌলবী আকবর শাহের সভাসদ হতে পারত না।"

বীরবলের সমসাময়িক লেখক আবদুল কাদির নামক আকবরের জনৈক ঘোর সুন্নী সভাসদ তারিখ-ই-বাদাউনি নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বাদাউনি তাঁহার গ্রন্থের প্রায় পাতায় পাতায় বীরবলকে গালিগালাজ করিয়াছেন। তিনি বীরবলকে প্রায়ই 'দাসীপুত্র' গালিতে ভূষিত করিয়াছেন। বীরবল যখন কাবুলের যুদ্ধে নিহত হন তখন তিনি বলেন যে, প্রাণরক্ষার্থ পলায়নকালে বীরবল নিহত হন এবং নরকে কুকুরদের দলে প্রবেশ করেন —এইভাবে তিনি জীবনে যে সকল দুষ্কার্য করিয়াছিলেন তাহার ফলভোগ করেন।

প্রমথ চৌধুরী বীরবলের বিরুদ্ধে বাদাউনিকৃত এইসব অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বাদাউনি বীরবলের উপর

একান্ত ক্রোধ পোষণ করিতেন। বীরবলের প্রতি তাঁহার কটূক্তি তাঁহার এই ক্রোধেরই ফল। তাহা না হইলে তিনি বীরবল সম্পর্কে কোনো মিথ্যা অপবাদের বোঝা চাপান নাই।

বীরবলের প্রতি বাদাউনির এই বিদ্বেষের কারণ ছিল। বাদাউনির গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় যে, মোল্লা মহম্মদ ইউজিজি নামক এক ব্যক্তি আকবরের সভায় উপস্থিত হইয়া সুন্নী মতের নানারূপ নিন্দা করিয়া বাদশাহকে শিয়া মত গ্রহণ করাইতে বিশেষ চেষ্টা করেন। পরে বীরবল এবং শেখ আবুল ফজল আকবরকে সুন্নী মত হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। বাদাউনি গোঁড়া সুন্নী মতাবলম্বী—সুতরাং তিনি বীরবলের উপর যে নিতান্ত বিদ্বেষপরায়ণ হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তাঁহার মতে আকবর শাহও ইঁহাদের কুপরামর্শে ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে বুদ্ধি দিয়া বিচার করা যায় না বলিয়া তিনি প্রাত্যহিক নমাজ, উপবাসাদি নিষ্প্রয়োজনবোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিচারবুদ্ধিকেই তিনি ধর্মাচরণের মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। বীরবল-প্রমুখ পুরুষের সান্নিধ্যে আসিবার পর আকবরের হৃদয় উদার হইলে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন, 'আমি পূর্বে বহু ব্রাহ্মণকে জোর করে মুসলমান করেছি, আর তারা প্রাণভয়ে সে ধর্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এখন বুঝছি যে, আমি অতি গর্হিত কাজ করেছি।' ইহা ছাড়াও আকবর ধর্মের ক্রিয়াকলাপের উপর কোনো ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ প্রয়োগ করায় গোঁড়া মুসলমানরা নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। বাদাউনির সেই ক্ষোভের প্রকাশ বীরবলের প্রতি কটূক্তিতে প্রকাশ হইয়াছে কারণ বাদশাহের এই সকল আচরণের জন্য তিনি বীরবলকেই প্রধানত দায়ী বলিয়া মনে করিয়াছেন।

বীরবলের উদ্দেশে বাদাউনির কটূক্তির কারণ বোঝা যায়। কিন্তু প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ তাঁহার **Aktar the Great Mogul** নামক গ্রন্থে বীরবলকে নানাভাবে খর্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপরাপর লেখকদের রচনা হইতে জানা যায় যে, বীরবল কবি, গায়ক, প্রস্ক-

রচয়িতা ও সুরসিক ছিলেন এবং আকবরের অন্যতম মন্ত্রী—কাহারও কাহারও মতে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু স্মিথ্ বলিয়াছেন যে, বীরবল একজন সামান্য বিদূষক ব্যতীত আর কিছুই নন। অনেকে যে মনে করেন বীরবল আকবরের মন্ত্রী ছিলেন তাহা ভুল। তাঁহার অনুমান এই যে, বীরবল আকবরের আস্তাবলের জমাদার ছিলেন।—প্রমথ চৌধুরী স্মিথের এই অনুমানকে অসংগত বলেন। তিনি বলেন যে, স্মিথ্ যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই কথা বলিয়াছেন তাহা নিতান্ত অদ্ভুত। আকবর ফতেপুর সিক্রীতে বীরবলের বাসভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন। স্মিথ্ বলেন যে, এই বাসভবনের অদূরে অশ্বশালা ছিল। সুতরাং বীরবল যে আকবরের অশ্বরক্ষক ছিলেন ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। প্রমথ চৌধুরী বলেন যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। তাহা হইলে আলিপুরের লাটভবনের নিকটে পশুশালা অবস্থিত বলিয়া লাট সাহেবকে পশুশালার অধ্যক্ষ বলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের গৃহের নিকটে একটি আস্তাবল থাকায় ভবিষ্যতে হয়তো কেহ তাঁহাকে অশ্বপাল বলিবেন প্রমথ চৌধুরী ইহা সকৌতুক কটাক্ষ সহকারে বলিয়াছেন।

বীরবলের কাবুল যুদ্ধে গমন, পরাজয় ও মৃত্যু সম্পর্কেও স্মিথ্ সাহেব বিরুদ্ধ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বীরবল যুদ্ধ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ও অক্ষম ছিলেন। তাঁহার মতো লোককে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোই আকবরের ভুল হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অক্ষমতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হন এবং প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার সময় নিহত হন। স্মিথ্ সাহেব বীরবলের মৃত্যুকে নিতান্ত অগৌরবের মৃত্যু বলিয়াছেন।

প্রমথ চৌধুরী স্মিথ্ সাহেবের এই বর্ণনা যথার্থ বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন যে, বীরবল কবি ও গল্পকার ছিলেন বলিয়া যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া স্মিথ্ সাহেবের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সাহিত্যিক হইলেও যে যোদ্ধা হওয়া যায় টলস্টয় তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় রুশ পক্ষের একজন সেনাপতি ছিলেন। সে যুদ্ধে রুশ পক্ষের পরাজয়

হয়। কিন্তু এই পরাজয়ের জন্য তাঁহাকে রুশ সমাজে অগৌরব ভোগ করিতে হয় নাই। বরং রুশসম্রাট তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট সেনাপতি বলিয়াই মনে করিতেন। যুদ্ধে জয়লাভ বা পরাজয়ের উপর বীরত্ব নির্ভর করে না। আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া রাণী দুর্গাবতী যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু তিনি বীরাঙ্গনারূপেই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আছেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য পলায়নও অগৌরবের বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বস্তুত ঐ কাবুলের যুদ্ধেই অপর দুইজন মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ পলায়ন করেন ; কিন্তু সে জন্য কেহ তাঁহাদের নিন্দা করেন নাই। সুতরাং স্মিথের উক্তি সংগত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

বাস্তবিক পক্ষে স্মিথ্ সাহেব বাদাউনির গ্রন্থ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ধর্মক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করিবার জন্য আকবর যে সকল বিধিনিষেধ প্রচার করিয়াছিলেন স্মিথ্ সাহেব সেগুলিকে silly regulations বলিয়াছেন। অথচ আকবরের ধর্মবিশ্বাস যে বিচারসহ ও উদার ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গোঁড়া সুন্নী বাদাউনি এখানে স্মিথ্ সাহেবের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। বীরবলের প্রতি বিরূপতাও এই প্রভাবের ফল। বাদাউনি যেখানে বীরবলকে কটূক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন স্মিথ্ সেখানে তাঁহাকে অপদার্থ প্রতিপাদন করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। স্মিথ্ সাহেবের এই প্রয়াস বিচারসহ নয়—আকবরের সমকালীন অন্যান্য লেখকদের রচনায় তাঁহার উক্তির সাক্ষ্য মিলে না।

'বীরবল' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর বিচারদক্ষতা ও রসিকতা কী ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে আলোচনা কর।

প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে ফরাসি সাহিত্যের ভঙ্গির পরিচয় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ফরাসি গদ্য সাহিত্য তাহার উৎকর্ষের জন্য প্রখ্যাত। তাহাতে একদিকে যেমন

লেখকের সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণের সন্ধান মিলে, অন্য দিকে তেমনই তাহার মধ্যে রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় গদ্য রচনায় বিষয়ের উৎকর্ষ দেখা যায় কিন্তু সেগুলি পাঠকদের চিন্তার খোরাক জোগাইলেও তাহাদের মনোহরণ করে না। ফরাসি গদ্য সাহিত্য একই সঙ্গে সার ও রস জোগায়। প্রমথ চৌধুরীর রচনার মধ্যে ফরাসী সাহিত্যের এই গুণটি সঞ্চারিত হইয়াছে।

'বীরবল' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী একজন যথার্থ ঐতিহাসিকের মতোই তথ্যসম্ভার ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বীরবলকে তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর রসিক বলিয়া জানিতেন। অথচ যৌবনে তিনি তাঁহার কয়েকজন মুসলমান বন্ধুর কাছে বীরবলকে উপহাসাস্পদ করিয়াছেন এমন একজন অশ্রুতপূর্বনামা মুসলমান রসিকের নাম শুনিলেন। পরে ভিনসেণ্ট্ স্মিথের Akbar the Great Mogul গ্রন্থে বীরবলের অগৌরবময় জীবনী এবং তারিখ-ই-বাদাউনিতে বীরবলের প্রতি কটূক্তির পরিচয় পাইলেন। কিন্তু বীরবল সম্পর্কে হিন্দু লেখকদের রচনার প্রশস্তি দেখিয়া তিনি বীরবলের অপদার্থতার অভিযোগকে অমূলক বলিয়া মনে করিয়া বিভিন্ন তথ্য অবলম্বন করিয়া সত্যনির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রমথ চৌধুরী যেভাবে স্মিথ্ ও বাদাউনির রচনা পরস্পর তুলনা করিয়া স্মিথের উক্তির অনেকাংশকেই ভিত্তিহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহার বিচারশক্তি ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় দেয়। এই বিচার প্রসঙ্গে তিনি যে সব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির সঞ্চয়নে তাঁহার মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাদাউনি উঠিতে বসিতে বীরবলকে কটূক্তি করিলেও তিনি যে মিথ্যা কথা বলেন নাই প্রমথ চৌধুরী তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বীরবলের বিরুদ্ধে বাদাউনির বিদ্বেষের যে কারণ তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। এই প্রসঙ্গে আকবরের ধর্মমত সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার ইতিহাসবোধের পরিচয় দেয়।

বাদাউনি বীরবলের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু 'তিনি ইতিহাসের দরবারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন নি।' প্রমথ চৌধুরী বীরবলের মহাভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু বীরবলের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া আপনার ভক্তিবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করেন নাই। তিনি ধীরভাবে বিচার করিয়া বীরবলের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণগুলি আলোচনা করিয়াছেন এবং সেগুলির মধ্যে যেগুলি ভিত্তিহীন সেগুলি কেন যে ভিত্তিহীন তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অথচ সিদ্ধান্তে পৌঁছাইবার জন্য বিপুল সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করিতে হয় নাই। সামান্য কিছু তথ্য লইয়াই তিনি একান্ত দক্ষতার সহিত তাঁহার বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার রচনাটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধের মতো গুরুভার নয় তাহার অন্যতম কারণ এই যে, তিনি তথ্যবস্তুর মাঝে মাঝে রসবস্তু পরিবেশন করিয়াছেন। প্রবন্ধটির মধ্যে বক্তব্য বিষয়ের গাম্ভীর্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু তাহারই মধ্যে প্রমথ চৌধুরী ইতস্ততঃ রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। সরস উক্তি তাঁহার রচনার মধ্যে ছড়াইয়া আছে।

প্রবন্ধের প্রথমেই শীতের সন্ধ্যায় ঘরের ভিতর প্রকাণ্ড আগুঠি জ্বালাইয়া তাহার চারপাশে বসিয়া বীরবলের গল্প শোনার কল্পনাটি আমাদের আকৃষ্ট করে। সাবেকি গল্পের সুরে 'আকবর বীরবলনে পুছা'—এই ধারাটির উল্লেখ এই গল্পশোনার পরিবেশটির পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে।—ইতিহাস হইতে আকবরের পরিচয় বলিতে তিনি যে জাহাঙ্গীরের বাবা ও হুমায়ুনের ছেলে এইটুকু মাত্র জানার উল্লেখ ব্যঙ্গমূলক। এই অংশের অপর ব্যঙ্গোক্তি— 'মুখের চাইতে হাত যে বড় হাতিয়ার, বুদ্ধিবলের চাইতে বাহুবল যে শ্রেষ্ঠ, সেকথা আমি তখন বুঝতুম না, কারণ সে বয়সে আমি সভ্য হইনি, ছিলুম শুধু আদিম মানব' বা 'দুর্বলের উপর বলপ্রয়োগের নামই যে বীরত্ব একথা বুঝলুম ঢের পরে, যখন কার্লাইলের Hero-Worship পড়লাম।'

মৌলবী দো-পিঁয়াজা নাম লইয়াও তিনি কৌতুক করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'তাঁর নামেই প্রমাণ যে উক্ত নামধারী কোনো মৌলবী আকবর শাহের সভাসদ হতে পারত না।' মৌলবীসাহেবের নামের সঙ্গে পিঁয়াজের যোগও তাঁহার কৌতুকবাণে বিদ্ধ হইয়াছে।

ভিনসেন্ট্ স্মিথের দুই একটি মতকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি কিছু কিছু কৌতুকোক্তি করিয়াছেন। বীরবলের ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদের নিকটে আস্তাবল থাকায় স্মিথ্ তাঁহাকে আস্তাবলের জমাদার বলিয়া অনুমান করায় প্রমথ চৌধুরী আলিপুর পশুশালার পাশে লাটভবন থাকায় লাটসাহেবকে পশুশালার অধ্যক্ষ সাব্যস্ত করার কথা বলিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের গৃহের অল্প দূরেও যে আস্তাবল আছে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।—বাদাউনি বীরবলের মৃত্যুর পর কুকুরদের সঙ্গে বাস করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন বলিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর উক্তি, 'এ ঘটনা যে ঘটেনি তা বলা অসম্ভব, কারণ নরকে যে Birbal's House ঠিক কোন জায়গায়, তা বাদাউনিও নিজচক্ষে দেখেননি, স্মিথ্ সাহেবও দেখেননি।'

পরিসমাপ্তিতে তাঁর একটি উক্তি কৌতুকবহ। তিনি বলিয়াছেন, 'রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি। কারণ নিত্য দেখতে পাই যে, অনেকে আমার সত্যকথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকতাকে সত্যকথা বলে ভুল করেন।'

ব্যাখ্যা

(১) মুখের চাইতে হাত যে বড় হাতিয়ার, বুদ্ধিবলের চাইতে বাহুবল যে শ্রেষ্ঠ, সে কথা আমি তখন বুঝতুম না; কারণ সে বয়সে আমি সভ্য হইনি, ছিলুম শুধু আদিম মানব।

প্রমথ চৌধুরী বাল্যকালে বীরবলের গল্প শুনিয়া তাঁহার মহাভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বীরবলের সরস উক্তি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মানুষের

বাক্‌কে দৈহিক শক্তি অপেক্ষা উচ্চে স্থান দেওয়া হয়। সুতরাং তিনি দৈহিক শক্তিমান কোনো পুরুষ অপেক্ষা বাক্যবীর বীরবলকে উচ্চে স্থান দিয়াছিলেন।

কিন্তু সুচিন্তিত বা সরস উক্তি যে সব সময় বিজয়ী হয় না এই অভিজ্ঞতা তিনি পরবর্তীকালে লাভ করিয়াছিলেন। বাহু শক্তির প্রমত্ততায় অন্তরের শক্তি অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয়। বাহু শক্তির মধ্যে যে একটা স্থূলতা আছে তাহাতে বাক্যের সূক্ষ্ম বেগ চাপা পড়িয়া যায়।

প্রমথ চৌধুরী এখানে ঈষৎ রসিকতার সুরে বলিয়াছেন যে, বাল্যে তিনি বুদ্ধিকেই বড়ো মনে করিতেন, কারণ তিনি তখন আদিম মানব ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে আদিম মানব কেবল বাহুবলের উপরই নির্ভর করিত। পরবর্তীকালে যতই তাহার উন্নতি হইয়াছে ততই তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছে—বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষকেই তাহার উৎকর্ষের মান বলা অসংগত হইবে না।—সুতরাং বর্তমানে অনেক জায়গায় বাহুবলের দাপটে বুদ্ধি যে চাপা পড়িয়া যায়, ইহা তাহার অসভ্যতারই নিদর্শন।

(২) ইংরেজি শিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তান অকাতরে পলাণ্ডু ভক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু নিজেকে পলাণ্ডু বলে ভদ্র সমাজে পরিচিত করতে পারে না। জাতি জিনিসটে এমনি বালাই।

প্রমথ চৌধুরী বাল্যে পিতার নিকট যে সব গল্প শুনিয়াছিলেন তাহাতে বীরবলের রসিকতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেই সব গল্প শুনিয়া তিনি বীরবলের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে, পূর্ণ যৌবনে তাঁহার কয়েকজন মুসলমান বন্ধুর কাছে তিনি এমন কতকগুলি গল্প শোনেন যেগুলিতে বীরবলের চেয়ে বড়ো একজন রসিক যে আকবর শাহের সভায় ছিলেন এবং তিনি যে কথায় কথায় বীরবলকে উপহাসাস্পদ করিতেন ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরী যখন দেশবাসীকে রসিকতার আবরণে কিছু সত্য কথা শোনাইতে চাহেন, তখন তিনি বীরবলের নামটি ছদ্মনাম হিসাবে গ্রহণ করেন। কোনো কোনো গল্পে দো-পিঁয়াজাকে বীরবলের চেয়ে বড়ো রসিক

বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা হইলেও এই শ্রুতিকটু নামটিকে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বর্তমানে অনেক ইংরেজিশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান পূর্বযুগের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পিঁয়াজ খায় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ছদ্মনামে পিঁয়াজ শব্দটি যোজনা করিবার মতো প্রবৃত্তি কাহারও নাই। প্রমথ চৌধুরী রসিকতা করিয়া জাতি-ই ইহার কারণ বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রুচিই এই অপ্রবৃত্তির কারণ।

(৩) বৈষয়িক লোকমাত্রেই দার্শনিক হতে গেলেই র‍্যাশনালিস্ট হয়।

আকবর কেবল একজন প্রতাপান্বিত সম্রাটই ছিলেন না, ধর্মের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি প্রথম জীবনে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হইয়াছিল। তিনি বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া ধর্মকে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক লেখকদের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি প্রাত্যহিক উপাসনা, উপবাস, দৈব আদেশ প্রভৃতিকে নিরর্থক বলিয়া মনে করিতেন, কারণ এগুলিকে বুদ্ধি বা বিচার দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। মুসলমান ধর্মের অনেক গোঁড়ামি তুলিয়া দেওয়ার নির্দেশও উল্লেখযোগ্য। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধের ভাবটি তুলিয়া দিয়া উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী আকবরের এই বিচারপ্রবণতার মূলে তাঁহার বৈষয়িকতা ছিল বলিয়া মনে করেন। যে ব্যক্তি প্রকৃত বৈষয়িক, সে অন্ধ আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয় না—সবদিক ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়াই সে কোনো কাজ করিতে অগ্রসর হয়। আকবরের বৈষয়িক দৃষ্টি অর্থাৎ বাস্তববোধ প্রখর ছিল বলিয়া তিনি একদিকে যেমন সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন অপর দিকে তেমনই ধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে বিচারসহ করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

তাঁহার বৈষয়িক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁহাকে ধর্মের মধ্যে যে সব অবাস্তব ও অর্থহীন ব্যাপার ছিল সেইগুলিকে উপেক্ষা করিতে প্রণোদিত করিয়াছে।

(৪) যার মৃত্যুতে দরিদ্রসমাজে শোকশঙ্খ নিনাদিত হয় তার জীবনও ধন্য আর তার মৃত্যুও glorious death.

প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট্ স্মিথ্ বীরবলকে অপদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বীরবল আকবরের সভায় ভাঁড় ও অশ্বরক্ষক, এবং কাবুলের যুদ্ধে গমন করিয়া তিনি প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে গিয়া নিহত হন—তাঁহার সেই মৃত্যু inglorions death.

প্রমথ চৌধুরী স্মিথের সিদ্ধান্ত যে অমূলক তাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। বীরবল যে মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাহা তাঁহার সমসাময়িক অন্য একজন কবির রচনা হইতে বোঝা যায়। প্রখ্যাত হিন্দী কবি কেশবদাস বীরবলের মৃত্যু উপলক্ষে যে কবিতা লেখেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে; বীরবলের মৃত্যুতে কোথাও কোথাও মিথ্যার জয়ঢাক বাজিলেও দরিদ্রসমাজে শোকশঙ্খ নিনাদিত হইয়াছিল। রাজদরবারে বীরবলের শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁহারা বীরবলের মৃত্যুর পর তাঁহার নিন্দা মুক্তকণ্ঠেই করিয়াছিলেন। কিন্তু বীরবল নানাভাবে দরিদ্র জনগণের বন্ধুরূপে তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে তাহারা যথার্থই শোকগ্রস্ত হইয়াছিল।

যুদ্ধে জয় বা পরাজয় বা মৃত্যু একটা বড় কথা নয়। সেখানে মৃত্যু মহৎ বা অগৌরবের একথা বলা সংগত নয়। বাস্তবিকপক্ষে জীবৎকালে বীরবল যে অগণিত দরিদ্রের বন্ধুরূপে তাহাদের প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার মহত্ত্বের অন্যতম প্রমাণ। যাঁহার মৃত্যুতে সাধারণ মানুষও শোকক্ষুব্ধ হয়, তাঁহার মৃত্যু কখনও অগৌরবের হইতে পারে না—তাঁহার মৃত্যু মহত্তের মৃত্যু।

বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি

(১) প্রমথ চৌধুরী বস্তুতন্ত্রতার যে লক্ষণগুলি নির্ণয় করিয়াছেন সেগুলির পরিচয় দাও।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' নামক একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধটি অবলম্বন করিয়া প্রমথ চৌধুরী বস্তুতন্ত্রতার স্বরূপ যে কী তাহা আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রাধাকমল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বস্তুতন্ত্রতা নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্র কাব্যে বস্তুতন্ত্রতা আছে কি না সে বিষয়ে কোনোরূপ আলোচনা না করিয়া রাধাকমলের প্রবন্ধ হইতে বস্তুতন্ত্রতা যে কী বস্তু তাহাই নির্ণয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

রাধাকমল তাঁহার প্রবন্ধে বাস্তবতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিত্য বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা কালের অধীন নয়, তাহাই নিত্য বস্তু এবং পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নাই যাহা কোনো কালে সংজ্ঞান্তর প্রাপ্ত হয় না। প্রাচীন শাস্ত্রের এই মত উদ্ধৃত করিয়া প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে নিত্য বস্তুর কল্পনা অসম্ভব বলিতে চাহিয়াছেন।

বস্তুতন্ত্র শব্দটি বাংলা সাহিত্যে পূর্বে ছিল না। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে এই শব্দটি নাই, তবে অলংকার শাস্ত্রে এই শব্দটির পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্য ও দর্শনের মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য থাকায় কাব্যের ক্ষেত্রে দার্শনিক পরিভাষা প্রয়োগ করা নিরাপদ নয়। তবে শঙ্করাচার্য বস্তুতন্ত্রতা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা কাব্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে, জ্ঞান বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়াই জ্ঞানের উদ্ভব।

সুতরাং সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা বলিতে গেলে যদি প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান বোঝায়, তাহা হইলে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, যদিও দর্শনে বস্তুতন্ত্রতা অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইতে পারে, কাব্যের ক্ষেত্রে তাহা অপরিহার্য।

বস্তুর স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে কাব্যসৃষ্টি সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বাংলার মাটি ও বাংলার জলের মূর্তি রহিয়াছে, সুতরাং তাহাকে বস্তুতন্ত্র-হীন বলা চলিবে না।—শঙ্করের বস্তুতন্ত্রতাকে অনিত্যবস্তুতন্ত্রতার আখ্যা দেওয়া যায়। শঙ্করের অনিত্যবস্তুতন্ত্রতা এবং রাধাকমলের নিত্যবস্তুতন্ত্রতার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

বাস্তবিক পক্ষে বস্তুতন্ত্রতা শব্দটি সংস্কৃত হইলেও পদার্থটি বিলাতি। এই জন্যই রাধাকমলবাবু তাঁহার প্রবন্ধে তাঁহার মতের স্বপক্ষে একাধিক ইউরোপীয় লেখকদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের রিয়ালিজমই বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং বস্তুতন্ত্রতার বিচার করিতে গেলে ইউরোপীয় সাহিত্যের রিয়ালিজমের পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ইউরোপে রিয়ালিজম শব্দটি প্রথমে দর্শনের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। আইডিয়ালিজমের বিরুদ্ধেই রিয়ালিজমকে খাড়া করা হয়ে থাকে। আইডিয়ালিজমে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা আর রিয়ালিজমে জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা—অবশ্য এই দুই মতের ভিতরে অনেক শাখাপ্রশাখা বর্তমান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সহায়তা লাভ করে রিয়ালিজম সাহিত্যে সব রকম আইডিয়ালিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

রাধাকমলবাবু বস্তুতন্ত্রতার পক্ষে বার্ণার্ড শ-র মতবাদের কথা বলিয়াছেন। বার্ণার্ড শ প্রমুখ লেখক রিয়ালিজম বলিতে আইডিয়ালিজমের বিরুদ্ধে আক্রমণ বুঝিয়াছেন। এই ধরণের বস্তুতন্ত্রতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নাই। কিন্তু রাধাকমলবাবু নিশ্চয়ই এই ধরণের বস্তুতন্ত্রতার চর্চা চাহেন না, কারণ তিনি চাহেন যে সাহিত্য জনসাধারণের চিত্তে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবে।

ইউরোপীয় সাহিত্যে রিয়ালিজম শব্দটির অর্থ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। রোমান্টিক সাহিত্যের উল্টা দিকে রিয়ালিস্টিক সাহিত্য। ভিক্টর হুগো প্রমুখ সাহিত্যকারের রচনার প্রতিবাদকল্পেই ফ্লবেয়ার প্রমুখ লেখকরা বস্তু-তান্ত্রিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন।

রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাহা মনগড়া সাহিত্যের উপাদান—তাহার পাত্রপাত্রী রক্তমাংসে গড়া নয়। এ অভিযোগ যে অনেকটা সত্য ফরাসী সাহিত্য তার পরিচয় দেয়। তার বিরুদ্ধে রিয়ালিস্ট সাহিত্যিকরা সত্যকে রূপায়িত করিতে গিয়া অসুন্দরকে প্রশ্রয় দিতেছেন। এ ধরণের রিয়ালিজম কাম্য নয়, রাধাকমলবাবুও ইহা চাহেন না কারণ তিনি আদর্শ কাব্য হিসাবে রামায়ণের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

সাহিত্য-সৃষ্টির মূল সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর ধারণা ব্যক্ত কর।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বস্তুতন্ত্রতা নাই—এই কথা প্রতিপাদন করিতে গিয়া রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ রচনা করেন তাহার সমালোচনা করিতে গিয়া প্রমথ চৌধুরী 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধটি লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি বস্তুতন্ত্রতা যে ইউরোপীয় সাহিত্যের রিয়ালিজম ইহা প্রতিপন্ন করিবার পর সাহিত্য-সৃষ্টির মূল কী সে সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া রাধাকমলবাবু বলিয়াছেন, 'মৃণাল না থাকিলে, লতিকা না থাকিলে পদ্ম যে টলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য কি করিয়া ফুটিয়া উঠিবে।'—মোটকথা বাস্তবকেই তিনি সকল সাহিত্যের মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাস্তবকে বাদ দিয়া সাহিত্যসৃষ্টি যে অসম্ভব তাহাই একরূপ প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রমথ চৌধুরী বলিতেছেন যে, ফুল থাকিলেই মাটিতে তাহার একটা মূল অবশ্যই থাকিবে। কবিতার ফুল ফুটিলেই কবির মনোজগতে কোথাও না কোথাও তাহার মূল থাকে। কিন্তু সে মূল ব্যক্তিবিশেষের মনে নিহিত নয়, সামাজিক মনে নিহিত, ইহাই নূতন মত। এই মতটি গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় এই যে সামাজিক মন বলিয়া কোনো বস্তু নাই—ইহা সেই পদার্থ ইংরেজিতে যাহাকে বলে অ্যাব্‌স্ট্রাকশান।

রাধাকমলবাবু এ দেশের মাটিতে বিলাতি ফুল ফোটা সম্পর্কে আপত্তি

তুলিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী বলিতেছেন যে, স্বদেশের ক্ষেত্রে পারস্যের ফুল গোলাপের চাষ হওয়ায় গোলাপ এ দেশে বিশেষ গৌরবের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত। বহির্জগতে যদি নানারকম ফুল ফোটে তাহা হইলে মনোজগতের যে কোনো ক্ষেত্রে অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় ফুল ফুটিবার কথা। কারণ মনোজগতে অন্য দেশ বলিয়া কোনো ব্যবধান নাই, ভাবের বীজ সকল দেশেই অনুকূল মনের ভিতর দিয়া বিকশিত হয়।—রাধাকমলবাবু বলিয়াছেন 'জাতীয় মনের ক্ষেত্র হইতেই কবির মনে রস সঞ্চয় করে।'—তাহা হইলে কাব্য যদি নীরস হয় তাহা হইলে কবির মনের পরিবর্তে সামাজিক মনই, জাতীয় মনই দায়ী।

অবশ্য রাধাকমল বাবুর মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। কবির মনের সহিত জাতীয় মনের যোগাযোগ থাকিলেও কবিপ্রতিভা সামাজিক মনের সম্পূর্ণ অধীন নয়। রাধাকমলবাবু উদ্ভিদ-জগৎ হইতে যে উপমাটি দিয়াছেন, ইউরোপে ঘোর মেটিরিয়ালিজমের যুগে তাহা জড়জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে যোগসাধনের সেতুস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। মাটি, আলো, বাতাস প্রভৃতির যোগাযোগের ফলে জীবের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পার্শ্বিক অবস্থার ফলে মনের সৃষ্টি হইয়াছে—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ইউরোপের একদল বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিক ধর্ম কাব্য আর্ট নীতি প্রভৃতি সকল আধ্যাত্মিক ব্যাপারেরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনাই ছিল, কাব্য প্রভৃতির বিশেষ ধর্মের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা বাহ্য-শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন, কবির আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং পারিপার্শ্বিক সমাজের বাহ্য-শক্তিকেই তাঁহারা কাব্য সৃষ্টির মূল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কবিতার জন্ম ও কবির ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করায় সাহিত্যতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। রাধাকমলবাবু এই মেটিরিয়ালিজমের আদর্শের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে, প্রত্যেক কবির মন একটি স্বতন্ত্র রসের উৎস। কবির কাজ হইতেছে সামাজিক মনকে সরস করা। কবির মনের সঙ্গে অবশ্য সামাজিক মনের আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে। কিন্তু কবি সমাজের নিকট হইতে যাহা পান তাহাকে রসান্বিত করিয়া প্রত্যর্পণ করেন। এই অতিরিক্ত যে রস ইহা তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করেন?—সংগ্রহ করেন তাঁহার আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে। সে জগৎ অবাস্তব নয়—তাহা আমাদের সত্তার স্থূলে ও মূলে সমভাবে বিদ্যমান। কারণ আত্মা

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনো যদ্ বাচো হ বাচম্।
স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, আমরা বদ্ধমুক্ত জীব। আমাদের মনের যে অংশ যে পরিমাণে বহির্জগতের অধীন, সেই অংশ সেই পরিমাণে বদ্ধ; আর যে অংশ যে পরিমাণে স্বাধীন, সেই অংশ সেই পরিমাণে মুক্ত। যখন আমরা বহির্জগতের কোনো বিষয় দেখি মাত্র, তখন আমরা বদ্ধ জীব; আর আমরা যখন সত্য-শিব-সুন্দরকে সৃষ্টি করি তখন আমরা মুক্ত জীব। যাঁহার স্বাধীনতা নাই তাঁহার সৃষ্টিক্ষমতা থাকিতে পারে না। ধর্মপ্রবর্তক, কবি, শিল্পী প্রভৃতি সমাজের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন বলিয়া সমাজের শিক্ষক। যথার্থ কবি সমাজের ফরমায়েশ খাটিতে পারেন না—তাঁহাকে আত্মম্ভরি বলিয়া নিন্দাবাদ করিলেও তিনি আত্মমনকে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন।

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র কতখানি আবশ্যক প্রমথ চৌধুরীর মতানুযায়ী তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

সাহিত্যে যাঁহারা বস্তুতন্ত্রবাদী, তাঁহারা সাহিত্যসৃষ্টির মূলে শুধুমাত্র দেশকালের উপাদান এবং সাহিত্যিকের পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে স্বীকার করেন। কিন্তু কবির মন বলিয়া যে পদার্থ আছে তাহা কেবলমাত্র

পারি যে, কালিদাসের সময়েও মানুষ ছিল এবং সে সময়েও আষাঢ়ের প্রথম দিন এমনই আসিত। কিন্তু বররুচি যাহাদের প্রতি অশিষ্ট উক্তি করিয়াছেন, তাঁহারা এইটুকু পাইয়া সন্তুষ্ট হইবেন না। সুতরাং অকারণ আনন্দ রসিকদের জন্যই তোলা থাক।

রবীন্দ্রনাথ অপ্রয়োজনের আনন্দকে কাব্যের মূল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে যে আনন্দ আমরা পাই তাহা প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় নাই, তাহা একটা অকারণ আনন্দের ফলে রসরূপে প্রকাশিত হয়। এই অকারণ প্রকাশের উপায় আছে বলিয়াই মানুষের পক্ষে শিল্পসৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে।

ব্যাখ্যা

(১) যাঁহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন, তাঁহারা তটবর্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উদ্‌বেজিত না করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

সংসারে সবাই কাব্যরসিক নয়। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন পাণ্ডিত্যই যাঁহাদের প্রধান পরিচয়। তাঁহারা বুদ্ধিমান্ বা বিবেচক বলিয়া প্রথিত—কিন্তু তাঁহারা কাব্যের মধ্য হইতে তত্ত্ব এবং কাহিনীর মধ্য হইতে ইতিহাস বা দর্শন আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। বররুচি এই ধরণের পণ্ডিতদের অরসিক বলিয়াছেন। অপর একজন প্রাচীন কবি একটি সংস্কৃত শ্লোকে ইঁহাদের প্রকারান্তরে প্রয়োজনীয়তাবোধমাত্রসম্পন্ন, সৌন্দর্যবোধহীন ও বর্বর বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই সব গবেষক পণ্ডিতদের রসিক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি আমাদের এরূপভাবে রূঢ় আঘাত করিবার পক্ষপাতী নন। তিনি জানেন যে, এই পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যায় পারঙ্গম ও শক্তিশালী এবং তাঁহারাই শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। কবিদের যদি সরস্বতীর কমলবনবাসী বলা যায়, ইঁহাদের বেত্রবনবাসী বলা যাইতে পারে—

বাস্তবিকপক্ষে গুরুমহাশয়ের হাতের বেতটিও স্মরণীয়। যাঁহারা কমলবনে বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে এই সব বেত্রবনবাসীদের বিক্ষুব্ধ না করাই ভালো। যাঁহারা কাব্যরসস্রষ্টা তাঁহাদের পক্ষে এই সব তথাকথিত কাব্যরস বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতাদের কোনোভাবে আক্রমণ না করাই সংগত।

(২) আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে যক্ষের নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার, ও-সমস্তই কালিদাসের বানানো, কাব্যরচনার ও একটা উপলক্ষ্যমাত্র।

'বাজে কথা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অকারণ প্রকাশকে সাহিত্যের মূল বলিয়া স্থাপনা করিয়াছেন। তিনি মেঘদূত কাব্যকে অকারণ অশ্রুধারা বলিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তির প্রতিবাদে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মেঘদূতের অশ্রুধারা অকারণ নয়। এখানে যে যক্ষের কথা আছে সে রামগিরিতে নির্বাসিত হইয়া বিরহের বেদনা ভোগ করিতেছিল—বিরহীর সেই বেদনা তো অকারণ নয়।

ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, মেঘদূত কাব্যে যে যক্ষের কথা বলা হইয়াছে তাহা কবির কল্পনামাত্র—বাস্তবে উহা ছিল না। কালিদাস এই যে বিরহী যক্ষের কল্পনা করিয়াছেন সে তাঁহার কাব্যরচনার উপকরণ মাত্র। বস্তুতঃ, কালিদাসের কবিচিত্তে যে অকারণ বিরহের বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহাই কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মেঘদূত কাব্যের মধ্যে যে বিরহসংগীত ধ্বনিত হইয়াছে বাস্তবে তাহার মিল বা উৎস খোঁজা চলে না তাহা কবিহৃদয়ের অকারণ অশ্রু ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনও মানুষ ছিল এবং তখনও আষাঢ়ের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

রবীন্দ্রনাথ অকারণ প্রকাশকে কাব্যের মূলকথা বলিয়াছেন। মেঘদূত

কাব্যের মূলে যে কোনো তথ্য আছে ইহা তিনি স্বীকার করিতে চাহেন নাই। কবিহৃদয়ের অকারণ বেদনাই এই কাব্যের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘ দেখিয়া সুখীর হৃদয়েও বেদনা জাগিয়া উঠে—এই কাব্যে সেই বেদনার গাথা প্রকাশিত হইয়াছে।

তবে যাঁহারা কাব্য পড়িয়া একটা সারবান্ কিছু পাইতে চাহেন তাহাদের পন্থা অনুসরণ করিতে হইলে মেঘদূত কাব্যের মধ্য হইতে একটিমাত্র তথ্য আবিষ্কার করা যায়। তাহা এই যে, কালিদাসের কালেও মানুষ ছিল এবং তখনও আষাঢ়ের প্রথম দিনের মেঘজাল তাহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। কিন্তু এ তথ্য গবেষককে তৃপ্তি দিবে না, কারণ মানব প্রকৃতির অকারণ উচ্ছলতাই ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে এবং ইহার যথার্থ আবেদন একমাত্র রসিকের কাছেই সম্ভব হইতে পারে।

মা ভৈঃ

'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু বহুস্থলেই একটা আদর্শায়িত মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এখানে তিনি মৃত্যুকে একটি প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যেখানে সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হয়। পৃথিবীতে মৃত্যু না থাকিলে ছোটো বড়ো মাঝারির প্রভেদ নির্ণয় করা যাইত না। যে সব জাতি মৃত্যুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের আর কোনো কুণ্ঠা নাই। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা যেমন দানে, যথার্থ প্রাণবানের পরীক্ষাও তেমনই প্রাণ দিবার শক্তিতে। প্রাণহীনই মরিতে কাতর হয়।

যে মরিতে পারে সেই সুখের অধিকারী। যে সুখকে আঁকড়াইয়া থাকে, সে সুখের উচ্ছিষ্টমাত্র ভোগ করিতে পারে। আর যে মৃত্যুর

আহ্বানে সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, সে-ই সুখ কি তাহা জানে। সবলে ত্যাগ করিতে পারিলেই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারা যায়। যাহারা মরিতে পারে না, উপকরণের বাহুল্যের মধ্যেও তাহাদের দৈন্য ধরা পড়ে। ত্যাগের কঠোরতার মধ্যে যে পৌরুষ আছে তাহা স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারিলে সমস্ত লজ্জা হইতে মুক্তি ঘটিতে পারে।

এই দুইটি পথ আছে—একটি ক্ষত্রিয়ের আর একটি ব্রাহ্মণের। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিলে সুখসম্পদ লাভ করা যাইবে; যাহারা সুখকে অগ্রাহ্য করেন তাঁহারা আনন্দের অধিকারী। প্রাণ দিব বলার মতোই সুখ চাই না একথা বলাও কঠিন। পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের গৌরব লাভ করিতে হইলে এই দুইটির একটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। বীর্যের সহিত চাহিতে বা 'চাই না' বলিতে হইবে। শক্তিহীনভাবে 'চাই' বলা বা উদ্যম নাই বলিয়া 'চাই না' বলার মধ্যে কোনো সার্থকতা নাই—তাহা মৃত্যুরই তুল্য।

বাঙালী বর্তমানে জগতে স্থান করিয়া লইতেছে। কিন্তু তাহাকে কখনও মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে তাহার আস্ফালন বেসুর বলিয়া মনে হয়। আমাদের পিতামহদের বিরুদ্ধে ইহাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ। তাঁহারা যদি মরিতে পারিতেন তাহা হইলে আমাদের মরিবার শক্তিতে আস্থা থাকিত। তাঁহারা যে অন্নের সংগতি রাখিয়া গেলেও মৃত্যুর সংগতি রাখিয়া যান নাই ইহা আমাদের পক্ষে পরম দুর্ভাগ্যের কথা।

ইংরেজ আমাদের দেশের যোদ্ধা জাতিদের বলে যে, তাহারা প্রাণ দিতে জানে; যাহারা প্রাণ দিতে জানে না কেবল বকিতে পারে তাহারা কংগ্রেস করিয়াছে—তাহাদের দলে তাহারা কেন যাইবে—তর্ক করিয়া ইহার উত্তর দেওয়া গেলেও লজ্জা ঘোচে না। যাহারা মরিতে পারে না তাহারা শান্তির সময়েও পরস্পরের সহিত মিশিয়া থাকিতে পারে না। ইহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা না গেলেও সত্য।

অথচ যখন দেখি যে, আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিয়াছেন তখন আমাদের আশা হয় যে, মরাটা কঠিন হইবে না। তাঁহাদের সকলেই স্বেচ্ছায় না মরিলেও অনেকেই যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বিদেশীরা তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। কোনো দেশেই সকলে স্বেচ্ছায় ও নির্ভয়ে মরে না। স্বল্প একদল মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করে—অপর দলগুলি তাহার সঙ্গী হয়।

মন হইতে ভয় যাইতে চায় না। মন হইতে ভয় দূর করিবার শিক্ষাই ছেলেদের প্রথমে দেওয়া উচিত—ভয়কে যেন তাহারা অস্বীকার করিতে পারে; সাহসের মিথ্যা গর্বও মার্জনীয়। কারণ ভয়ই মানুষের চরিত্রের সকল দৈন্য ও মূঢ়তার কারণ। ভয় নাই বলিয়া মিথ্যা অহংকার করিলেও তাহাতে ভীরু বলিয়া পরিগণিত হইবার লজ্জা যে আছে তাহা প্রমাণিত হয়। যথার্থ নির্ভীকতা না থাকিলেও লজ্জাও অনেক সময় মানুষকে শক্তি দান করে—লোকলজ্জায় প্রাণবিসর্জনও করা যায়। সুতরাং আমাদের পিতামহীদের কেহ কেহ লোকলজ্জায় প্রাণবিসর্জন দিলেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহাদের প্রাণবিসর্জন দিবার শক্তি ছিল—তাহার কারণ লজ্জা, প্রেম বা ধর্মোৎসাহ যাহাই হোক না কেন। বস্তুতঃ, রণক্ষেত্রে মরা সহজ; কিন্তু একাকিনী চিতাগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দেওয়ার বীরত্ব বহু গুণে কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনকারিণী পিতামহীদের প্রণাম নিবেদন করিয়া তাঁহাদের সন্তানদের মৃত্যু ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাঁহাদের আত্মবিস্মৃত বীরত্ব বীরপুরুষদেরও লজ্জা দিয়াছে। তাঁহারা মাধুর্যমণ্ডিত দাম্পত্যলীলার অবসানে বধূবেশে পতির চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত্যুকে সুন্দর, শুভ ও পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহাদের আত্মদানের স্পর্শে পবিত্র অগ্নি আমাদের মৃত্যুভয় দূর করিয়া অভয় ঘোষণা করুক—ইহাই তাঁহার একান্ত কামনা।

ব্যাখ্যা

(১) যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে।

'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে ধ্বংসের পরিবর্তে শক্তির পরিচায়ক রূপে দেখিয়াছেন। মৃত্যু সকলের জীবনেই আসে, কিন্তু মৃত্যুকে মানুষ যে-ভাবে গ্রহণ করে তাহার মধ্যেই তাহার পৌরুষ বা মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না—মৃত্যুভয় যাহার কাছে তুচ্ছ, সেই যথার্থ প্রাণবান্। মনুষ্যত্বের শক্তি তাহার মধ্যে প্রকট। আর যে মরিতে ভয় পায়, সে প্রাণ দিতে সাহস পায় না। তাহার মধ্যে জীবনের ঔজ্জ্বল্য নাই, সে বাঁচিয়া থাকিয়াও মৃত, জগতের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে না, তুচ্ছ সুখের মোহে আবদ্ধ না হইয়া আপনার প্রাণশক্তিকে অসংখ্য বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়াও প্রকাশ করিতে পারে, সে-ই জীবনের জয়গৌরব লাভ করিতে পারে। যে আপনার আরাম ও তুচ্ছ সুখের মোহ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ বরণ করিতে পারে, তাহার শক্তি বিকশিত হইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখগুলি আহরণ করিতে পারে। যাহার মধ্যে ত্যাগ করিবার মতো প্রবল বীর্য আছে, সে-ই যথার্থভাবে ভোগ করিতে থাকে। জীবনকে প্রবলভাবে ভোগ করিবার জন্য যে প্রাণশক্তির প্রয়োজন, সবলে ত্যাগেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

(২) বিশ্বকর্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেই জন্য পৃথিবীতে অলৌকিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাই।

'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে জীবনের শক্তির পরীক্ষা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে সমস্ত জাতি মৃত্যুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, যাহারা বীরের মতো মৃত্যুকে বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, তাহারাই পৃথিবীতে জয়ী হইয়াছে। আর যে সমস্ত জাতি মৃত্যুর জয়টিকা লাভ করে নাই,

তাহারা জীবনকে সবলভাবে অধিকার করিতে পারে নাই। এমন কি তাহাদের প্রাণশক্তি কম হইলেও তাহারা যে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে বাস করে তাহা নয়। তর্কশাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে সেই সব জাতির পক্ষে নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখা যায় যে, তাহারা শান্তির সময়েও পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না—তুচ্ছ বিষয় লইয়া অশান্তি তাহাদের মধ্যে লাগিয়াই থাকে।

রবীন্দ্রনাথ এখানে মৃদু কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন যে, বিশ্বকর্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না—তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যুক্তিবিদ্যায় পারঙ্গম হইয়া তাহার পর বিশ্বসৃষ্টিতে অগ্রসর হন নাই, এই জন্যই পদে পদে এমন অনেক ব্যাপার দেখা যায়, যুক্তি দ্বারা যেগুলির ব্যাখ্যা করা যায় না। লেখকের সরস কৌতুকটি লক্ষণীয়।

(৩) দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনি চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মতো বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল।

বাঙালীর অন্যতম লজ্জা এই যে, তাহার পূর্বপুরুষেরা বীর্যের পরিচয় দিয়া মৃত্যুবরণ করিয়া তাহার জন্য মৃত্যুর উত্তরাধিকার রাখিয়া যান নাই। মৃত্যুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ঐতিহ্য নাই বলিয়া বাঙালী সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু আমাদের পিতামহীরা যে সমান গরিমার সঙ্গে জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। তাঁহারা যে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতেন তাহাতে তাঁহাদের যে শক্তি ব্যক্ত হইত তাহা সামান্য নয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও এমন বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকিলেও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে সেখানে এভাবে আগাইয়া যাওয়া হয় না। তাহা ছাড়া দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করা হয় বলিয়া দলগত প্রেরণায় মৃত্যুবরণ করা কঠিন হয় না। কিন্তু পিতামহীরা স্বামীর চিতায় যেভাবে আরোহণ করিতেন তাহাতে তাঁহাদের যে বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত, রণক্ষেত্রে তাহা ছিল না। একাকী মৃত্যুবরণ দল বাঁধিয়া মরার চেয়ে অনেক কঠিন।

পরনিন্দা

'পরনিন্দা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিন্দার ধর্ম ও প্রয়োজন সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দাও।

সমুদ্রের লোনা জল যেমন পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে, পরনিন্দাও তেমনই জগৎ-সংসার জুড়িয়া আবহমান কাল হইতে বিরাজ করিতেছে। লবণজল না থাকিলে পৃথিবী যেমন পচিয়া যাইতে পারিত, নিন্দার অভাবে সমাজে তেমনই একটা বড়ো রকমের অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা বর্তমান। নিন্দার ভয়ে সমাজ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া রহিয়াছে।

নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের কোনো গৌরব থাকিত না। কোনো কাজের মধ্যে কেহ যদি গূঢ় মন্দ অভিপ্রায় দেখিতে না পাইল, তাহা হইলে সাধুতা যেন নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে। মহত্ত্বকে প্রতি পদে নিন্দা সহ্য করিতে হয়। ইহাতে হার মানিলে চলে না। কেবলমাত্র দোষীকে সংশোধন করা নিন্দার কাজ নয়, মহত্ত্বকে গৌরব দান করা তাহার একটা বড়ো কাজ।

অল্পলোকেই নিন্দাবিরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন। হৃদয়বান্ ব্যক্তিরই বেদনাবোধ অধিকতর। অথচ পৃথিবীতে হৃদয়বান্ পুরুষেরাই বড়ো কাজে হাত দেন এবং তাঁহাদের দেখিলেই লোকের নিন্দা প্রখর হইয়া উঠে। যেখানে অধিকার বেশী, সেখানে দুঃখ ও পরীক্ষাই বেশী। গুণী ব্যক্তির ভাগ্যেই নিন্দা, দুঃখ প্রভৃতি বেশী করিয়া জুটে। অযোগ্য ব্যক্তির উপর নিন্দাবর্ষণ করিয়া কোনো লাভ নাই।

সরলহৃদয় ব্যক্তিরা বলিতে পারেন যে, পৃথিবীতে নিন্দার উপকার থাকিলেও নিন্দা শুদ্ধমাত্র দোষীর দোষ না ধরিয়া যে দোষ করে না তাহার প্রতিও বর্ষিত হয়; এই মিথ্যা সংগত নয়। কিন্তু তাহা হইলে নিন্দা টেঁকে না। দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা নিন্দা নয়, তাহা বিচার। বিচারের গুরুভার লইবার শক্তি বা সময় খুব কম ব্যক্তিরই আছে। তাহা ছাড়া নিন্দুককে সহ্য করা যাইতে পারে কিন্তু বিচারককে সহ্য করা যায় না।

বাস্তবিকপক্ষে আমরা সামান্য কারণেই নিন্দা করিয়া থাকি—নিন্দার এই লঘুভার না থাকিলে সমাজ নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইত। নিন্দা এত লঘু যে নিন্দিত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহা উড়াইয়া দিতে পারেন। নিন্দা বিচারকের রায় হইলে গুরুতর হইত। সংসারের প্রয়োজনে নিন্দার যতটুকু গুরুত্ব প্রয়োজন তাহা আছে, যতটুকু লঘুতা থাকা দরকার তাহারও অভাব নাই।

সহৃদয় ব্যক্তি এমন কথাও বলিতে পারেন যে, নিন্দা যদি করিতে হয় তাহাতে সুখ অনুভব না করিয়া দুঃখের সহিতই তাহা করা যাইতে পারে। কিন্তু নিন্দিত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিন্দুকও যদি বেদনা অনুভব করে তাহা হইলে সংসারে দুঃখের আর সীমা থাকে না। তাহা ছাড়া মানুষ সুখ না পাইয়া নিন্দা করিতে চায় না। বিধাতা মানুষকে ক্ষুধানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে রুচি-পরিতৃপ্তির সুখও অর্পণ করিয়াছেন।

আবিষ্কারের মধ্যেই একটা সুখের অংশ আছে। মৃগ যেখানে সেখানে পাওয়া গেলে তাহাকে শিকার করার মধ্যে সুখ থাকিত না। মৃগ গহন-বনচারী ও পলায়নপটু বলিয়া তাহাকে শিকার করিতে হয়—নতুবা তাহার প্রতি আমাদের অন্য কোনো আক্রোশ নাই।

মানুষের চরিত্র বিশেষ করিয়া তাহার দোষগুলি গহনচারী এবং পলায়ন-তৎপর—এইজন্য নিন্দার সুখ এত বেশী। নিন্দুক অপরের দোষগুলি জানে বলিয়া গর্ব করে। সে গুপ্ত অংশটিকে টানিয়া বাহির করে। বস্তুতঃ, যাহা লুকাইয়া থাকে বা পলাইয়া যায় তাহাকে বাহির করা বা বাঁধাতে মানুষের সুখ—তাহার জন্য সে অনেক কিছুই করিতে পারে।

মানুষ দুর্বলতাকে অনেক সময় বড়ো করিয়া দেখে। যাহা সুলভ তাহাকে আবরণমাত্র জ্ঞান করিয়া যাহা গুপ্ত তাহাকে সত্য জ্ঞান করা মানুষের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই গোপনতার পরিচয় পাইলে মানুষ সেটিকেই সত্য পরিচয় বলিয়া মনে করে; উপরের সত্যটাই যে বেশী সত্য হইতে পারে এবং ভিতরে যাহার আভাসমাত্র পাওয়া যাইতেছে তাহা মিথ্যা হইতে পারে-

এই কথাটি বিশ্বাস করানো শক্ত। এই মোহ আছে বলিয়াই পাঠক কাব্যের সরল সৌন্দর্যের চেয়ে গভীরতত্ত্বকেই সত্য বলিয়া মনে করে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রকাশিত সাধুতার চেয়ে অপ্রকট পাপকেই বেশী বাস্তব বলিয়া মনে করেন। এইজন্যই মানুষের নিন্দা শুনিলেই তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর বহু লোকের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ অসম্ভব হইলেও ইহার জন্য ব্যগ্রতা মানুষের বিশিষ্ট ধর্ম। যাহা বাহ্যত সুন্দর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঠকিবার ভয় মানুষের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে। অবশ্য সেই ঠকাই পৃথিবীতে চরম ঠকা নয় বা সেই না-ঠকার লাভকে চরম লাভ বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই।

কিন্তু মনুষ্যচরিত্র এভাবে গঠিত যে, মানুষ নিন্দা করিয়া সুখ পায় এবং এই সুখ বিদ্বেষের সুখ নয়। বিদ্বেষ সুখকর নয় এবং তাহা সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হইলে সমাজের পক্ষে তাহা পরিপাক করা কঠিন হইয়া উঠে। অনেক ভালো লোক এবং নিরীহ লোকও নিন্দা করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদের ভালো-ত্ব বা নিরীহ-ত্ব খর্ব হয় না, কারণ নিন্দার মূল প্রস্রবণটা মন্দ ভাব নয়। কিন্তু সংসারে বিদ্বেষমূলক নিন্দা যে নাই এ কথা বলা যায় না। কিন্তু সেরূপ নিন্দা যাহারা করে তাহারা কৃপার পাত্র।

ব্যাখ্যা

(১) বিধাতা যেখানে অধিকার বেশি দিয়াছেন সেইখানেই দুঃখ ও পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করিয়াছেন।

যাঁহারা হৃদয়বান্ তাঁহারা আপনাদের জীবন কোনো সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। তাঁহারা তাঁহাদের জীবনকে জগতের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দেন। পৃথিবীর দুঃখ দূর করিবার ব্রত তাঁহারা বরণ করেন। সেজন্য তাঁহাদের বহু দুঃখের ভার বহন করিতে হয়, বহু কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হয়। যাঁহারা মহৎ প্রাণ, এই পৃথিবীতে তাঁহাদের জীবন দুরূহ সাধনায় কঠিন।

তাঁহাদের কেবল যে কঠিন সাধনার সম্মুখীনই হইতে হয় তাহা নয়, তাঁহাদের আরও একটি দুঃখ অকারণে বহন করিতে হয়। পৃথিবীতে নিন্দুকের অভাব নাই এবং তাহারা যে সব সময় যথাযোগ্য বিচার করিয়া যে দোষী কেবল তাহাকেই নিন্দা করে তাহা নয়। তাহারা অবকাশ পাইলেই নিন্দা করিতে ছাড়ে না। যাহারা অল্পপ্রাণ তাহাদের জীবন সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ সুতরাং তাহাদের গায়ে নিন্দার ঝাপট লাগে না। কিন্তু যাঁহারা মহৎপ্রাণ তাঁহাদের জীবন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত বলিয়া তাঁহাদের বহু নিন্দা সহ্য করিতে হয়। তাঁহারা হৃদয়বান্ হওয়ায় তাঁহাদের চিত্ত অল্পেই প্রভূত বেদনা ভোগ করে। সুতরাং নিন্দার ভার তাঁহাদের কাছে গুরু বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সেদিক দিয়াও তাঁহাদের কঠিন দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

(২) যাহা লুকায় তাহাকে বাহির করা, যাহা পালায় তাহাকে বাঁধা, ইহার জন্য মানুষ কী না করে।

'পরনিন্দা' প্রবন্ধের এই ছত্রে রবীন্দ্রনাথ পরনিন্দার কারণ সম্পর্কে তাঁহার অভিমতটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

তিনি বলিতে চাহেন, মানুষ যে পরনিন্দা করে তাহার কারণ এই যে, তাহার মধ্যে আবিষ্কারের সুখ পাইবার জন্য একটা বাসনা রহিয়াছে। যে হরিণ বনের মধ্যে লুকাইয়া থাকে তাহাকে সে খুঁজিয়া বাহির করে, তাহা পলাইয়া যায় বলিয়া তাহাকে বন্দী করে। যাহা দুর্লভ তাহাকে আয়ত্ত করার সুখই শিকারের মূল কথা।

মানুষ যে সমস্ত বিষয়ের নিন্দা করে তাহা মানুষের মধ্যে গোপনে থাকে এবং মানুষের পদশব্দ পাইলেই পলাইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহার বিশেষ আগ্রহ থাকে। যে নিন্দা করে সে মানুষের দুর্বলতার সন্ধান লইতে চেষ্টা করে এবং সেজন্য তাহার প্রয়াসের অন্ত নাই। স্বভাবজ কৌতূহলের সহিত মিশিয়া দুর্লভের সন্ধান পাইবার আকাঙ্ক্ষা নিন্দুকের মধ্যে প্রবল।

(৩) ঠকাই কি সংসারে চরম ঠকা? না-ঠকাই কি চরম লাভ?

'পরনিন্দা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মানুষের নিন্দাবৃত্তির মূল সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষ মানুষের দুর্বলতাটুকু জানিয়া ফেলিতে চাহে। যাহা গূঢ় তাহাকে জানিবার জন্য মানুষের অন্তরে একটা প্রবল কামনা বিদ্যমান। এমন কি যে অংশটা বাহিরে প্রকাশিত তাহার তুলনায় যে অংশ গোপন তাহার সামান্য মাত্র জ্ঞাত হইলেও সেইটুকুকেই মানুষ চরম পরিচয় বলিয়া মনে করিতে চাহে।

পৃথিবীর মধ্যে অনেক জিনিসেরই সৌন্দর্যের সীমা নাই। কিন্তু গূঢ় অংশটা জানিবার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে এত প্রবল যে, সে 'সু'র অন্তরালে একটা 'কু' আছে বলিয়া অনুমান করে। বাহির হইতে ভালো বলিয়া মনে করিয়া সে ঠকিতে চাহে না। কিন্তু এইরূপ না-ঠকা বিজ্ঞতার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বড়ো লাভ বলিয়া মনে করেন নাই। এইরূপ ভাবে ভালো জিনিসকে ঠুকরাইয়া ঠুকরাইয়া তাহার মন্দত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসের চেয়ে ঠকাও অনেক ভালো; তাহাতে উপভোগের লাভটা পুরাপুরি থাকে।

পনেরো আনা

রবীন্দ্রনাথ 'পনেরো আনা' কাহাদের বলিয়াছেন? সংসারে পনেরো আনাকেই প্রয়োজনীয় বলার তাৎপর্য কী?

'পনেরো আনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—পনেরো আনা ও বাকি এক আনা। এই এক আনা মানুষ অসাধারণ—তাঁহারা পৃথিবীতে আদর্শ পুরুষ বলিয়া খ্যাত। বাকি পনেরো আনা সাধারণ মানুষ, তাহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। তাঁহারা কেবল অগণিত জনসমাজের সংখ্যাকে পুষ্ট করিয়াছেন।

যাঁহারা অসাধারণ তাঁহাদের জীবনে শক্তির প্রকাশ এত বেশী যে, তাহার প্রতিই সব মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাদের জীবনকেই আদর্শ বলিয়া

পরিগণিত করা হয়। এই জন্যই যে সমস্ত মানুষের জীবনে শক্তির প্রকাশ নাই, তাহাদের জীবনকে ব্যর্থ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। নীতিজ্ঞেরা এই সাধারণ মানুষদের জীবন নিষ্ফল বলিয়া ধিক্‌কার দিয়া তাহাদের কর্মে প্রণোদিত করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ বলিয়া মনে হইলেও এই পনেরো আনা যে সংসারের পক্ষে একেবারে নিষ্প্রয়োজন এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। একথা সত্য বটে যে তাহাদের জীবন এই জগৎ-সংসারে বুদ্‌বুদের মতো বিলীন হইয়া যায়, মৃত্যুর পর সংসারে তাহারা বিন্দুমাত্র চিহ্ন রাখিয়া যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, তাহারাই মহৎ মানবতার উপাদান। পৃথিবী এত সংকীর্ণ যে, তাহাতে যদি সর্বকালের সর্বমানুষের চিহ্ন রাখিবার চেষ্টা করা হইত তাহা হইলে তাহা তাহার পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়া উঠিত। জগতের বেশীর ভাগ লোকই বিস্মৃতি-লোকে নির্বাসিত হইয়াছে বলিয়া পৃথিবীর পরিসর এখনও সংকীর্ণ হইয়া উঠে নাই।

এই পৃথিবীর পনেরো আনা লোক যে জগতের ক্ষেত্রে ছায়াপাত না করিয়া চলিয়া যায় ইহা বিধাতার অন্তহীন সৃজনশক্তির প্রাচুর্যেরই পরিচয় দান করে। আমাদের কত জীবন ব্যর্থ হইয়া ঝরিয়া যায় অথচ মানবতার কত উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিতেছে—ইহাতে তাঁহার ঐশ্বর্যই ব্যক্ত হইতেছে।

এই বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে অনেক জিনিসই অকারণে বহিয়া যাইতেছে। জীবনকে সার্থক হইয়া উঠিবার অবকাশ দিবার জন্য অনেক খানিকেই নিষ্ফল করিয়া দিবার একটা প্রয়োজন আছে। সব কিছুই পরিপক্ব পরিণতি লাভ করিতে পারে না—প্রকৃতির মধ্যেও অজস্র ব্যর্থতা সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্য হইতে সার্থকতাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার প্রয়াস দেখা যায়। সুতরাং পনেরো আনার ব্যর্থতারও একটা ভূমিকা বা সার্থকতা আছে।

বস্তুতঃ, পৃথিবীশুদ্ধ লোক যদি জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া

পড়িয়া লাগিয়া যাইত, তাহা হইলে জীবনের শান্তি নষ্ট হইত। অপরপক্ষে জীবনে ব্যর্থতার বিরাট পরিসর আছে বলিয়াই মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রা নির্বাহ সহজ হইয়াছে।

'পনেরো আনা' প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রচিত্তের যে ভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ কর।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটা উপাদান ছিল যাহা তাঁহার বাল্যকাল হইতে সকল বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য অধীর কামনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি প্রচলিত শিক্ষাবিধিকে স্বীকার করিতে পারেন নাই, সমাজের আচার বা বিধিব্যবস্থার মধ্যে যে কৃত্রিমতা আছে তাহার প্রতি তিনি চিরকালই বিরাগ পোষণ করিয়াছেন। জীবনকে কোনো একটা বিশেষ ছাঁদে ফেলিয়া তাহাকে সেইভাবে পালন করার আদর্শকে তিনি কোনো দিনই বড়ো বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, মানবজীবনের মধ্যে যে বিরাট প্রসারতা আছে তাহাকে তিনি কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না।

এইজন্যই যেসব বিজ্ঞ ব্যক্তি জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য অহরহ উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথায় তিনি কর্ণপাত করেন নাই। কোনো একটা নির্দিষ্ট আদর্শে জীবনকে গড়িয়া না তুলিলে যে জীবন বৃথা হইয়া গেল এমন কথা তাঁহার কাছে অবজ্ঞাতই হইয়াছে এবং জীবনের তথাকথিত সার্থকতার আদর্শের বিরুদ্ধে তিনি একাধিকবার উষ্মাপ্রকাশ করিয়াছেন।

লোকহিতের সংকীর্ণ আদর্শের দিক হইতে দৃষ্টিপাত করিলে সাধারণ মানুষের জীবনকে ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু বৃহত্তর জীবন-বোধ লইয়া পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি করা কঠিন হইবে না, যে, অসংখ্য মানুষ যে সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাহার মধ্যে একটা সার্থকতা বর্তমান। আম্রশাখায় অজস্র মুকুল ধরে কিন্তু তাহার বেশীর ভাগই ঝরিয়া যায় অথচ আমরা যে ফলগুলি পাই তাহাই আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত। পৃথিবীতে

অসংখ্য মানুষ গতানুগতিকভাবে জীবন যাপন করিলেও তাহারই মধ্যে কয়েকজন মানুষ আপনাদের জীবনকে এভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে যাহাতে মনুষ্যত্বের গৌরব উজ্জ্বলতর হইতে পারিয়াছে। তাহাদের বিকাশের জন্য যে অবকাশ প্রয়োজন, অগণিত সাধারণ মানুষ তাহাই করিয়া দিয়াছে।

মানুষের জীবনের সার্থকতা যে কী তাহা সুনির্দিষ্ট নহে। সুতরাং কোনো বিশেষ আদর্শকে চরম বলিয়া মনে করিয়া অনর্থক ছুটাছুটিও বিরাট মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা অধিকাংশ মানুষ হাসি-কান্নায় স্নিগ্ধ যে শান্তিময় জীবন যাপন করি, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে ব্যর্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'আমরা সাধারণ পনেরো আনা…আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে মানুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনস্বত্ব। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁকড়াইয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই। সংসারের সমস্ত কলগান আমাদের দ্বারা ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক আমাদের উপরেই স্পন্দমান।…আমরা…অধিকাংশই পরস্পরকে সঙ্গদান ও গতিদান ছাড়া আর কোন কাজে লাগি না; সে জন্য নিজেকে ও অন্যকে কোন দোষ না দিয়া, ছটফট না করিয়া, প্রফুল্ল হাস্যে ও প্রসন্ন গানে সহজেই অখ্যাত অবসানের মধ্যে যদি শান্তি লাভ করি, তাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই যথার্থভাবে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি।'

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ পদ্মাবক্ষে অবস্থানকালে বাংলার পল্লীর নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্যে অবগাহন করিয়াছিলেন এবং সেই শান্ত জীবনধারা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নাগরিক জীবনের উত্তেজনার তুলনায় তাহার সার্থকতা যে কম নয় এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল। সেই অখ্যাত জীবনধারার মধ্যেও যে একটা গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে ইহা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। 'পনেরো আনা' প্রবন্ধের মধ্যে তাহার আভাস ব্যক্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা

(১) বাহুল্য মানুষটিই আপনাকে সর্বতোভাবে দিতে পারে।

'পনেরো আনা' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন যে, প্রয়োজনই জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা নয়। পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস দেখা যায়, যাহার কোনো প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবুও আমাদের জীবন হইতে তাহাদের বাদ দেওয়া যায় না বরং তাহাদের জীবনের মধ্যে এমন একটা উপাদান থাকে যাহার জন্য তাহাদের উপেক্ষা করা যায় না।

মানুষের জীবন প্রয়োজন দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজনের চাহিদা সর্বদাই পূরণ করিতে হয়; কিন্তু তাহাই মানুষের সব কিছু নয়। মানুষের মধ্যে এমন একটা অতিরিক্ত উপাদান আছে, যাহার মধ্যে মানুষের স্বধর্ম প্রকাশিত হয়। এই বাহুল্যটুকুর জন্যই মানুষ সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। এই বাহুল্যটুকু কোনো প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় বলিয়া তাহার মধ্যে মানুষের আনন্দের প্রকাশ হইতে পারে। ইহা দিয়াই মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে পারে। বস্তুতঃ, মানুষের সর্ববিধ প্রকাশ এই বাহুল্যের জন্যই সম্ভবপর।

(২) দেশে থাকিয়া শেয়াল শিকার করিয়া ও ঘোড়দৌড় জুয়া খেলিয়া দিন-কাটানোকে যদি ব্যর্থতা বল, তবে তাহা চীন-উদ্ধার চেষ্টার মতো এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা নহে।

'পনেরো আনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রাকে ব্যর্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সেই সাধারণ হাসি-কান্না, নিতান্ত তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদের মধ্যেও জীবনের একটা শান্তিমণ্ডিত সুস্থ প্রকাশ সম্ভবপর হয়। যাহারা পরহিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায় তাহারা যে জীবনে সুখশান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তাহা নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাহারা ঘোরতর অশান্তি সৃষ্টি করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ দুই শ্রেণীর ইংরেজের কথা বলিয়াছেন। একশ্রেণীর

রামমোহন যে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি গৃহী হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞানী হইবার ভান করিতেন, এক কথায় তিনি ছিলেন ভণ্ডজ্ঞানী। রামমোহন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি যে ব্রহ্মের স্বরূপ জানেন এমন কথা বলিবার স্পর্ধা তাঁহার নাই। কিন্তু বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপই যে একমাত্র সেব্য ধর্ম এবং গৃহস্থের পক্ষে যে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব একথা ন্যায়বিরুদ্ধ ও অন্যায়। তাঁহার এই মতের বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রতিসংস্থাপকরা যোগবাশিষ্ঠের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, কর্ম ও জ্ঞানের মিলন অসম্ভব।

বর্তমানে সকলেই গীতাপন্থী। গীতায় কেবল কর্ম ও জ্ঞানের নয়, সেই সঙ্গে ভক্তিরও যে সমন্বয় করা হইয়াছে এ কথা সকলেই মানেন। যে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা এখন সকলের মুখে মুখে রামমোহন রায় সেই বেদান্ত শাস্ত্রের একরূপ আবিষ্কর্তা। সে কালের একদল পণ্ডিত এই অভিযোগ করেন যে, উপনিষদগুলি সংস্কৃত শাস্ত্র নয়, রামমোহন রায় তাহা জাল করিয়াছেন। রামমোহন রায়কে এই অদ্ভুত মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দিয়া বলিতে হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ স্থানীয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গৃহে উপনিষদগুলির সন্ধান পাওয়া যাইবে।

এই জালের অপবাদ হইতে রামমোহন এখনও মুক্তি পান নাই। এখনও শিক্ষিত সমাজের অনেকের ধারণা এই যে, রামমোহন ও তাঁহার গুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী মহানির্বাণতন্ত্রটি জাল করিয়াছেন। কিন্তু আদালতে প্রমাণ করিবার জন্যই লোকে জাল করে, যেমন দত্তকচন্দ্রিকা নামক স্মৃতিগ্রন্থ জাল করা হইয়াছিল। মোক্ষশাস্ত্র জালের প্রশ্নই ওঠে না—ইহা বর্তমান বাঙালীর অতিবুদ্ধির আবিষ্কার।

রামমোহন যে কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষার ফল এই ভ্রান্ত ধারণাও এদেশে প্রচলিত। কিন্তু রামমোহন যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিবার পূর্বেও

একমাত্র ন্যায় ও যুক্তির সাহায্যে ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত কয়েকটি পুস্তিকা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ফল।

রামমোহনের বাংলা ও ইংরেজি রচনার সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন যে, পৌত্তলিকতার মতোই তিনি খ্রীষ্টধর্মকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, তাঁহার মতে ওটিও একটি পৌরাণিক ধর্ম। রামমোহন নিজেকে শঙ্করাচার্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং ইউরোপের ধর্মমত যে তাঁহার উপরে প্রভাব বিস্তার করে নাই এ কথা অনায়াসেই বলা চলে।

তাহা ছাড়া ইউরোপের প্রাচীন বা আধুনিক দর্শনের সঙ্গে যে তাঁহার কোনোরূপ পরিচয় ছিল তাহার প্রমাণ তাঁহার রচনা হইতে পাওয়া যায় না। তিনি পাশ্চাত্ত্য দর্শন পড়িয়া থাকিলেও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন নাই।

রামমোহনের কসমিক কন্‌শাসনেস পুরাপুরি ভারতীয়—তাঁহার মনটি প্রাচীন আর্যমন। ভারতীয় আর্যদের মতোই তিনি বিশুদ্ধ যুক্তি ও বাস্তব যুক্তির উপর জোর দিয়াছিলেন—তাঁহার ধর্মচিন্তায় সৌন্দর্যের বা হৃদয়াবেগের স্থান ছিল না। অপরপক্ষে খ্রীষ্টান, বৈষ্ণব, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মে হৃদয়াবেগের অংশ প্রবল এবং সকল দেশের সকল মূর্তি পূজার মধ্যেই সৌন্দর্যবোধ বর্তমান। সাধারণ মানুষের হৃদয়ভাব ব্যতিরিক্ত যে অনাদিরস আছে উপনিষদে তাহাই বিধৃত এবং রামমোহন তারই সাধক ছিলেন।

কিছুকাল পূর্বে রামমোহনের একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম অপ্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, রামমোহন বিলাতে গিয়া খ্রীষ্টধর্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন, আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে তিনি হয়তো খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিশেষ পরিচয়ের ফলে যে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এ মত স্বীকার করা যায় না। বাইবেলের যে অংশ অলৌকিক বৃত্তান্তে

পরিপূর্ণ তাহার প্রতি তিনি চিরকালই বিদ্রূপ করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্মের যে টুকু স্পিরিচুয়াল এবং এথিক্যাল সে অংশ তাঁহার উদার চিত্ত পূর্বেই স্বীকার করিয়াছিল। তাঁহার উদারতার পরিচয় আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট ডীডের মধ্যে পাওয়া যায়। পৃথিবীর লিবারেটারদের মধ্যে রামমোহনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রামমোহনের সমাজচেতনা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও।

রামমোহন যখন যুবক তখন এদেশে ইংরেজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশের উপর ইংরেজের শাসন ও সভ্যতার প্রভাব পড়িতেছিল। এই প্রভাব যে এড়ানো যায় না রামমোহন তাহা জানিতেন। এই সভ্যতার সহিত সংঘর্ষে আত্মরক্ষার জন্য ভারতবাসীর আত্মপরিচয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। রামমোহনের অন্তরে ভারতবর্ষ যেন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিল। রামমোহন উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই নূতন সভ্যতা ভারতের উন্নতির সহায়ক হইবে। তাঁহার প্রদর্শিত পথেই এখনও আমরা চলিতেছি।

আমাদের দেশে যে নবযুগ আসিয়াছে রামমোহনই তাঁহার প্রথম দ্রষ্টা ও প্রদর্শক। তাঁহার সময়ের অন্য বাংলা লেখকের রচনা পড়িলে দেখা যায় যে, নবাবের পরিবর্তে ইংরেজের হাতে রাজ্য পড়ায় জাতীয় জীবনে একটা বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইতে চলিয়াছে এবোধ সেকালের অপর কোন বাঙালীর ছিল না। ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে এমন একটা নবশক্তি আনিয়াছে যাহার সংঘর্ষে ও সমবায়ে একটি নূতন সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। রামমোহন তাঁহার প্রতিভা ও স্বাধীন শিক্ষা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া ইংরেজের সভ্যতার কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করিয়া কিছু অংশ দেশকে শক্তিশালী করিবার কাজে লাগাইয়াছেন।

রামমোহনের সময় কয়েকজন মিশনারি এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে

চেষ্টা করেন। রামমোহন এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে দাঁড়ান কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, উপদ্রব করিয়া বা প্রলোভন দেখাইয়া কোন লোককে স্বধর্মচ্যুত করিবার চেষ্টা করা সংগত নয়—কেবলমাত্র যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে ধর্মপ্রচারই কর্তব্য। সে যুগে যখন কেহ ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিত না, রামমোহন তখন নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়া নিরতিশয় সাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

বর্তমানে আমরা যাহাকে জাতীয় আত্মমর্যাদাজ্ঞান বলি রামমোহনের মধ্যে তাহা সর্বপ্রথম দেখা যায়। তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে এই মনোভাবের লেশমাত্র ছিল না। অথচ ইহা নিছক আত্মশ্লাঘা নয়, ইহার সহিত আত্মগ্লানিও জড়িত আছে। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, সে যুগে বাঙালী ছিল দুর্বল ও ভীরু—এই সকল দৈন্য হইতে স্বজাতিকে মুক্ত করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিবার জন্য তিনি জাতীয় জীবন ও মনকে শক্তিশালী করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বজাতিকে উন্নতির পথ দেখাইয়াছিলেন।

রামমোহনের আধ্যাত্মিক, সাংসারিক বা অপর যে কোন বিষয়ে মতের মধ্যে তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তা ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বেদান্তের ভক্ত কারণ বেদান্ত মোক্ষশাস্ত্র। যে জ্ঞান মুক্তি দেয় সেই জ্ঞানের সাধনা করিতে তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন। অবিদ্যার হাত হইতে, লৌকিক ধর্মের সংকীর্ণ ধারণা হইতে মনের মুক্তিসাধনই বেদান্তের প্রতিপাদ্য মোক্ষ।

বেদান্ত শাস্ত্র নেতিমূলক। বাহিরের কোনো নির্দেশ দিয়া যে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যায় না তাহা এই শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ মুক্তির সংবাদ অন্য কোনো শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা নাস্তিক্যবাদ নয় ইহা সংকীর্ণ আস্তিক মতের বিরোধী মাত্র।

সামাজিক সভ্যতা বর্তমান ইউরোপের চরম বাণী। ইউরোপীয়

সভ্যতার মূল মন্ত্র যে কী তাহা রামমোহনের চোখে সর্বপ্রথম ধরা পড়িয়াছিল। ইউরোপের সামাজিক সভ্যতা যে এদেশে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কাজ করিবে তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই লিবার্টির ধর্মকে গ্রহণ করিয়াই ভারতবাসী নূতন জীবন ও নূতন শক্তিলাভ করিবে—তিনি এই সত্যটি প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বর্তমানে লিবার্টি কথাটা আমরা এত বেশি ব্যবহার করিতেছি যে, উহা অনেকের কাছে একটি বুলিমাত্রে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। গীতার নিষ্কাম ধর্মের কথাটাও বর্তমানে একটি বুলিমাত্র। যে কথা মুখে আছে অথচ মনে নাই, তাহাই বুলি।

লিবার্টির অর্থ হইতেছে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। যে সমাজে ব্যক্তিমাত্রই এই স্বাধীনতার অধিকারী নয়, সে দেশের লোকমাত্রই দাস—সে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোনো অর্থ নাই।—রামমোহন লিবার্টির এই অর্থটি গ্রহণ করিয়া স্বজাতিকে মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। লিবার্টির আদর্শের মূল কথা এই যে, স্বাধীনতার মধ্যেই ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনীশক্তি স্ফূর্তিলাভ করে। বহু লোকের মনে ও জীবনে এই শক্তি স্ফূর্ত হইলেই জাতীয় মন শক্তি ও উন্নতির অধিকারী হয়। ব্যক্তিকে দাস করিয়া সমাজের উন্নতি সাধনের আদর্শ রামমোহন গ্রহণ করেন নাই।

রামমোহন জানিতেন যে, তাঁহার স্বজাতি দুর্বল, ভয়ার্ত ও দীন—এই দুর্বলতা, ভয় ও দৈন্য কী ভাবে দূর করা যায় তাহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ভাবনা। সুতরাং তিনি একদিকে যেমন সরকারের আইনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই তাঁহাকে বাঙালির মানসিক ও সামাজিক মুক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল।

সামাজিক ও ধর্মনৈতিক মুক্তির অভাবে যে কোনো জাতি মানুষ হইয়া উঠিতে পারে না এ বোধ তাঁহার ছিল। স্বজাতির সামাজিক ও ধর্মনৈতিক

মুক্তির রক্ষাকল্পে তিনি ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জকে একখানি খোলা চিঠি দেন। এই চিঠির মধ্যে যে মূল সূত্রগুলি আছে বহুকাল পরে তাহা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মধ্যে দেখা গিয়াছে।

সামাজিক দাসবুদ্ধির হাত হইতে দেশকে মুক্তি দিবার জন্য রামমোহন এ দেশে ইউরোপীয় শিক্ষাকে আহ্বান করেন। নিছক কল্পনাসাধ্য জ্ঞান মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না—জ্ঞানের মূলে সত্য আবশ্যক। রামমোহন দেখিয়াছিলেন যে, ইউরোপের দুটি শাস্ত্রের মূলে সত্য রহিয়াছে,—সে দুটি বিজ্ঞান ও ইতিহাস। বিজ্ঞান বিশ্বের গঠন ক্রিয়ার যথার্থ জ্ঞান দেয় আর ইতিহাস মানবসমাজের উত্থান-পতন-পরিবর্তনের যথার্থ জ্ঞান দেয়। এই দুইটির আলোচনাই জ্ঞানের অন্ধতা হইতে মুক্তি দিতে পারে। রামমোহন স্বদেশবাসীকে ইউরোপীয় সত্যমূলক শাস্ত্রের সাধনা করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়াই বর্তমানে বাঙালী আর্টে, বিজ্ঞানে, রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্রই সর্বাগ্রগণ্য জাতি; বাঙালীই রাজনৈতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। বাঙালী জাতির মধ্যে যে সকল শক্তি প্রচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিল, রামমোহনের অন্তরে সেইগুলি সংহত ও প্রকট হইয়া উঠায় আমরা শিক্ষায় ও জীবনে অজ্ঞাতসারে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা

(১) কারও ছবি আঁকতে বসে তাঁর মাথা বাদ দিয়ে দেহটি আঁকলে সে চিত্র যে পূর্ণাঙ্গ হয় না তা বলাই বাহুল্য।

সরস সাদৃশ্য কল্পনা বা দৃষ্টান্ত দান প্রমথ চৌধুরীর রচনায় একটি বিশেষ লক্ষণ। 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে রামমোহনের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তিনি এই সরস ছত্রটি সংযোজন করিয়াছেন। প্রবন্ধটির প্রথম দিকে তিনি রামমোহনের কেবল সামাজিক মত সম্পর্কে আলোচনা করিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহনের সামাজিক মত সম্পর্কে আলোচনা

করিতে গিয়া তিনি তাঁহার ধর্মনৈতিক মতের মূল সূত্রগুলির পরিচয় দান করিয়াছেন।

প্রমথ চৌধুরী মনে করেন যে, রামমোহনের ধর্মনৈতিক মতের পরিচয় লাভ না করিলে তাঁহার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব আমাদের নিকট অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইবে। রামমোহনের জীবনে ধর্মচিন্তার স্থান তাঁহার মতে দেহাবয়বে মাথার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। মাথা বাদ দিয়া ছবির কল্পনা যেমন হাস্যকর, রামমোহনের ধর্মমতকে বাদ দিয়া তাঁহার সম্পর্কে আলোচনাও তেমনই অসংগত।—বস্তুত, রামমোহনের জীবনে ধর্মচিন্তা এতখানি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল যে, তাঁহার অন্যান্য চিন্তাকেও এই চিন্তার পরিপূরক বলিয়া মনে করা অসংগত হইবে না।

(২) লিবার্টির ধর্মকে আত্মসাৎ করে ভারতবাসী যে আবার নবজীবন নবশক্তি লাভ করবে এই সত্য প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য।

রামমোহন রায় বেদান্তশাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন কারণ বেদান্তশাস্ত্র মোক্ষ প্রতিপাদক। এই মোক্ষের অর্থ মনের মোহমুক্তি।—ইউরোপের লিবার্টির আদর্শের মধ্যে তিনি এই মুক্তির প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি এ দেশে ঐ লিবার্টির আদর্শটি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বজাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

বহুকাল ধরিয়া ভারতবাসী সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দাসত্ব করিয়া আসিতেছে। এই দাসত্বই তাহার দুর্বলতা, ভীরুতা ও দৈন্যের কারণ। তাহার এই দুর্বলতা, ভীরুতা ও দৈন্য দূর করিতে হইলে তাহার জীবনে ও মনে নূতন শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। ইউরোপের সমাজমানসে যে লিবার্টির আদর্শ আছে তাহাই ভারতবাসীর জীবনে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কাজ করিবে ইহাই ছিল রামমোহনের বিশ্বাস। সেইজন্য তিনি স্বজাতির মানস-ক্ষেত্রে লিবার্টির বীজ বপন করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

(৩) আমরা যদি আমাদের মনের প্রদীপ জোর করে নেবাতে চেষ্টা করি, তাহলে যে ধূমের সৃষ্টি হবে তাতে সমস্ত ভারতবর্ষের মনের রাজ্য অন্ধকার হয়ে যাবে।

'রামমোহন রায়' প্রবন্ধের শেষভাগে প্রমথ চৌধুরী রামমোহনের সমস্ত কর্ম ও চিন্তার মধ্যে যে বাঙালীর সংগুপ্ত ও বিক্ষিপ্ত শক্তি বিকশিত ও সংহত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই জন্যই আমরা মানসক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

রামমোহনের আদর্শ ছিল সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি। এই মুক্তির আদর্শ বাঙালীর অন্তরে বর্তমান। সুতরাং বাঙালী যদি বর্তমানে জোর করিয়া অপর কোনো আদর্শের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহা তাহার পক্ষে স্বধর্মদ্রোহেরই নামান্তর হইবে। ইহার ফলে তাহার নিজেরই যে কেবল ক্ষতি হইবে তাহা নয়। বাঙালী বর্তমানে সারা ভারতবর্ষের মানসিক জগতে পথপ্রদর্শন করিতেছে। সে যদি আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বধর্ম হারায় তাহা হইলে সারা ভারতবর্ষের চিন্তার ক্ষেত্র কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে।

প্রমথ চৌধুরী এই ছত্রটিতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ লঘু অলংকরণ-পটুতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালীর মনকে তিনি প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সেই প্রদীপ নিবিয়া গেলে যে ধূম উঠিবে তাহাতে সারা ভারতবর্ষের মনের রাজ্য অন্ধকার হইয়া যাইবে।

মহাভারত ও গীতা

"জ্ঞানের তরফ থেকে শংকরের ভাষ্য যেমন একমেবাদ্বিতীয়ম্ কর্মের তরফ থেকে মহাত্মা তিলকের ভাষ্যও, আমার বিশ্বাস, তেমনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে থাকবে।"—আলোচনা কর।

মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় গীতার একটি বিরাট ভাষ্য রচনা করেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন। এই

বিরাট গ্রন্থটিতে তিলক বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়াছেন। এইরূপ বিরাট ও পণ্ডিতজনপাঠ্য গ্রন্থকে প্রমথ চৌধুরীর সাধারণ পাঠকের পক্ষে কেবল দুরধিগম্য নয় অনধিগম্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

গীতাকে এ পর্যন্ত সকলেই নিজেদের সম্প্রদায়ের মত অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন। আচার্য শংকর প্রমুখ বৈদান্তিক যাঁহারা জ্ঞান-মার্গের সার্থক তাঁহারা গীতাকে জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্ররূপে দেখিয়া সেইভাবে ইহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন ; শ্রীধর স্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব তাত্ত্বিক ভক্তিমার্গের দিক দিয়া গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাত্মা তিলক তাঁহার ভাষ্যে গীতা বা স্মৃতির পনেরোটি টীকার বিচার ও খণ্ডন করিয়াছেন। ঐ পনেরোটি ভাষ্য প্রত্যেকের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতানুসারে রচিত। মহাত্মা তিলকও এক হিসাবে তিনি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াই গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

কারণ, বর্তমান যুগ জ্ঞানের যুগ নয়, বিজ্ঞানের যুগ ; ভক্তির যুগ নয়, কর্মের যুগ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে জন্মভূমিকে কর্মভূমি বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষ পৌরাণিক যুগে কর্মভূমি ছিল কি না তাহা জানা না গেলেও ভারতবর্ষের বর্তমান যুগ যে ঘোরতর কর্মযুগ সে বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের সকলেই একমত। এ যুগের ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের সকলেই কর্মবাদের একান্ত ভক্ত। সন্ন্যাসী হইবার লোভ এখন আর কাহারও নাই। কেহ কেহ পলিটিক্যাল সন্ন্যাসী হইতে চান, এইমাত্র পার্থক্য। তবে পলিটিক্স জ্ঞানকাণ্ড বা ভক্তিকাণ্ডের ব্যাপার নয়, ইহা পুরাপুরি কর্মকাণ্ডের ব্যাপার। সংসার তথা কর্মের প্রতি আত্যন্তিক অনুরক্তিই কর্মকাণ্ডের মূল। ইউরোপীয়েরা বিদ্যা ও অর্থের চর্চা করিলেও ভারতবাসীরা ধর্মচিন্তা করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিলকের সহকর্মী লালা লাজপত রায় বলিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম মূলত সন্ন্যাসের

ধর্ম নয়, ইহা আসলে কর্মের ধর্ম। সেই সঙ্গে তিনি আমাদের সকলকে গীতার মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, কারণ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করা সুকঠিন।

ইংরাজের শিষ্য হইয়া আমরা কর্মের উপাসক হইয়াছি। শ্রীধর স্বামীর শিষ্য নীলকণ্ঠ ভক্তির উপাসক হইলেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় কর্মকাণ্ডের, মধ্যের ছয় অধ্যায় ভক্তিকাণ্ডের এবং শেষের ছয় অধ্যায় জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। এইভাবে পরিপাটি ভাগ-বাটোয়ারার হিসাব না জানিলেও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে গীতায় কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান তিনটিই আছে। এইগুলির মধ্যে কেবলমাত্র একটি লইয়া অপরগুলিকে এড়াইয়া গেলে গীতার সংগত ব্যাখ্যা হইবে না। গীতার মধ্যে বহু উপাদান আছে। তাহার মধ্যে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করিলে তাহা সর্বজন-গ্রাহ্য হইবে না। পূর্ব পূর্ব আচার্যেরা প্রধানত গীতাভাষ্যে জ্ঞান ও ভক্তির মার্গকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। গীতায় যে ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা যে মুখ্যত সন্ন্যাসের ধর্ম নয় তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

গীতাকে কর্মযোগ বলিবার আমাদের অধিকার আছে। কর্মই এযুগের ধর্ম; সেই যুগধর্মানুসারে আমরা গীতা হইতে সারসংগ্রহে অগ্রসর হইতে পারি। মহাত্মা তিলকই সেই প্রচেষ্টার যোগ্যতম পাত্র। তাঁহার মতো কর্মযোগী যে ভারতে আর নাই এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার গীতাভাষ্যও তাঁহার কর্মযোগেরই ফল। জ্ঞানযোগী আচার্য শংকর যেমন জ্ঞানের দিক হইতে গীতার একটি অনতিক্রমণীয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কর্মযোগী তিলকও কর্মের দিক হইতে একটি অদ্বিতীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। গীতার শংকর ভাষ্যের মতোই তিলকভাষ্যও শ্রদ্ধার্হ ও মূল্যবান্।

"এই গ্রন্থ নিয়ে এ যুগে এক নূতন তর্কের সৃষ্টি হয়েছে।"—এই নূতন তর্কের পরিচয় দিয়া ইহার সার্থকতা কতখানি বিচার কর।

গীতার মধ্যে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোনটির প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা লইয়া এদেশে সেকালেও আলোচনা হইত। কিন্তু এই গ্রন্থটি লইয়া এ যুগে একটি নূতন তর্কের উদ্ভব হইয়াছে। এযুগের আলোচনার বিষয়বস্তু 'গ্রন্থ কোথায় রচিত হইয়াছে, কে রচনা করিয়াছে, তাহার ভাষা কিরূপ—কাব্যদৃষ্টিতে তাহাতে কতটা মাধুর্য ও প্রসাদগুণ আছে, গ্রন্থের শব্দরচনা ব্যাকরণশুদ্ধ অথবা তাহাতে কতকগুলি আর্ষপ্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন্ কোন্ মতের, স্থলের কিংবা ব্যক্তির উল্লেখ আছে, এই সকল ধরিয়া গ্রন্থের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে কিনা' ইত্যাদি।

বালগঙ্গাধর তিলক এইরূপ আলোচনাকে বহিরঙ্গ পর্যালোচনা বলিয়াছেন। এই আলোচনা আমরা ইউরোপ হইতে আমদানি করিয়াছি। বর্তমানে আমাদের দেশের বিদ্বৎসমাজও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অনুসরণে গীতার বহিরাঙ্গেরই আলোচনা করিতেছেন। যাঁহারা এরূপ আলোচনা করেন তিলক তাঁহাদের প্রতি বিরাগ পোষণ করিয়াছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে মুরারি কবির একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বাগ্‌দেবীর বহিরঙ্গ সেবক ও রহস্যজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন—

অব্ধির্লঙ্ঘিত এব বানরভটৈঃ কিং ত্বস্য গম্ভীরতাম্।
আপাতালনিমগ্নপীবর তনুর্জানাতি মন্থাচলঃ ॥

অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা মন্দার পর্বতের মতো গ্রন্থরহস্য-মধ্যে নিমজ্জিত হন—বহিরঙ্গের দিকে দৃষ্টি তাঁহাদের থাকে না। যাঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনুকরণমাত্র করেন, তাঁহাদের নিকট এরূপ উক্তি একটু কঠোর বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু যাঁহারা জার্মান পাণ্ডিত্যের উল্লম্ফন লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে মুরারি কবির এই উক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হইবে।

কাব্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের সেবা মূলত পৃথক—ইহাদের মধ্যে একটা বিরোধও বর্তমান। কাব্যের মধ্য হইতে ইতিহাস বাহির করিতে গেলে তাহার

সমস্ত কাব্যরসই শুকাইয়া যায়। তখন ইতিহাসের নীরস তথ্যগুলি মাথা চাড়া দিয়া উঠে। কাব্য-রসিকরা কাব্যের সমগ্ররূপ দর্শন করিয়া তাহার রস দেখিয়া মুগ্ধ হন; অপর পক্ষে পণ্ডিতেরা কাব্যের রস বস্তুকে উপেক্ষা করেন।

বর্তমানে এই ধরণের বহিরঙ্গ সর্বস্ব আলোচনার রীতি এতটা ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে যে, তিলক নিজেও বহিরঙ্গ আলোচনার হাত এড়াইতে পারেন নাই। ফলে বহিরঙ্গ বিচার আলোচনার একরূপ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

গীতা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত কি না এবং মহাভারতের কতটা অংশ প্রক্ষিপ্ত সে বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর মতামত ব্যক্ত কর।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারতের মধ্যে যে প্রচুর পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে এই কথাটা সর্বপ্রথম বলেন। তাঁহাদের কাছে হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যের সাধারণ মাপ। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ বলিয়া তাহার কাব্যও যে বিরাটকায় হইবে এমন কোনো কথা নাই। কাব্যরচয়িতা কবিরও দমের একটা সীমা আছে। অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত রচনা করা একজন কবির পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং মহাভারতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। তবে মহাভারত কেবল কাব্য নয়, ইহা একাধারে কাব্য ও বিশ্বকোষ। সাধারণ লোক কাব্যাংশের স্বাদ গ্রহণ করে আর পণ্ডিতরা বিশ্বকোষ অংশ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই কথাটি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ভুল করেন।

অবশ্য কাব্য ও বিশ্বকোষ এক জাতীয় রচনা নয়। প্রথমে মহাভারত কাব্যই ছিল, পরে ইহার মধ্যে বিশ্বকোষ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তবে এই বৃহৎ গ্রন্থের কাব্যত্ব বিশ্বকোষের ভারে নিষ্পেষিত হয় নাই বলিয়া সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে। পণ্ডিতরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এই কাব্য প্রথমে ভারত কাব্য নামে প্রখ্যাত ছিল, পরে প্রচুর পরিমাণে বিষয়বস্তুর সমাবেশের ফলে সেই কাব্যই বর্তমানের বিশালকায় মহাভারতে পরিণত

হইয়াছে। পূর্ববর্তী ভারত কাব্য—যাহা জয় নামে পূর্বে অভিহিত হইত —তাহা লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহা মহাভারতের ভিতরেই সংগুপ্ত আছে। তবে মহাভারতের সুবৃহৎ কলেবরের মধ্য হইতে সেই ক্ষুদ্রায়তন কাব্যটি খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব।

সে যুগে গ্রন্থ ছাপা হইত না—এত দীর্ঘ গ্রন্থ অনুলিখন করিবার জন্য স্বয়ং গজাননকে টানিয়া আনিবার কল্পনা এই গ্রন্থ মধ্যেই রহিয়াছে। এই গ্রন্থ লেখার মতোই পড়াও শক্ত। মহাভারতের মধ্য হইতে ভারতকাব্যকে বাহির করিয়া লইতে পারিলে ইহার মধ্যে কোন অংশটা প্রক্ষিপ্ত তাহার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাইতে পারে। যদি শুদ্ধমাত্র প্রক্ষিপ্ত অংশ বাছিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে ভারতকাব্য উদ্ধারের আশা দুরাশামাত্র হইবে।

প্রমথ চৌধুরী মনে করেন যে, প্রক্ষিপ্ত অংশের কিছুটা ভারতকাব্যের ভিতরে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে আর কিছুটা অংশ তাহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত অংশের বিচার না করিয়া সংযোজিত অংশটিকে কাব্য হইতে বিযুক্ত করিতে পারিলে সমস্যা অনেকটা সহজ হইয়া আসে। তিনি মহাভারতকে সোজাসুজি দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিতে চান। বর্তমান মহাভারতের নয় খণ্ড প্রাচীন ভারত আর নয় খণ্ড অর্বাচীন রচনা। অবশ্য প্রথম নয় পর্বের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বিষয় অনেক আছে। কিন্তু দ্বিতীয় নয় পর্বের মধ্যে সম্ভবতঃ এমন কথা নাই যাহা পূর্বে ভারতকাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অর্থাৎ দুইখানি বই জুড়িয়া মহাভারত সৃষ্ট হইয়াছে—এ দুটিকে পূর্বভারত ও উত্তরভারত বলা চলে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরণের কাব্য আরও অনেক আছে। মেঘদূতের পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ একই হাতের রচনা হইলেও কুমারসম্ভবের পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ, কাদম্বরীর পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ এমন কি রামায়ণের পূর্বকাণ্ডগুলি ও উত্তরকাণ্ড ভিন্ন লোকের রচনা।

মহাভারতের রচনাকাল নির্ণয় করিতে গিয়া জার্মান পণ্ডিত ডালমান বলিয়াছেন যে, মহাভারত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। আবার

হেল্‌ৎস্‌মান নামক আর একজন জার্মান পণ্ডিত বলেন যে, মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয়। উভয়ের গবেষণার ফল এত পৃথক যে সেগুলির সত্যতা সম্পর্কে পাঠকদের মনে সন্দেহ থাকিয়া যায়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী তাঁহার মত শূন্যে খাড়া করেন নাই। পুরাকালে ভারত-কাব্যের অপর নাম ছিল জয় কাব্য অর্থাৎ এ কাব্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের কথা ইহাতে ছিল; সুতরাং যুদ্ধজয়ের পরবর্তী কোনো বিষয়ের বর্ণনা বা আলোচনা ইহাতে ছিল না। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও বলিয়াছেন যে, মহাভারত যুদ্ধপ্রধান কাব্য এবং এই কাব্যের প্রধান কাব্য সৌপ্তিকপর্বে শেষ হইয়াছে। একথা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কারণ যুদ্ধ করিবার লোক না থাকিলে যুদ্ধ হয় না। সৌপ্তিক পর্বের শেষে দেখিতে পাই যে, অশ্বত্থামা মুমূর্ষু দুর্যোধনকে বলিতেছেন যে, উভয় পক্ষের সকল যোদ্ধা নিহত হইয়াছে। অবশিষ্ট কৌরবপক্ষে তিনজন, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা আর পাণ্ডবপক্ষে সাতজন, পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কৃষ্ণ। এই কথা বলিয়াই অশ্বত্থামা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আশ্রমে গিয়াছেন, কৃতবর্মা স্বরাষ্ট্রে এবং কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এইখানেই ভারত নাটকের যবনিকা পতন হইয়াছে। ইহার পরে মহাভারতে যুদ্ধের কথা নাই, শান্তির কথা আছে। মূল ভারত ইলিয়াডের মতো যুদ্ধ কাব্য ছিল। কাব্যকে আমরা ফুল বলি। সুতরাং সৌপ্তিক পর্বকেই ভারতকাব্যের শেষপর্ব বলিতে পারি, কারণ আদিপর্বে আছে যে, মহাভারত নামক মহাবৃক্ষের সৌপ্তিকপর্ব প্রসূন ও শান্তিপর্ব মহাফল। এই অনুমান সত্য হইলে উত্তরভারতে কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত আর কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত নয় সে বিষয়ে কোনোরূপ আলোচনার অবকাশই থাকে না, কারণ এই অংশ আগাগোড়াই প্রক্ষিপ্ত।

সৌপ্তিকপর্ব ভারতপর্বের অন্তর্ভূত স্বীকার করিলে কল্পিত বিভাগ দুইটি সমান হয় না। কারণ সৌপ্তিকপর্ব বর্তমান মহাভারতের দশমপর্ব। তবে মহাভারতের আদিপর্ব আদিতে স্থান পাইলেও ইহা আসলে মহাভারতের

অন্তপর্ব। মুখপত্র, সূচি ও ভূমিকা বইয়ের গোড়াতে ছাপা হইলেও সবশেষে লেখা হয়। প্রমথ চৌধুরীর এই মত যে সত্য, তাহার প্রমাণ নীলকণ্ঠ 'আদি' শব্দের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, 'আদিত্যাঞ্চস্য ন প্রাথম্যাৎ।—ইহার পর তিনি অবশ্য বলিয়াছেন যে, এখানে সকলের উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম আদি। তবে এই উৎপত্তি কীর্তন ভারতকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, ইহা ভারত বিশ্বকোষেরই অন্তর্ভুক্ত।

মহাভারতের অষ্টাদশপর্বকে সমান দুটি ভাগে ভাগ করিলে আর একটি অসুবিধা হয়। ভারতকাব্যটি সৌপ্তিকপর্বে শেষ করিলে স্ত্রীপর্বটি এই কাব্য হইতে বাদ পড়িয়া যায়। এই পর্বটিকে ভারতকাব্য হইতে বাদ দেওয়া যায় না। গান্ধারীর বিলাপ না থাকিলে ভারতকাব্যের অংগহানি হইবে। এই অংশকে উত্তরভারতের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ গান্ধারীর বিলাপ অংশে যে অনুপম কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা রচনা করা শান্তিপর্ব বা অনুশাসনপর্বের রচয়িতার সাধ্যাতীত ছিল। ভারতকাব্যের মধ্যে স্ত্রী-পর্বকে স্থান দিলে আর একটি পর্বকে বাদ দিলে সমান সমান ভাগ হয়। প্রায় সকল পণ্ডিতই বলেন যে, বনপর্বের অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত; যেটুকু প্রক্ষিপ্ত নয় সেই সামান্য অংশটুকু বিরাট পর্বের অন্তর্ভুক্ত করিলে বাকিটা উপাখ্যানপর্ব নামে উত্তরভারতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিভাগে কাহারও আপত্তি থাকিলে বলিতে হয় যে, পূর্বভারত দশপর্ব আর উত্তরভারত অষ্টপর্ব।

শান্তিপর্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত আট পর্ব যে সমগ্রভাবে প্রক্ষিপ্ত ইহা অনেকের মত হইলেও মহাত্মা তিলক ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে বর্তমান মহাভারত এক হাতের লেখা—অবশ্য ইহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত যে এক হাতের লেখা নয় প্রমথ চৌধুরী তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

গীতা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত কি না তাহা বিচার করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, গীতা পূর্বভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভূত, উত্তরভারতের

নয়। সুতরাং গীতা ভারতকাব্যের অঙ্গ না পরগাছা সেইটুকুই কেবল বিচার্য। গীতা কাব্যের রূপ দেখিয়াই আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ইহা ভারতকাব্যের অন্তর হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে।—আদিপর্বে ভীষ্মপর্বকে বিচিত্র পর্ব বলা হইয়াছে। এই পর্বের এই বৈচিত্র্যের কারণ এই যে, ইহাতে যুদ্ধপ্রসঙ্গ বাদেও বহুপ্রকার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ আছে।

ব্যাখ্যা

(১) মানচিত্রের সঙ্গে মনচিত্রের কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মহাভারতের বিরাট কলেবরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করে থাকেন। তাঁহাদের কাছে হোমারের ইলিয়াড কাব্যই মহাকাব্যের আদর্শ মাপ।

তবে গ্রীস দেশ ভারতবর্ষের তুলনায় অত্যন্ত ছোটো। ভারতের দেশগত আয়তন যখন গ্রীসের তুলনায় প্রকাণ্ড, তখন মহাভারত মহাকাব্যের আয়তন যে গ্রীসের মহাকাব্য ইলিয়াডের আয়তনের তুলনায় প্রকাণ্ড হইবে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে বলিয়া প্রমথ চৌধুরী একটি সরস যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

অবশ্য পরবর্তী অংশেই তিনি এই যুক্তি যে সংগত নয় তাহা বলিয়াছেন। ভৌগোলিক নিয়মানুসারে কাব্যের দেহ সংকুচিত ও প্রসারিত হয় না। মানুষের মন তাহার দেহের মাপে ছোটো বা বড়ো হয় না। সুতরাং কাব্যের মাপ যে দেশের মানচিত্রের অনুপাতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। সুতরাং ভারতের মানচিত্র অর্থাৎ ভৌগোলিক আয়তন গ্রীসের ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় বৃহত্তর বলিয়াই যে মহাভারত ইলিয়াডের চেয়ে বৃহত্তর এমন কোনো কারণ থাকিতে পারে না। ইহার কারণ অন্যত্র দেখিতে হইবে।

(২) মহাভারত নামক মহাবৃক্ষের সৌপ্তিকপর্ব হচ্ছে প্রসূন, আর শান্তিপর্ব মহাফল। ফুল যখন ফলে পরিণত হয়, তখনই তা কাব্যের বহির্ভূত হয়ে পড়ে।

মহাভারত মহাকাব্যটির মধ্যে একাধারে কাব্য ও বিশ্বকোষ আছে। প্রমথ চৌধুরী এই কাব্যের সৌপ্তিক পর্ব পর্যন্ত কাব্য এবং তাহার পরবর্তী অংশকে বিশ্বকোষ অর্থাৎ জ্ঞানমূলক অংশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মহাভারতের এই পূর্বাংশে কাব্যগৌরব বর্তমান—কাব্যত্বই এই অংশের প্রধান কথা। আর এই কাব্যের শেষাংশ জ্ঞানগর্ভ কথায় পরিপূর্ণ—তাহার মধ্যে কাব্যগত অর্থাৎ রসগত সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

স্বীয় মতের পরিপোষণ করিবার জন্য প্রমথ চৌধুরী আদিপর্বের একটি শ্লোকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আদিপর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সৌপ্তিকপর্ব মহাভারত মহাবৃক্ষের ফুল এবং শান্তিপর্ব এই বৃক্ষের ফল। কাব্যকে ফুলের সহিত তুলনা করা হয় এবং দর্শন প্রভৃতির আলোচনাকে ফলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ফুল যখন ফল হইয়া পড়ে তখন তাহার পুষ্পত্ব আর থাকে না। কাব্য যখন জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভে পরিণত হয় তখন তাহার কাব্যত্ব থাকে না। শান্তিপর্বে জ্ঞানকাণ্ডের প্রচুর উপকরণ আছে কিন্তু তাহাতে কাব্যত্ব নষ্ট হইয়াছে। ইহা মহাভারতের বিশ্বকোষ অংশ।

ভারতচন্দ্র

"সম্প্রতি কোনো সমালোচক আবিষ্কার করেছেন যে, আমি হচ্ছি এ যুগের ভারতচন্দ্র।"—এই উক্তিটি লেখক যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও। সমালোচকের এই উক্তিটি সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?

প্রমথ চৌধুরী সমালোচকের এই উক্তিটি তাঁহার নিন্দা না ভারতচন্দ্রের প্রশংসা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা যদি তাঁহার নিন্দার

হয় তাহা হইলে ভারতচন্দ্র সে নিন্দার ভাগী নন; আর ইহা যদি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা হয় তাহা হইলেও তিনি সে প্রশংসার উত্তরাধিকারী নন। সম্ভবত সমালোচকের এই উক্তিটি ভারতচন্দ্রের ব্যাজস্তুতি অর্থাৎ প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা। তবে লেখক বর্তমানে যে নিন্দা-প্রশংসার ভাগী ভারতচন্দ্র সেরূপ নিন্দা-প্রশংসার বহির্ভূত। কারণ ভারতচন্দ্রের পর প্রায় এক শত আশি বৎসর পার হইয়া গিয়াছে অথচ আমরা তাঁহার সাহিত্য লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি। অথচ বর্তমান কালের লেখকদের মধ্যে কয়জন এক শত আশি বৎসর পরে স্মরণীয় হইবেন? প্রমথ চৌধুরী মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে; অপর দুই চারি জনের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠাগত হইবে। বাদ বাকি সকলেই বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া যাইবে। ভারতচন্দ্রের সময়কার সভ্যতার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, অথচ ভারতচন্দ্র আমাদের দেশের লোকের জীবনে ও মনে চিরজীবী হইয়া আছেন। যথার্থ সমালোচনা নিন্দা বা প্রশংসা করা নয়, তাহার অর্থ এই অমরত্বার কারণ অনুসন্ধান করা।

সকল দেশের সাহিত্যেই এমন দুই একজন লেখক থাকেন যাঁহারা যুগপৎ বড়ো লেখক ও দুষ্ট লেখক বলিয়া প্রখ্যাত—ভারতচন্দ্রেরও এই দুর্নাম আছে। অনেকে বলেন যে, বিলাসের মধ্যে তাঁহার জীবন ডুবিয়া থাকায় তাঁহার কাব্যে উৎকট বিলাসের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার প্রমথ চৌধুরীর সমালোচক জীবনকে ট্র্যাজেডি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরী নিজের জীবনকে ট্র্যাজেডি বলিতে চাহেন না কারণ তাঁহার ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে। সমালোচক যদি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনকে ট্র্যাজেডি বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে বলিতে হয় যে, মানুষ মাত্রেরই জীবন ট্র্যাজেডি। ভারতচন্দ্রের জীবন যে কত দুঃখপূর্ণ ছিল তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যেই পাওয়া যায়।

আমাদের মনে হয় ভারতচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে যেখানে সাদৃশ্য

আছে তাহা প্রমথ চৌধুরী ধরিতে পারেন নাই। প্রমথ চৌধুরীর রচনার মধ্যে যে উজ্জ্বল ও সরস বাগ্‌ভঙ্গি ও স্মরণীয় সুভাষিত বাক্য আছে তাহা ভারতচন্দ্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রমথ চৌধুরী ও ভারতচন্দ্র আধার দুইটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রকাশগত এবং হয়তো মননভঙ্গিগত একটা সাজাত্য বর্তমান। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় যে উজ্জ্বল রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, একমাত্র ভারতচন্দ্রের রচনা ব্যতীত অন্য কোথাও তাহার সন্ধান মেলে না। উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণনগরের সংস্কৃতির ছাপ যে রহিয়াছে তাহাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রমথ চৌধুরী এ কালের ভারতচন্দ্র এরূপ উক্তির সার্থকতা না থাকিলেও প্রমথ চৌধুরী ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে যে সাদৃশ্য বর্তমান এ কথা বলা অসংগত হইবে না।

• প্রমথ চৌধুরী যে জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও।

কোনো সমালোচক বলিয়াছেন যে, ভারতচন্দ্র উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে ও ভূসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী এ ভাবে লেখকের জাতি ও বিত্তের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ লেখকের প্রতি অনুচিত কটাক্ষ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মনে হয় যে, এরূপ উক্তির লক্ষ্য এই যে, ভারতচন্দ্র বিত্তবান্ ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সাহিত্য চর্চা তাঁহার কাছে বিলাসের অঙ্গমাত্র ছিল। তিনি যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহা বিলাসী সমাজের প্রিয়। তাহার মূলে যে তাঁহার নিজের বিলাসবৈভবপূর্ণ জীবন বর্তমান ইহাই এইরূপ উক্তির উদ্দেশ্য।

কিন্তু ভারতচন্দ্রের জীবন আদৌ বিলাসপূর্ণ ছিল না। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূরস্তুট পরগণার অধিপতি হইলেও বর্ধমান রাজের সহিত বিবাদের ফলে তিনি সর্বস্বান্ত হন। পিতার নিঃস্ব অবস্থার জন্য বিদ্যাশিক্ষার তেমন সুবিধা না হওয়ায় তিনি মাত্র এগারো বছর বয়সে বাড়ি হইতে

পলাইয়া মাতুলালয়ে গমন করেন। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়া তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে পেঁড়োয় ফিরিয়া আসেন ও এই সময় তাঁহার বিবাহ হয়।

ফারসি না শিখিয়া সংস্কৃত শেখার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁহাকে ভৎর্সনা করায় তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া দেবানন্দপুর গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র মুনশির আশ্রয়ে থাকিয়া বহু পরিশ্রম করিয়া ফারসি ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। দিনে একবার মাত্র স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তিনি তাহাই দুই বেলা খাইতেন— অনেক দিন বেগুন পোড়া ছাড়া আর কিছুই জুটিত না। এই খানেই তিনি প্রথমে কবিতা রচনা করেন। ফারসি ভাষায় শিক্ষিত হইয়া কুড়ি বছর বয়সে বাড়ি ফিরিলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া বর্ধমানের রাজধানীতে তাঁহাদের হইয়া দরবার করিতে পাঠান। কিন্তু রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে তিনি বর্ধমানে কারারুদ্ধ হন, পরে কারাধ্যক্ষের অনুগ্রহে পলায়ন করিয়া কটকে মারাঠা সুবেদার শিবভট্টের আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন। ইহার পর তিনি পুরীতে বৈষ্ণবদের সহিত থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ করেন এবং ভক্তিমান্ বৈষ্ণব হইয়া ধর্মচিন্তায় কাল কাটান। বৃন্দাবন দর্শন করিবার জন্য পদব্রজে পুরী হইতে যাত্রা করিবার সময় পথে তাঁহার শ্যালীপতি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর তিনি প্রথমে ফরাসডাঙার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর এবং পরে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অন্নদামঙ্গল শোনাইলে তিনি তাঁহাকে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শেষ জীবন যে আরামে কাটে নাই তাহা তাঁহার নাগাষ্টক হইতে অনুধাবন করা যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতচন্দ্র রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও এগারো বৎসর বয়সে পরভাগ্যোপজীবী হন, এগারো হইতে কুড়ি বৎসর

পর্যন্ত পরান্ন ভোজন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন, আত্মীয়দের জন্য দরবার করিতে গিয়া কারারুদ্ধ হন, কারা হইতে পলায়ন করিয়া দেশত্যাগী হইয়া মারাঠাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, গার্হস্থ্যাশ্রমে ভূস্বামী বা রাজার অধীন হইয়া কাব্যরচনা করেন এবং শেষ জীবনে রাজকর্মচারীদের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন। সুতরাং ভারতচন্দ্রের জীবন যে বিলাসে কাটে নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বস্তুত তাঁহার আবির্ভাব-কালে সারা দেশের মধ্যে একটা ঘোরতর বিপর্যয় চলিয়াছে। ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন 'ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।' চাঁদ হাতে আসুক আর নাই আসুক, অনেকের ভাগ্যেই ক্ষণে হাতে দড়ি পড়িত। তাঁহাকে যে দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে এ যুগে তাহা একরূপ কল্পনার অতীত।

এই প্রতিকূল অবস্থায় মানুষের মন বিষাক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু এত দুঃখ সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের মনের প্রসন্নতা বিন্দুমাত্র কমে নাই। স্ত্রীর মুখ দিয়া পতি-নিন্দায় ভারতচন্দ্র আপনার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন,

তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র জোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
নানা শাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে কত বলে বলিহারি তার॥
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদের প্রভু॥

ইহা তাঁহারই আত্মকথা। এই কথা শুনিয়া আমরা জানিতে পারি যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হইয়াও তাঁহার দারিদ্র্য দূর হয় নাই এবং দারিদ্র্য তাঁহার

মনের আনন্দকে খর্ব করে নাই, তিনি 'প্রমোদের প্রভু'ই ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার মন ব্যবহারিক জীবনের সুখদুঃখের উপরে বিরাজ করিত। যথার্থ শিল্পীর মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত—বিষয়ের কামনায় তাহা বদ্ধ হইতে পারে না। ব্যবহারিক জীবনের সুখদুঃখকে অতিক্রম করার মধ্যে যে বীরত্ব আছে ভারতচন্দ্র তাহার অধিকারী।

ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল, সত্যনারায়ণের পুঁথি প্রভৃতিতে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন এবং লোকমুখে তাঁহার সম্বন্ধে যে সব কিম্বদন্তী প্রচলিত তাহা হইতেই কবি ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্রের জীবনচরিত রচনা করেন। সেই জীবনচরিত অবলম্বন করিয়াই পরবর্তীকালের লেখকরা ভারতচন্দ্রের জীবনেতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী সেই ইতিহাসটির পরিচয় দিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহার কাব্যের দোষ-গুণের মূলে তাঁহার চরিত্র নাই। তাঁহার কাব্যের চরিত্র যাহাই হোক না কেন, তাঁহার নিজের চরিত্র ছিল সুদৃঢ়। দ্বিতীয়ত, তাঁহার দুঃখময় জীবনের ছায়া তাঁহার কাব্যে কোথাও পড়ে নাই। ভারতচন্দ্র একজন প্রকৃত কবি। সুতরাং তাঁহার কাব্যের বিচার করিতে হইলে তিনি যে রাজার ছেলে ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ বা কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত এইসব কথা আমাদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে হইবে।

প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের কাব্যের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও।

প্রমথ চৌধুরী নিজে লেখক হিসাবে ভারতচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করিয়াছেন।—ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে একাধিকবার বলিয়াছেন, 'ভারত সরস ভাষে'। কথাকে একই সঙ্গে সরল ও সরস করিয়া বলিবার চেষ্টা একমাত্র সাহিত্যিকরাই করিয়া থাকেন। স্বভাবদোষে কাহারও কাহারও রচনায় বিরস ও কুটিল কথা বাহির হয় এই মাত্র। প্রমথ চৌধুরী নিজেও যে সরল ও সরস ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভাষা ব্যাপারে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগরে বাল্যকালে দশ বৎসর বাস করেন; ফলে এখানকার প্রসাদে তাঁহার ভাষায় সরলতা ও সরসতা যুগপৎ স্থান পাইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে যে গুণ বর্তমান তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

পড়িয়াছি সেই মত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

ভারতচন্দ্র যাহা পড়িয়াছিলেন তাহা লিখিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যে 'বুঝিবারে ভারি' হইবে তাহা তিনি জানিতেন। পড়া জিনিস সেইভাবে লেখার মধ্যে প্রসাদগুণ বা রস থাকে না, থাকে কেবল পাণ্ডিত্য। ভারতচন্দ্র প্রচুর পড়িয়াছিলেন—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলংকার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।

কিন্তু 'যেই মত' পড়িয়াছিলেন সেই মত যে লেখেন নাই তাহা অনুধাবন করিলে সাহিত্যের ধর্ম যে কী তাহা আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রসাদগুণ যে অপূর্ব তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন। কেবল সরলতা বা সহজবোধ্যতাই প্রসাদগুণের লক্ষণ নয়। প্রসাদগুণ ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ। তাঁহার অন্তরে বাংলা ভাষার যে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার পরিচয় দেয়। তাঁহার পূর্বে তাঁহার মতো সরল ও তরল ভাষা আর কেহ লেখেন নাই।—প্রসাদগুণ ভাষার গুণ, কিন্তু ভাষা ছাড়া ভাব নাই। প্রসাদগুণ প্রকৃত পক্ষে মনেরই আলোক।

ভারতচন্দ্র চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাব্যে প্রসাদগুণ থাকিবে এবং তাহা রসাল হইবে। কিন্তু তাঁহার কাব্যে যে রস তাহা এ যুগে অস্পৃশ্য, কারণ তাহা আদিরস। অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীল বলিয়া পরিচিত। তাঁহার গোটা কাব্য না হোক, তাঁর কাব্যের অনেক অংশ যে অশ্লীল, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই অশ্লীলতা সম্পর্কে ভারতচন্দ্রও অবহিত ছিলেন, সেইজন্য তিনি কাব্যের অশ্লীল অংশগুলি অলংকারে ও সাধুভাষায় আবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু অপর অনেক বাঙালী ও সংস্কৃত কবির রচনায় অশ্লীলতা আছে। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে অশ্লীলতা আছে তাহা ভারতচন্দ্রকে ছাপাইয়া যায়। ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা আবৃত করার চেষ্টা আছে, ঐ কাব্যগুলিতে অশ্লীলতা অনাবৃত। ইহা সত্ত্বেও বিশেষ করিয়া ভারতচন্দ্রই যে অশ্লীলতার জন্য অপবাদভাগী তাহার কারণ এই যে প্রথমত, ভারতচন্দ্রের কাব্য যতটা সুপরিচিত অপর কোনো কবির কাব্য ততটা নয়; দ্বিতীয়ত, তিনি শিল্পকলার সাহায্যে অশ্লীলতাকে ঢাকা দিতে যাওয়াতেই তাঁহার কাব্যে অশ্লীলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে এই অশ্লীলতা গম্ভীর নয়, সহাস্য।

ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস আদি রস নয়, হাস্য রস। এই রসের উৎস মস্তিষ্ক ও মন। বাংলার প্রাচীন কবিদের মধ্যে এই রস বর্তমান। হাসি সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত হইলেও সাহিত্যের হাসি মনের হাসি—ইহা সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই হাস্যরসকে অনেক বিরূপ সমালোচক জঘন্য বলিয়াছেন। কিন্তু কাব্যের মূলগত রসের দিক হইতে বিচার করিলে এই হাস্যের প্রতি বিমুখতা থাকে না। যে হাসাইতে পারে সে যে ইতর এ ধারণা এ দেশে নাই।

ব্যাখ্যা

(১) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের হিস্টরি লেখা হয়েছে, কিন্তু এখনও সে সাহিত্যের জিয়োগ্রাফি লেখা হয় নি।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত এ দেশে বেশি দিন হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বর্তমান শতাব্দীতেও অল্প যে কয়জন প্রাচীন বাংলা সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বাংলা সাহিত্যকে সমালোচকের দৃষ্টিতে বা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কালানুক্রমিক ভাবে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের রচনা হইতে বিভিন্ন কালে বাংলা সাহিত্যের রূপ কী রকম ছিল তাহার পরিচয় আমরা পাই।

কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার আর একটি যে দিক আছে, ভারতচন্দ্রের ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া প্রমথ চৌধুরী তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা সাহিত্যের ভূগোল। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব সাহিত্য রচিত হইয়াছে সেগুলির উপর ঐসব অঞ্চলের প্রভাব বর্তমান। কালের দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যকে যেমন বিভক্ত করা হয় স্থানের দিক দিয়াও তেমনই বিভাগ করা উচিত। বাংলা সাহিত্যকে এখনও ঐ ভাবে ভাগ করিয়া সাহিত্যের ভূগোল রচনা করিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

(২) বঙ্গদেশের স্ত্রী-জাতির মুখে পতিনিন্দা এষো ধর্মঃ সনাতনঃ।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের সমালোচনা করিতে গিয়া অনেক সমালোচক তাঁহার কাব্যের কুরুচির তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতচন্দ্রের রচনায় এমন অনেক জিনিস আছে যাহা শালীনতার বিরোধী এবং সাহিত্যের উপাদান হইবার যোগ্য নয়।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দর রাজার প্রহরীদের হাতে বন্দী হইবার পর

তাহার স্বরূপ দেখিয়া নারীদের পতিনিন্দার বর্ণনা আছে। এই পতিনিন্দা তাঁহাদের নিকট অসহ্য বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে যে অশ্লীলতা আছে তাহার কথা বাদ দিলেও তাহার মধ্যে যে বিদ্রূপ আছে তাহাই নাকি পুরুষের পক্ষে পীড়াদায়ক।

কিন্তু পতিনিন্দা কেবল ভারতচন্দ্রের কাব্যেই সর্বপ্রথম স্থান পাইয়াছে তাহা নয়। তাঁহার পূর্ববর্তী বহু কবির রচনায়, এমন কি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও পতিনিন্দার পরিচয় পাই। সুতরাং বাংলাদেশের স্ত্রীজাতি সনাতনকাল হইতেই যে পতিনিন্দা করিয়া আসিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, নতুবা তাহা যুগ যুগ ধরিয়া সাহিত্যে স্থান পাইত না।

উক্তিটির মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর সরস ব্যঙ্গনিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা

সাধুভাষা ও চলিতভাষা প্রসঙ্গে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া প্রমথ চৌধুরী যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রমথ চৌধুরীর মনে পড়িয়াছে যে, ললিতবাবু তাঁহার সতীর্থ। একই যুগে একই বিদ্যালয়ে একই শিক্ষা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের মনের ভাবের মধ্যে মিল থাকা আশ্চর্য নয়। বোধ হয় সেই জন্যই ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর একটি প্রবন্ধের সহিত ঐ প্রবন্ধটির কেবল নামের নয়, মতামতেরও অনেকটা মিল

আছে—এমন কি কোনো কোনো স্থলে তাঁহারা একই যুক্তি প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ললিতবাবু বলিয়াছেন যে, যাঁহারা সাধুভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী তাঁহারা যখন বাধ্য হইয়া চলিত শব্দ ব্যবহার করেন তখন তাহা উদ্ধরণ চিহ্নের মধ্যে রাখেন--যেন শব্দটা অপাংক্তেয়, সাধুভাষার শব্দগুলির যাহাতে স্পর্শদোষ না হয় এই জন্যই সতর্কতা। প্রমথ চৌধুরীও তাঁহার পূর্ব প্রবন্ধে বাংলা কথাকে সাহিত্য সমাজে জাতিচ্যুত করিবার বিপক্ষে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা উভয়েই মাতৃভাষার উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তবে ললিতবাবু তাঁহার প্রবন্ধে সাধুভাষার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সব কথা বলিবার আছে বা যাহা সচরাচর বলা হইয়া থাকে তাহা একত্র সন্নিবেশ করিয়া পাঠকের সম্মুখীন করিয়াছেন। তিনি পূর্বপক্ষের মতামত বিচার করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার কোনো চেষ্টা করেন নাই। অপরপক্ষে প্রমথ চৌধুরী পূর্বপক্ষের যুক্তিগুলি যে অসার তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ললিতবাবু সমস্যাটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এবং প্রমথ বাবু মীমাংসার দিকে নজর দিয়াছেন। ললিতবাবু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে চাহিয়া বাংলা ভাষার দিকেই তাঁহার ঝোঁক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই ঝোঁক সামলাইয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী সেই ঝোঁক সামলাইতে চাহেন নাই। ললিতবাবু বিচার করিয়া কোনো সিদ্ধান্তে পৌছিতেও সংকুচিত হইয়াছেন।

অপর পক্ষে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের পক্ষে যাহা শ্রেয় তাহার জন্য ওকালতি করা কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। তিনি কেবল মত প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আপনার মত অনুসারে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।—সবদিক রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিজেকে রক্ষা করা। আমরা সামাজিক জীবনে সেই কাজ করিয়া থাকি। কিন্তু জীবনেও যেমন

সাহিত্যেও তেমনই কোনো একটা বিশেষ মত বা ভাবকে প্রাধান্য দিতে না পারিলে যত্ন ও পরিশ্রম সবই নিরর্থক হইয়া যায়।

যখন এ দেশে লিখিবার একটা বিশেষ রীতি সাহিত্যে প্রচলন করিতে হইবে তখন আমাদের একটা কোনো দিক অবলম্বন করিতেই হইবে—কারণ এক সঙ্গে দুই পথে চলা সম্ভব নয়। যখন দুইটি পথই জানা আছে তখন নির্জীব হইয়া থাকার কোনো সার্থকতা নাই। সাহিত্যসেবী নির্জীব হইবেন না।

ললিতবাবু বলিয়াছেন যে, সাধুভাষা ও চলিতভাষা সমস্যার মীমাংসা করিতে গেলে দুইয়েরই অর্ধেক ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু সাহিত্যে সাধুভাষার অধিকারের কোনো যুক্তিসংগত কারণ নাই বলিয়া প্রমথ চৌধুরী মনে করেন। বাংলা গদ্যের শৈশব অবস্থায় সাধুভাষা বাংলা সাহিত্যকে অন্যায়ভাবে দখল করিয়া বসিয়া আছে। যাঁহারা সাধুভাষার পৃষ্ঠপোষক তাঁহারা বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তিতে কান দেন না, কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, বহুকাল ধরিয়া সাহিত্যে সাধুভাষা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং চলিত ভাষাকে এখন আর সাহিত্যে প্রচলিত করা যায় না। এ অবস্থায় মাঝামাঝি অবস্থা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে কোনো লাভ হইবে না।

এ সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার প্রধান অন্তরায় এই যে, পূর্বপক্ষের বক্তব্য বিষয় যে কি তাহা আমরা জানিতে পারি না। সমাজে কোনো একটি রীতি যদি বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতে থাকে তাহা হইলে তাহা পরে আপনার ঝোঁকের বশেই চলে। যাহা প্রচলিত তাহার জন্য কোনোরূপ কৈফিয়ত দেওয়া কেহ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। অধিকাংশ লোকের পক্ষে যাহা চলিতেছে তাহার চলাটাই তাহার চলার পক্ষে অকাট্য যুক্তি। যাঁহারা মাতৃভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া গণ্য করেন, তাঁহারা অবশ্য খাঁটি বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রস্তাব একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহেন।

সাধারণত লোকের এই বিশ্বাস যে, প্রচলিত আচার-ব্যবহারকে যাচাই

করিয়া নেওয়ার মধ্যে বিপদ আছে, কারণ বুদ্ধি মাত্রই প্রলয়ংকরী। সমাজ সম্পর্কে এ মতের সার্থকতা থাকিলেও সাহিত্য সম্বন্ধে আদৌ নাই। কারণ যে রচনার মধ্যে মানবমনের পরিচয় পাওয়া যায় না তাহা সাহিত্য-পদবাচ্য নয়। সুতরাং ললিতবাবু পূর্বপক্ষের মত লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টিকে আলোচনার যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়া সাধু ভাষার পক্ষে দুইটি যুক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। একটি, 'সাধু ভাষা আর্টের অনুকূল'; অপরটি 'চলিত ভাষার অপেক্ষা সাধু ভাষা হিন্দুস্থানী মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় লোকদের নিকট অধিক সহজবোধ্য।'

আর্টের দোহাই দেওয়া যে অসার তাহা আলোচনা করা প্রমথ চৌধুরী নিস্প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। এ দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে, যুক্তি যখন দাঁড়াইতে পায় না তখন তাহা বড়ো বড়ো কথার অন্তরালে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করে। কারণ যে বিষয়ে কাহারও স্পষ্ট ধারণা নাই সে বিষয়ে আলোচনা করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, কারণ তাহাতে বক্তৃতার অসারতা অল্পলোকই বুঝিতে পারেন। সাধু ভাষা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর প্রধান অভিযোগ এই যে, ঐরূপ কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোনো স্থান নাই। এ বিষয়ে এই কথা মনে রাখাই যথেষ্ট যে 'রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা।' লেখায় সেই গুণটি আনা আর্টহীন লেখকের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয় যুক্তিটিও অকিঞ্চিৎকর। বাংলা ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ চালাইয়া সাধুভাষা রচনা করিলে তাহা যে ভবিষ্যতে ভারতের এক ভাষা হইয়া উঠিবে এরূপ ধারণা অমূলক। ভারতের ভবিষ্যৎ সভ্যতা যে আকারই ধারণ করুক না কেন, তাহা কোনো দিনই একাকার হইয়া যাইবে না। ভারতের ঐক্যকে সর্বত্র একভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার বিভিন্ন অংশকে স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইলে তাহার স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাইবে।

প্রমথ চৌধুরীর মত অনুসারে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ও বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা' নামক প্রবন্ধে পণ্ডিতি বাংলার উপর বিশেষ বিরাগ পোষণ করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীও সেই রকম রচনা পদ্ধতির বিশেষ পক্ষপাতী নন। তবে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের স্বপক্ষে তিনি বলেন যে, তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ভুল অর্থে প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহাদের রচনায় সংস্কৃত প্রয়োগ মিষ্ট না হইলেও দুষ্ট হয় নাই। প্রবোধ-চন্দ্রিকা পুরুষ-পরীক্ষা পড়িয়া আমাদের বাংলার জ্ঞান বাড়ে না বটে, কিন্তু সংস্কৃতের জ্ঞান কমে না। প্রবোধ-চন্দ্রিকার রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার সুপণ্ডিত ও সুরসিক ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার গল্প বলিবার শক্তিও ছিল অসাধারণ। ললিতবাবু পুরুষ-পরীক্ষার ভাষাকে 'শব্দাড়ম্বরময় জড়িমা জড়িত ভাষা' বলিয়াছেন—প্রমথ চৌধুরী এ বিষয়ে একমত নন। তাঁহার মতে এই গ্রন্থের ভাষা নদীর জলের মতো বেগবান্। প্রবোধ চন্দ্রিকার পূর্বভাগের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন বটে, কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সরসতা আছে।

রামমোহন রায় বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের রচনার দোষ ধরা সহজ তবে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, তাঁহারাই বাংলাভাষার প্রথম গদ্যলেখক। তাঁহাদের বাংলা গদ্যের রচনা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা শব্দ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হন নাই, অন্বয় লইয়াই তাঁহাদের বিব্রত হইতে হইয়াছিল এবং কী ভাবে অন্বয় করিতে হয় রামমোহন তাহা বলিয়া দিয়াছেন। রামমোহনের গদ্য আমাদের নিকট একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়—ইহার কারণ এই যে, তাঁহার বিচার-পদ্ধতি ও তর্কের রীতি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের অনুরূপ। আমরা সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজি গদ্যের রচনারীতি অনুসরণ করি। রামমোহনের ভাষায় বাগাড়ম্বর বা সমাসের প্রাচুর্য নাই, তাহাতে সংস্কৃতের বাহুল্যও নাই।

বিদ্যাসাগরের গদ্য আমরা আদর্শ গদ্য হিসাবে দেখি, তাহার কারণ এই

যে, তিনিই প্রথম প্রাঞ্জল গদ্য রচনা করেন। সে ভাষার মর্যাদা সংস্কৃত-বহুলতার উপর নয়, তাহার গৌরবের কারণ তাহার বাগ্‌ভঙ্গি। রামমোহন রায়ের ভাষার সহিত বিদ্যাসাগরের ভাষার তুলনা করিলে দেখা যাইবে বিদ্যাসাগরের ভাষা অন্বয়ের গুণেই সুখপাঠ্য হইয়াছে।

এই সব কারণে প্রমথ চৌধুরী পণ্ডিতি ভাষার বিরোধী নন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা বাংলা ভাষার অনেক উপকার করিয়াছেন। বিশেষত বর্তমানে কোনো লেখক যখন সে ভাষার অনুসরণ করেন না তখন তাহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবার কোনো কারণ নাই। নব্য লেখকরা ইংরেজি বাক্য ও পদকে যেমন তেমন ভাবে অনুবাদ করিয়া যে কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই সবচেয়ে ক্ষতিকর। এই ভাষার হাত হইতে উদ্ধার না পাইলে বাংলা সাহিত্যের অকালমৃত্যু হইবে। এই কৃত্রিম ভাষার প্রভাব এড়াইতে হইলে মৌখিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। সুতরাং আমাদের আলালি ভাষার শোধন করিতে হইবে। বাবু বাংলার কোনোরূপ সংস্কার করা যায় না কারণ তাহা বিকারমাত্র।

আমাদের রচনায় আরবি, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশী শব্দের ব্যবহার যে কতদূর সংগত সে সম্পর্কে ললিতবাবুর সিদ্ধান্ত এই যে, বাংলা ভাষায় এক সময়ে যে আরবি, ফারসি প্রভৃতি শব্দ ঢুকিয়াছে এবং বর্তমানে যে ইংরেজি শব্দ ঢুকিতেছে তাহা প্রাকৃতিক নিয়ম; সকল ভাষাতেই এইরূপ হইয়া থাকে।—প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোনো লাভ নাই। যে সকল বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, সেগুলিকে কথার মতো লেখাতেও ব্যবহার করা উচিত। যদি কোনো লেখক শব্দের উৎপত্তি বিচার করিয়া সেটিকে জোর করিয়া সাহিত্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে চান তাহা হইলে তিনি ঠকিবেন, কারণ, তাহাতে ভাষাকে কেবল অকারণে সংকীর্ণ করিয়া ফেলা হইবে। প্রমথ চৌধুরী এবিষয়ে ললিতবাবুর সহিত একমত। এই প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, বাংলা ভাষা বাঙালী

হিন্দুর ভাষা; এদেশে মুসলমানের আগমনের বহুবৎসর পূর্বে বাংলাভাষা প্রায় বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার বলিয়াছেন যে, অন্যান্য প্রদেশের ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার উৎকর্ষ বেশী, কারণ এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য আছে। সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলা ভাষার সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ব্যাকরণবিদ্‌দের মতে ভাষা-শব্দ তিন প্রকার, তজ্জ (= তদ্ভব), তৎসম ও দেশ্য (দেশী)। বাংলা ভাষায় তজ্জ ও তৎসম শব্দের সংখ্যাই বেশি, দেশ্য শব্দের সংখ্যা অল্প আর বিদেশী শব্দের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য।

এ হিসাবে বাংলা ভাষা ফরাসি ভাষার সহিত তুলনীয়। ল্যাটিন ভাষার সহিত ফরাসি ভাষার যে সম্পর্ক, সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলা ভাষার সেই সম্পর্ক। ফরাসি ভাষার শব্দাবলী তেমনই মুখ্যত ল্যাটিন হইতে উদ্ভূত, বাংলা ভাষার শব্দাবলী যেমন মুখ্যত সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। ফরাসি ভাষার উপর অন্য জাতির শব্দের প্রভাব যেমন যৎসামান্য, বাংলা ভাষাতে মুসলমান প্রমুখ জাতির প্রভাবও তেমনই অতি সামান্য।

এই জন্য ফরাসি সাহিত্যের যা গুণ বাংলা সাহিত্যেও তাহা থাকা সম্ভবপর। ফরাসি সাহিত্য অখণ্ড; প্রধানত একটি উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়া ফরাসি ভাষা সরলতা, ঐক্য, প্রাঞ্জলতা ও সংযমে অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা ভাষারও সেই সম্ভাবনা বর্তমান।

সুতরাং যদি আমরা জোর করিয়া বাংলা ভাষায় এমন সব আরবি বা ফারসি শব্দ প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করি যেগুলি ইহার পূর্বে আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া যায় নাই, তাহা হইলে ঐ উপায়ে আমরা বাংলা ভাষাকে বিকৃত করিয়া ফেলিব। সম্প্রতি (১৩১৯ সাল) বাংলা ভাষার উপর ঐরূপ জবরদস্তি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে দেখিয়া প্রমথ চৌধুরী প্রত্যেক বাঙালীকেই সতর্ক করিয়া দিতে চাহেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকের ভাষা

সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার মূল মর্ম এইরূপই। বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকে সংস্কৃত আক্রমণের স্থলে মুসলমান আক্রমণের কুফল অতিশয় ঘোরতর হইবে। কারণ, তদ্ভব শব্দের পরিবর্তে তৎসম শব্দ বসাইলে বাংলা ভাষার ধর্ম নষ্ট হয় না, কিন্তু অপরিচিত ও অগ্রাহ্য বিদেশী শব্দকে ভাষার মধ্যে ঢুকাইয়া দিলে ভাষা বিশেষত্ব হারাইয়া কদর্য ও বিকৃত হইয়া উঠে।

ব্যাখ্যা

(১) সাহিত্যসেবী ও অহিফেনসেবী একই শ্রেণীর জীব নয়।

'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐ নামাঙ্কিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ললিতবাবু সাধুভাষা ও চলিতভাষার স্বপক্ষে ও বিপক্ষের মতগুলি একত্র সমাবেশ করিয়া সমস্যাটির স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু মতগুলি বিচার করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট মীমাংসা করিবার প্রয়াস তিনি করেন নাই।

এই প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলিতেছেন যে, কেবলমাত্র সমস্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা সংগত নয়। সাহিত্যে কোনো একটি বিশিষ্ট রীতি যখন প্রচলিত করিতে হইবে তখন সাধুভাষা ও চলিতভাষার একটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। সাধুভাষা ও চলিতভাষা দুইটির সঙ্গেই যখন পরিচয় আছে তখন কোনটিকে অবলম্বন করা শ্রেয় তাহা স্থির করিতেই হইবে। উভয় পথ জানা সত্ত্বেও নির্জীবের মতো চুপ করিয়া বসিয়া থাকার কোনো অর্থ হয় না।

প্রমথ চৌধুরী এখানে মৃদু রসিকতা করিয়া বলিতেছেন যে, সাহিত্যসেবী ও অহিফেনসেবী একই শ্রেণীর জীব নয়। অহিফেনসেবী অহিফেন গ্রহণ করিয়া দিবারাত্র ঝিমায়। কিন্তু সাহিত্যিককে তাঁহার মনকে সদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। কোনো রকম জড়তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যথার্থ সাহিত্যসেবীর পক্ষে শোভা পায় না।

(২) সেই টিনের গোরুর দুধ খেয়ে যারা বড় হয়, মাতৃদুগ্ধ যে তাদের মুখরোচক হয় না, তা আর আশ্চর্যের বিষয় নয়।

'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা' নামক একটি প্রবন্ধে ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাধুভাষা ও চলিতভাষা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। ললিতবাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা করিয়া সাধুভাষার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন; তাঁহার মতে পণ্ডিতি বাংলায় 'কঠোর অস্থিপঞ্জর পাঠ্য-পুস্তক-নির্বাচন-সমিতির বায়ুশূন্য টিনের কৌটায় রক্ষিত।'

প্রমথ চৌধুরী ঐ নামের একটি প্রবন্ধে ললিতবাবুর এই উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, টিনের এই দুধও আসলে নটানো গোরুর দুধ। যে সব পণ্ডিত পণ্ডিতি বাংলা লিখিতেন তাঁহারা অশুদ্ধ ভাষায় লিখিতেন না। অপরপক্ষে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য লেখকরা ইংরেজি বাক্য ও পদকে যেমন তেমন ভাবে অনুবাদ করিয়া এক খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাতে ভাষা দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

এখন যাহারা শিক্ষালাভ করিতেছে তাহারা আশৈশব ঐ বিকৃত ভাষাতেই অভ্যস্ত। ঐ কুভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাদের রুচি এমন বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে তাহারা আর শুদ্ধ বাংলাভাষার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। বরং তাহারা খাঁটি বাংলার প্রতি বিরাগই পোষণ করে।

B. A. Bengali Second Langugae

সমালোচনা

রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ

সংগীতের সহিত কাব্যের একটা মূলগত পার্থক্য আছে। সংগীত ও কাব্য দুই-ই ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত বটে, কিন্তু সংগীত কেবলমাত্র ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়াই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে আর কাব্যের ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা হইতে হয়, সেই ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই কাব্য রূপলাভ করিতে পারে। যে-কোন কয়েকটি ধ্বনিকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করিলে তাহাতে সংগীত হইতে পারে। কিন্তু ভাষা ছাড়া কাব্য একেবারে অচল।

আর এই ভাষাটা একটা নৈর্ব্যক্তিক পদার্থ নয়—তাহার সহিত কেবল ব্যক্তিবিশেষ নয়, বহু ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। তাহা একটা জাতির সম্পত্তি। সেই জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত তাহার সংযোগ অঙ্গাঙ্গী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিকপক্ষে বহু মানবের জীবনধারার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাহার ভাষা।

কবিকে বিশেষ ভাষা অবলম্বন করিতে হয়, সেই ভাষার সহিত তাঁহার সমাজও আসিয়া পড়ে। ভাষা একটা সংকেত মাত্র, তাহার কাজ হইল ভাবকে ফুটাইয়া তোলা। সংকেত না থাকিলে অর্থাৎ ব্যবহৃত শব্দগুলির নির্দিষ্ট অর্থ বুঝাইবার ক্ষমতা না থাকিলে, ভাষা নিছক শব্দসমষ্টি হইয়া পড়ে—তাহার কোনো অর্থই থাকে না। কবি ভাষার মধ্য দিয়া ভাবকেই প্রকাশ করেন—একজনের হৃদয়ের সংবাদকে আর একজনের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়াই কাব্যের কাজ। কবির হৃদয়ের ভাবভাবনা কাব্যের পথ বাহিয়া পাঠক বা শ্রোতার নিকট গিয়া পৌঁছায়।

কবির ভাব নিবেদন কেবল বিবরণময় নয়—তিনি ভাবকে কেবল ব্যক্তই করেন না, তিনি ভাবকে একটা অরূপম রূপ দান করিয়া তাহার প্রতি শ্রোতা

বা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই রূপদান করিতে গিয়া তাঁহাকে জগৎ-টাকেই যেন নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়। বাস্তব জগতের মতোই আর একটা জগৎ তাঁহাকে রচনা করিতে হয়। গীতিকাব্যে এই জগতের একটা সামান্য অংশ পরিব্যক্ত হয় বটে, কিন্তু মহাকাব্যে বা নাটকে জগতের অনুরূপ বিস্তৃততর রূপ ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কবি এই জগতের অনুরূপ আর একটি মায়ালোক তাঁহার কল্পনাবলে সৃষ্টি করেন। নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন বলিয়াই কবিকে কাব্যসংসারের প্রজাপতি বলিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সহিত তুলনা করা হয়।

কবি যে জগৎ সৃষ্টি করেন তাহার মূলে তাঁহার কল্পনা থাকিলেও তাহা আমাদের এই পরিচিত জগতের প্রতিরূপ। কাব্যের মধ্যে যে জীবনের চিত্র প্রকাশিত হয়, তাহার সহিত আমাদের পরিচিত জগতের সাদৃশ্য ও সাজাত্য না থাকিলে তাহা আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। দৈত্যদানব, রাক্ষস-খোক্কস বা ভূত-প্রেতের সহিত আমাদের পরিচয় কেবল কল্পনার, সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয়ের অপেক্ষা মানুষের কথা আমাদিগকে সমধিক আকর্ষণ করে, কারণ মানুষের সহিত আমাদের পরিচয় প্রত্যক্ষ ও বাস্তব। প্রাচীন যুগের মহাকাব্যগুলির মধ্যে আমরা সে যুগের সমাজ ও সভ্যতার একটা পরিচয় পাই। প্রাচীন নাটকগুলির মধ্যেও জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে উপন্যাসের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মধ্যে জীবনের চিত্র স্পষ্টতর রেখায় অঙ্কিত হইতেছে। জীবনের বাস্তব রূপায়ণই এ যুগের সাহিত্যের—সবচেয়ে বড়ো না হইলেও—একটা বড়ো কথা হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিকতার যুগে সাহিত্যের মধ্যে জীবনের পরিস্ফুটনই সাহিত্যের উৎকর্ষের মানদণ্ড বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

বস্তুতঃ, মূলে জীবন ও জগৎ না থাকিলে কাব্য-সৃষ্টি সম্ভবপরই হয় না। মূর্তি নির্মাণ করিতে গেলে মৃৎশিল্পীকে যেমন একতাল কাদামাটি লইতে হয়, কাব্য রচনা করিতে গেলেও কবিকে তেমনই এই প্রকাশমান জগৎ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। বাস্তব জগৎ হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিতে

হয় বলিয়াই যে কবিকে বাস্তববাদী হইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই—পুরাদস্তুর রোমান্টিক কাব্যের মূলেও বাস্তব জগৎ ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। যে সুন্দর মৃন্ময় দেবমূর্তি নির্মিত হয় তাহারও উপকরণের মধ্যে খড়, মাটি, বাঁশ ও দড়ি থাকে। জগৎ ও জীবনের সহিত যে রচনার সম্পর্ক নাই তাহা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনা হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে কাব্য অর্থাৎ রস-সাহিত্য বলা চলে না।

কবির ধর্মই হইল প্রকাশ করা। তিনি কোন্ বস্তুকে প্রকাশিত করিবেন? যাহা তাঁহার জীবনে উপলব্ধ হইয়াছে তাহাকেই তিনি প্রকাশ করিবেন। তাহা ভাববিশেষ হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার প্রকাশ বিবৃতিমাত্র হইবে না। কবিকে তাহা এমনভাবে প্রকাশ করিতে হইবে যাহাতে তাহা রূপে রসে সমৃদ্ধ হইয়া আর একজন সহৃদয় সামাজিকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে। ভাব রূপের কায়া পরিগ্রহ করিয়া রসায়িত হইলেই কাব্য হইয়া উঠিতে পারে।

কবি যদি সৌন্দর্যের একটা বিমূর্ত আদর্শের কথা বলেন তাহা হইলে তাহা বিশেষভাবে আমাদের অন্তরে সাড়া জাগাইতে পারে না। কিন্তু তিনি যদি একটি রক্তপদ্ম বা একটি রমণীয় মুখের কথা বলেন তাহা হইলে তাহা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে। পদ্ম বা মুখের সহিত আমাদের পরিচয় ব্যবহারিক জীবনেই ঘটিয়া থাকে—সেই পরিচয়ের সম্পর্কটি কাব্যে নূতন করিয়া সঞ্জীবিত হয়। কাব্যের মধ্যে মানবীয় ভাবের যে প্রকাশ থাকে তাহার সহিতও আমাদের সম্পর্ক অতি নিবিড়। কাব্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে ভাবের প্রকাশ দেখিয়া যেন মনে হয় 'ইহা আমার, ইহা আমার'—অথচ তাহা যে আমাদের নিজস্ব কাহারও নয়, তাহা যে কাব্যের পাত্রপাত্রীর ভাবের প্রতিফলন এই বোধটাও আমাদের মন হইতে দূর হইয়া যায় না। কাব্যের মধ্যে যে জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা আমাদের পরিচিত জগতের অনুরূপ না হইলে চলে না, অথচ তাহার সহিত আমাদের বাস্তব জগতের যে একটি পার্থক্য রহিয়াছে—উভয়ের মধ্যে যে একটি অন্তরাল রহিয়াছে তাহা বিস্মৃত হইবার উপায় নাই।

কাব্যের মধ্যে যে জগৎকে আমরা দেখিতে পাই তাহা এই বাস্তব জগতেরই অনুরূপ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বাস্তব জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে আদর্শ করিয়া কাব্যের জগৎ সৃষ্টি করিতে গেলে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সাহিত্য আলোকচিত্র নয়—বাস্তব জীবনের অবিকল ফোটোগ্রাফ নয়—জীবনের যথাতথ রূপ অঙ্কন করার দায়িত্ব উহা স্বীকার করে নাই—চিত্রে যেমন অনেক কিছুই বাদ দিয়াও জগতের রূপবিশেষের ভাগবত প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করা হয়, তেমনই কবিও জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মূল ভাবগুলিকে স্বকীয় অনুভূতির আলোকে উজ্জ্বল করিয়া দেখান। কাব্যে যে জগৎ আছে তাহাকে বাস্তব জীবনের সহিত মিলাইয়া দেখা চলে না, সেরূপ প্রয়াসের কোনো প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই। কবি সেই জগৎকে আপনার কল্পনা দিয়াই সৃষ্টি করেন। কাব্যের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে পাঠককে কেবল স্বকীয় দৃষ্টি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে চলে না, কবির দৃষ্টির সহিত পাঠকের দৃষ্টির একটা সমন্বয় বা সংমিশ্রণ অবশ্য প্রয়োজন

কাব্যে তন্ময়তার (objectivity) একটা বিশেষ মূল্য আছে বটে, কিন্তু কোনো কবিই পুরাপুরিভাবে তন্ময় (objective) হইতে পারেন না। জীবনকে পুরাপুরিভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিলেও কবির সৃষ্টিতে তাঁহার স্বকীয় চেতনার স্পর্শ থাকিবেই। সমস্ত সৃষ্টির মূলগত তত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একথা বলা অসংগত হইবে না যে, কাব্যে যে তন্ময়তা থাকে তাহা তন্ময়তার ভান মাত্র—কাব্যমাত্রই মন্ময় (subjective)—বস্তুতঃ, কাব্য কবি-চিত্তের বিবর্ত ব্যতীত আর কি ?

যে জগতে আমরা বাস করি তাহা প্রত্যেকেই একটা না একটা বিশেষ ভঙ্গিতে গ্রহণ করে—কবিও করেন। কিন্তু কল্পনাকুশলী কবি কেবল নিজের অনুভূতি বা উপলব্ধি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, অপরে জগৎকে কীভাবে অনুভব করিতেছে তাহা আস্বাদ করিবার একটা কামনা তাঁহার অন্তরে থাকিয়া যায়। কাব্যের মধ্যে তিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের অনুরূপ আর একটি জগৎ তাঁহার সৃজনী কল্পনা দিয়া গড়িয়া লইয়া তাহার মধ্য দিয়া

জীবনরস বহু বিচিত্রভাবে পান করিতে চান। বাহিরে ঐ কাব্যের জগতের একটা আদর্শ আছে বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু ঐ জগৎ প্রকৃতপক্ষে মায়ার সৃষ্টি, কবির মানসলোকেই উহার উদ্ভব।

বাস্তবিকপক্ষে রস ও কাব্যের জগৎ মায়ার জগৎ—কবির চেতনাই সেই মায়া-জগতের প্রসূতি। আমাদের লৌকিক জগতে সেই রসের মূলগত ভাব বা সেই মূলগত জগতের একটা আভাস দেখা যায় বটে, কিন্তু কাব্যের জগৎ আমাদের লৌকিক জগৎকে অতিক্রম করিয়া একটা কল্পনাগ্রাহ্য আস্বাদমাত্র হইয়া উঠে। স্থূল বাস্তব জগৎ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—আমাদের পরিচিত জীবনকে উপাদান-রূপে গ্রহণ করিয়া সৃষ্ট হইলেও কাব্যের জগৎ ও কাব্যের রস লোকোত্তর বস্তু—তাহার আবেদন ইন্দ্রিয়াতীত চেতনার নিকট—নীলকান্ত মণির দ্যুতির মতো তাহা আপনার উপাদান ও আধারকে অতিক্রম করিয়া যায়।

চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ

"পুরস্কার" নামক প্রসিদ্ধ কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ এক কবির উক্তির মধ্য দিয়া নিজের তরুণ বয়সের সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্যের পরিচয় দিয়া কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন :

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দ লোক করি বিরচন
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে।

জীবনের সব কিছুকে সৌন্দর্য ও মাধুর্য দিয়া ভরিয়া দেওয়াই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের এই পৃথিবীতে মালিন্যের অবধি নাই, দুঃখ-বেদনার অন্ত নাই। তাহারই মধ্যে অলৌকিক আনন্দ ধারা প্রবাহিত

করিয়া দিয়া তিনি এই ধরণীকে স্নিগ্ধমধুর করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি এমন করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন যাহাতে,

সুখ হাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহ সুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে
আরেকটু স্নেহ শিশু-মুখ'পরে
শিশিরের মতো রবে।

রনেবজী মধ্যে এমন করিয়া মাধুর্যের নির্ঝর প্রবাহিত করিয়া দিতে একমাত্র সংগীতই পারে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে সুর নাই—সেখানে কেবল বেসুরাই ধ্বনিত হইতে থাকে—যেটুকু সুর মাঝে মাঝে স্ফুরিত হইয়া উঠে কবি তাহাকেই কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করেন। অসুর ও বেতালের রাজ্যে আমাদের মনের শান্তি রক্ষা করে সুর ও তাল।

পৃথিবীর সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্যই সুরে বাঁধা ছিল

"Thus Nature drove us ; warbling rose
Man's voice in verse ere he spoke in prose."

সাহিত্যের মধ্যে অন্তরের আবেগের স্ফূর্তিই সর্বপ্রথম কথা। সংগীতের মধ্যে কোথাও ভার নাই—তাহা আপনার সুরের পক্ষ বিস্তার করিয়া অসীমের দিকে যাত্রা করে। সাহিত্যের উপাদান যে ভাষা তাহার মধ্যেও এই সুরের বেগ সঞ্চারিত করিয়া দিতে হয়। কবির হৃদয়ে যে ভাবটি অস্পষ্ট নীহারিকার মতো জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাকে গীতোচ্ছ্বাসের অনুরূপ আবেগ দিয়া তারকার মতো ফুটাইয়া তুলিতে হয়। বিষয়বস্তুকে সংগীতের সুরের মতো একটা ভাবধ্বনিময় প্রবাহে পরিণতি দান করিতে পারিলেই সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভবপর। সাহিত্যের প্রধান উপকরণ সংগীত—ইহা কাব্যের প্রাণশক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মানুষের দেহের মতোই একটা স্থূল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া কাব্যের প্রাণ সংগীত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। সুরটুকু যদি নিজেকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাতে সুর-বিস্তারী খেয়াল, বড়ো জোর ধ্রুবপদ পর্যন্ত সৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্য হয় না। এইজন্য জীবন হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সেইগুলিকেই সুরে বাঁধিয়া দিতে হয়। সাহিত্যের মধ্যে একদিকে যেমন আবেগ আছে, সুরের স্পর্শ আছে, অন্যদিকে তেমনই আমাদের পরিচিত জগতের একটি সমুজ্জ্বল চিত্রও তাহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠে। শুদ্ধমাত্র সংগীত হইলে সাহিত্যের প্রতি আমাদের আবেগ একটা বিমূর্ত সৌন্দর্য-পিপাসা ব্যতীত আর কিছুই হইত না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে এই জীবনের চিত্রগুলি থাকায় তাহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের একটা গভীর আকর্ষণ থাকে। সংগীতের মতোই চিত্রও সাহিত্যের একটি প্রধান উপকরণ। সংগীতকে যদি সাহিত্যের প্রাণ বলা যায়, তাহা হইলে চিত্রকে তাঁহার দেহ বলা অসংগত হইবে না।

সংগীত ও চিত্র এই দুইটি মুখ্য উপকরণ লইয়াই সাহিত্য গঠিত। কবির স্বকীয় আবেগ ও জীবন এই দুইটিই সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভবপর করিয়াছে। আমাদের জীবনে ঘটনার অবধি নাই, সাহিত্যকার তাহার মধ্য হইতে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেন। সাহিত্যের বহিরঙ্গ কলা সেই উপাদানকে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করে—সাহিত্যকারের স্বকীয় আবেগ তাহার মধ্যে একটা গভীর সুরপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দেয়।

চিত্র ও সংগীত সাহিত্যের প্রধান উপকরণ হইলেও সাহিত্যে এই দুইটি যে সমভাবে বর্তমান থাকিবে এমন নাও হইতে পারে। বিভিন্ন সাহিত্য-কারের রচনায় সংগীত ও চিত্র বিভিন্ন পরিমাণে প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো সাহিত্যকার তাঁহার কৌতূহলী দৃষ্টি এই জগৎ ও জীবনের দিকে নিবদ্ধ করেন, জীবনের বিচিত্ররূপ তাঁহার কল্পনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাঁহার রচনার মধ্যে চিত্রের প্রাচুর্য দেখা যায়। পরিদৃশ্যমান জগৎ অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া চিত্রসমষ্টিরূপে তাঁহার রচনায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচনার

মূল আকর্ষণ সংগীত নয়, চিত্র।—আবার আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন যাঁহাদের রচনায় চিত্র গৌণ, সংগীতই মুখ্য। চিত্রকরধর্মী সাহিত্যিকের রচনায় এক একটি মনোজ্ঞ চিত্র প্রস্ফুট হইয়া উঠে; সংগীতধর্মী সাহিত্যিকের রচনায় চিত্রের মূল উপাদান রূপের আভাস মাত্র থাকে; কবির আবেগ সেই আভাসমাত্রকে অবলম্বন করিয়াই প্রবাহিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতো আত্মপ্রকাশ করে।

সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীতে কোথাও বা চিত্রের প্রাধান্য আবার কোথাও বা সংগীতের প্রাধান্য। কালিদাস বা কীট্‌সের কবিতায় মনে হয় অনেক স্থলে কবি যেন নিপুণ চিত্রকরের মতো তুলি ও রং দিয়া ছবির পর ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। আবার রবীন্দ্রনাথ বা শেলীর কবিতা মুখ্যত সংগীতধর্মী। কাব্য মূলত সংগীতধর্মী—গীতিকাব্যের মধ্যে চিত্রের আদরমাত্র থাকে, তাহাতে সংগীতের গভীর প্রবাহ বর্তমান। অবশ্য কোনো কোনো কবিতায় সংগীতের মতো একটা সুরপ্রবাহ থাকিলেও চিত্রের প্রাচুর্য সেখানে দেখা যায়। রবীন্দ্র-নাথের মতো সাংগীতিক কবির অনেক রচনাতেও বহুস্থলে সূক্ষ্ম রেখায় অঙ্কিত চিত্র দেখা যায়।—মহাকাব্যের মধ্যে চিত্র ও সংগীত দুইই প্রয়োজন—তবে সেখানে চিত্রকেই প্রধান উপকরণরূপে গ্রহণ করিতে হয়। নাটকের মধ্যেও চিত্রের প্রাধান্য, কারণ নাটক মাত্রেই ঘটনাপ্রধান। কথা-সাহিত্যের মধ্যেও চিত্রই প্রধান উপকরণ। রচয়িতার আবেগ বা ভাবকল্পনার চেয়ে জগৎ ও জীবনের চিত্রই সেখানে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়।

অবশ্য এ কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, চিত্র ও সংগীত সাহিত্যের প্রধান উপকরণ হইলেও তাহাই সাহিত্যের সব কিছু নয়। বিভিন্ন উপাদান লইয়া সুদক্ষ পাচক যেমন উপাদেয় ব্যঞ্জন রন্ধন করেন, সাহিত্যিকও তেমনই চিত্র ও সংগীতকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া সাহিত্য রচনা করেন। ব্যঞ্জনের আস্বাদের মতোই যে রসাস্বাদ সাহিত্যের উৎকর্ষের প্রধানতম লক্ষণ তাহা শুদ্ধমাত্র চিত্র বা সংগীতের মধ্যে নাই। তাহা চিত্র বা সংগীতের অতিরিক্ত একটা পদার্থ। এই অতিরিক্ত পদার্থটি কবির সৃজনী কল্পনা হইতে উদ্ভূত—কবির সৃজনী শক্তি চিত্র ও সংগীতকে উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে

রসোত্তীর্ণ করিয়া তুলিয়া সাহিত্য পদবাচ্য করিয়া তোলে। প্রতিভা সাহিত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া প্রধানতঃ সংগীত ও চিত্রকে অবলম্বন করে এই মাত্র।—তবে কবি চিত্র বা সংগীতকে বাদ দিয়া অপর কোনো বিষয়কে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন না—কোনো তথ্য বা তত্ত্ব সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে না, যদি না তাহা চিত্রে বা সংগীতে পরিণত হইবার যোগ্য হয়। পরিদৃশ্যমান জগতের অংশমাত্র পরিমার্জনা করিয়া চিত্র অঙ্কিত হয়, জীবনের খণ্ডাংশকে কল্পনার তুলি দিয়া অঙ্কন করিলেই তাহা সাহিত্যের উপাদান হইয়া উঠিতে পারে। তেমনই তত্ত্ব বিশেষ যদি কবির ভাবনা হইয়া তাঁহার আবেগ দ্বারা পরিমণ্ডিত হয় তবেই তাহা কাব্যের মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে। চিত্র ও সংগীত ব্যতীত সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। এই দুইটিই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ—অন্যান্য উপাদান আনুষঙ্গিকরূপে সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে এই মাত্র।

• কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে।

সংগীতের সহিত অন্যান্য কলাবিদ্যার সর্বপ্রধান পার্থক্য এই যে, সংগীতের মধ্যে বস্তুর ভার আদৌ নাই—তাহা বন্ধনহীন সুরকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে। বিশেষ করিয়া ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের কথা একেবারে গৌণ—রাগ-রাগিণীর রূপই সেখানে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার যে আবেদন তাহা দেশ ও কালের অতীত তো বটেই, তাহার যে দেহ দেশ ও কালকে অতিক্রম করিতে তাহার কোনো বাধা নাই।

কিন্তু সাহিত্যে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের এই দেশকালাতিশায়িতা নাই। অবশ্য একথা সত্য যে, এই তিনটি প্রধান শিল্পকলার মধ্যে একটা করিয়া সার্বজনীন আবেদন থাকে এবং তাহা দেশ ও কালমাত্র সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু তাহার যে উপাদান, তাহার উপর দেশ ও কালের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই তিনটির মধ্যেই শিল্পীর জীবনের ছাপ থাকে। সাহিত্যের মধ্যে রচয়িতার জীবন ও তাঁহার সমাজপরিবেশ ব্যক্ত হয়। চিত্রকর

বা ভাস্করকেও একটা আদর্শ গ্রহণ করিতে হয় এবং সে আদর্শ এই জীবনের মধ্যেই বর্তমান। জীবনের বিভিন্ন রূপ এই শিল্পকলার মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে ফুটিয়া উঠে।

এই জন্যই কোনো কোনো তত্ত্বদর্শী সাহিত্যকে জীবনের অনুকরণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং চিত্র ভাস্কর্য প্রভৃতি জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট অপরাপর শিল্পকলা সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন। সাহিত্যের মধ্যে আমরা মানুষের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী বা তাহার বিচিত্র ভাবনার প্রতিফলন দেখি। সাহিত্যকারের অন্যতম প্রধান অবলম্বন তাঁহার অভিজ্ঞতা। তিনি আপনার জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করিয়াছেন সাহিত্যের মধ্যে তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াসী হন। চিত্রশিল্পীকে মানুষের জীবনের কোনো চিত্র বা প্রকৃতির কোনো চিত্র অঙ্কন করিতে হয়। ভাস্করকে মানুষের মূর্তি রচনা করিতে হয়। চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের শিল্পসৃষ্টিতে অনুকরণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। অভিনয় সম্পর্কেও ঐ কথাই বলা যায়।

কিন্তু সাহিত্য বা অন্য কলাবিদ্যাকে আদর্শের যথাযথ অনুকরণ বলা অসংগত হইবে। শিল্পীর মনে আদর্শের একটা ছায়া থাকে বটে, তাঁহার সৃষ্টিকে অনুকরণ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু তাহা মূলের হুবহু প্রতিলিপি নয়। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব আদর্শ ও সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া উভয়ের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ভেদরেখা অঙ্কন করিয়া দেয় তো বটেই, ইহা ছাড়াও কলাবিদ্যার স্বরূপের মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাহার ফলে অনুকরণের সহিত তাহার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথমে সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জীবনের ছাপ থাকে। কিন্তু সাংবাদিকতার সহিত সাহিত্যের পার্থক্য আছে। সাংবাদিকতার কাজ হইল তথ্যকে পরিবেশন করা। যাহা বাস্তবিকপক্ষে ঘটিয়াছে তাহা নিখুঁতভাবে বর্ণনা করার দায়িত্ব সাংবাদিক পালন করেন। সাহিত্য সাংবাদিকতার মতো কেবলমাত্র বর্ণনা নহে।

সাহিত্য জীবনের অনুরূপ আর একটি জীবনের সামগ্রিক মূর্তি সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হয়। জীবন-বিমুখ হইলে সাহিত্যের চলে না, কিন্তু জীবনের নিখুঁত অনুকরণও তাহার উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্যে জীবনের সকল প্রচেষ্টার একটা প্রতিভাসমাত্র থাকে, কিন্তু তাহাকে জীবনের যথার্থ প্রতিলিপি বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

কোনো কোনো সাহিত্যরসিক জীবনের মধ্যে বাস্তবতার প্রতিফলন দেখিতে চাহেন। এই বাস্তববাদী সাহিত্যকারদের রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনীকে সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্ত করিতে উৎসুক হন, কিংবা মনের জটিল সমস্যাগুলির গ্রন্থি উন্মোচন বা সূক্ষ্মতর বাসনা বা ভাবনাগুলিকে সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ করিতে চাহেন। কিন্তু এই ধরণের সাহিত্যও অনুকরণপন্থী নয়। জীবনের বাস্তবদিকের অনুকরণের একটা ভান থাকিলেও রোমান্টিক সাহিত্যের মতোই এই ধরণের সাহিত্যেও রচয়িতার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বা শিল্পভঙ্গিতে জীবনের একটা কল্পিত রূপ প্রকাশিত হয় মাত্র। সত্যকার জীবন বলিয়া সাহিত্যের মধ্যে যাহা রূপায়িত হয় তাহা বাস্তবিকপক্ষে সাহিত্যস্রষ্টার অভিজ্ঞতাপুষ্ট শিল্পিমানসে নবকলেবরপ্রাপ্ত একটি বোধের প্রতিফলন। যদি সাহিত্যই সৃষ্টি করিতে হয় তাহা হইলে অনুকরণ করিলে চলিবে না। অনুকরণের মধ্যে যে বিবৃতি-সর্বস্বতা আছে তাহা সাহিত্যের বস্তু নয়।

চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলাকেও আপাতদৃষ্টিতে অনুকরণপ্রধান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই ধারণাও অমূলক। তবে সাহিত্যের সহিত চিত্র ও ভাস্কর্যের এইটুকু পার্থক্য যে, চিত্র বা ভাস্কর্য নিখুঁত অনুকরণও হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অনুকরণসর্বস্বতা সম্ভবপরই নয়। কিন্তু চিত্রশিল্পী বা ভাস্করকে অনুকরণ যে করিতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই। বরং দেখা যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্র বা ভাস্কর্যগুলি অনুকরণ নয়।—মানুষ প্রথমে অনুকরণ করিত, পরে তাহার রসবোধ পুষ্টিলাভ করিলে সে অনুকরণ ছাড়িয়া

স্বকীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে একথা বলাও সংগত হইবে না। প্রাচীন গুহায় আদি মানবের চিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অনুকরণ নয়। সেখানে যে শিকারের ছবি আছে তাহাতে মানুষ বা প্রাণীদের যে সব মূর্তি আছে তাহার মধ্যে অনুকরণের প্রয়াস আদৌ নাই। অথচ সেগুলিকে অপটু হস্তের রচনা বলা চলে না। গুহাগাত্রে শিকারের যে-সব ছবি দেখা যায় তাহাতে শিকারের গতিশীলতা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আদি যুগেও শিল্পসৃষ্টির মূলে যে নিছক অনুচিকীর্ষা ছিল না তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে।

অভিনয়কলার মধ্যেও অনুকরণের ভানমাত্র রহিয়াছে। বাস্তবের মা যে রকম করিয়া কাঁদে, সাহিত্যের মা'র কান্না সে রকম নয়—অভিনয়ের মায়ের কান্নাও বাস্তবের মায়ের কান্নার যথাযথ অনুকরণ নয়। অভিনয় জীবনের অনুকরণ নয়, তাহাকে সাহিত্যে রূপায়িত জীবনের প্রকাশমাত্র বলা যাইতে পারে।

নৃত্য-কলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কলাবিদ্যার স্বরূপটি আরও স্পষ্ট হইতে পারে। নৃত্যেও ব্যবহারিক জীবনের কাজগুলির অনুকৃতি আছে, কিন্তু তাহাতে অনুকরণের প্রয়াসমাত্র নাই। প্রণামনৃত্যে যে প্রণাম আছে তাহা আদৌ বাস্তব প্রণামের অনুকরণ নয়। প্রণামের রূপটাই নৃত্যের মধ্য দিয়া নূতন একটা ভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। আমাদের বাস্তব জীবনের কর্মপ্রচেষ্টা বা অঙ্গভঙ্গিকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াই নৃত্য কল্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ উপাদানগুলি মুখ্য ব্যাপার নহে—মুখ্য ব্যাপার নৃত্যকলা—নৃত্যের মধ্য দিয়া যে রসটি মূর্ত হইয়া উঠে তাহাই নৃত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বস্তুতঃ, সকলপ্রকার কলাবিদ্যার মধ্যেই এই রসই মুখ্য ব্যাপার। সাহিত্যের মধ্যে আমরা জীবনকে দেখিতে চাই না—জীবনের রসরূপের আস্বাদই আমাদের কাম্য। চিত্রের মধ্যে, ভাস্কর্যের মধ্যে আমরা বস্তুর হুবহু প্রতিবিম্ব দেখিতে চাই না—তাহার রসঘন রূপান্তরই শিল্পকলার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা আমাদের একমাত্র অভিপ্রায়। অভিনয়ের মধ্যে জীবনের অনুকরণ

প্রত্যক্ষ করার পরিবর্তে জীবনরস উপভোগই লক্ষ্য। রস নামে আখ্যাত আনন্দস্যন্দী পদার্থটুকু না থাকিলে কোনো শিল্পকর্মের প্রতি আমাদের অনুরাগ থাকিত না। বাস্তবজীবনের একটা অনুভূতি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেই আছে। সেই অনুভূতিটুকু সর্বজনীন বলিয়া তাহাকে অবলম্বন করিয়া শিল্পী তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে জীবনের অনুকরণের প্রয়াস করেন—অভিজ্ঞতার সাধারণ মাধ্যমেই বিমূর্ত রসকে শিল্পীমানস হইতে রসিকমানসে প্রবাহিত হয়। স্রষ্টার জীবনবোধ অপুষ্ট হইলে রসের প্রকাশ ব্যাহত হয় এইমাত্র—অনুকরণের প্রয়াস শিল্পী করেন না।

সত্যকে যখন আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই তখনই তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি।

কাব্যের উদ্ভবের সেই আদি কাহিনীটি স্মরণ করা যাক।—মহর্ষি বাল্মীকি তমসা নদীর তীরে ক্রৌঞ্চ দম্পতীর স্বচ্ছন্দ বিহারের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। সহসা একটি ব্যাধের তীর আসিয়া ক্রৌঞ্চের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিল। প্রিয়বিয়োগবিধুর ক্রৌঞ্চের করুণ আর্তনাদে চারিদিক ভরিয়া উঠিল। মহর্ষি বাল্মীকির কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল আদিশ্লোক—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

এই প্রথম কাব্যের উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে আচার্য অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন, "সহচরী-বিয়োগ-কাতর ক্রৌঞ্চের শোক মুনির মনে, লৌকিক শোক থেকে বিভিন্ন, নিজের চিত্তবৃত্তির আস্বাদস্বরূপ করুণ রসের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এবং যেমন পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে জল উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, তেমনি করে ঐ রস মুনির মন থেকে ছন্দোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত শ্লোকরূপে নির্গত হয়েছে।"

['কাব্য জিজ্ঞাসা'য় বিধৃত অনুবাদ]

বাহিরের ক্রৌঞ্চের লৌকিক শোক দেখিয়া কবির মনে এক অলৌকিক শোকের উদ্ভব হইয়াছে। এই উদ্ভবের এবং কাব্যরূপে অর্থাৎ রসরূপে তাহার

পরিণতির কারণ কী ? কবি যদি কেবল চোখ দিয়া এই দৃশ্যটি দেখিতেন, তাহা হইলে ইহা প্রাত্যহিক জীবনের একটা ঘটনামাত্র বলিয়া তাঁহার মধ্যে কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি করিত না। যদি তিনি তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া এই ঘটনাটির দিকে মনঃসংযোগ করিতেন, তাহা হইলে ব্যাধের শরসম্পাতের কারণ বা ক্রৌঞ্চের ক্রন্দনের কারণ সম্পর্কে একটা ধারণা তাঁহার মনে জন্মিতে পারিত—কিন্তু কাব্যরূপে তাহার কোনো প্রকাশ হইত না। বহির্দৃষ্টি বা বুদ্ধিবৃত্তি বাহ্যঘটনার বিশ্লেষণ করে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তাহা কোনো রকম আলোড়ন সৃষ্টি করে না। তাহা তথ্য ও তত্ত্বের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয় মাত্র।

ক্রৌঞ্চের শোক মহর্ষি বাল্মীকির কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে নাই, বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে তাহার আবেদন শেষ হইয়া যায় নাই, ইহা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। হৃদয়ের ধর্মই এই যে, তাহাতে বাহিরের যাহা কিছুর স্পর্শ লাগে, তাহাই তাহার মধ্যে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির নিকট আবেদন তখনকার মতো শেষ হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের নিকট আবেদনের শেষ নাই। বাহিরের যে ঘটনা হৃদয়কে স্পর্শ করে তাহা হৃদয়-তন্ত্রীতে যেন একটা অন্তহীন কম্পন সঞ্চার করে—ঝংকাররূপে তাহার প্রকাশই শিল্পসৃষ্টি। ক্রৌঞ্চের শোক মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার অন্তরে শোকভাবের অন্ত ছিল না—তাহা সর্বজন-আস্বাদ্য রসরূপে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার অন্তর ছাপাইয়া উঠিতেছিল—এইজন্যই কাব্য-রূপে তাহার প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে।

আস্বাদের দিক হইতে সাহিত্যকে বিচার করিতে গেলেও আমরা এই হৃদয়েই গিয়া পৌঁছাই। কাব্যের ধ্বনিপ্রবাহ আমাদের মনকে কিছু পরিমাণে আবিষ্ট করে বটে, কিন্তু তাহা আমাদের সাহিত্যের আস্বাদ দেয় না—তাহার স্থায়িত্বও অনেক কম। দাশু রায়ের পাঁচালী শ্রুতিসুখকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার কাব্যের শব্দ ঝংকার আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু তাহা সুসাহিত্যের অপরিহার্য উপাদান নয়। জয়দেবের কাব্য অধিকতর সুললিত হইলেও কালিদাসের কাব্যই উৎকৃষ্ট কাব্য।

সাহিত্যের মধ্যে তাত্ত্বিকতার মূল্য তত্ত্বের দিক হইতে স্বীকার্য হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের আস্বাদের দিক হইতে তাহা অকিঞ্চিৎকর না হইলেও বিশেষভাবে গ্রাহ্য নয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের হৃদয় তাহাকে বিশেষ মর্যাদা দিতে রাজি নয়। এইজন্যই গৌড়-পাদকারিকা দার্শনিক তত্ত্বগ্রন্থ হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্ হইলেও কাব্য হিসাবে নগণ্য এবং মেঘদূতে তাত্ত্বিকতার সন্ধান না পাওয়া গেলেও ইহা উৎকৃষ্ট কাব্যরূপে যুগে যুগে আস্বাদিত হইয়া আসিতেছে।

অবশ্য সাহিত্যের মধ্যে ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিবৃত্তির কোনো স্থান নাই এবং তাহা নিছক হৃদয়বৃত্তির ব্যাপার এরূপ ধারণা পোষণ করিলে ভুল করা হইবে। সাহিত্যকারকে চোখ মেলিয়া এই পৃথিবীর বিচিত্র বস্তুর দিকে দেখিতে হয় এবং সেই দৃশ্যবস্তুসমূহকে আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখীন করিয়া দিতে হয়। ভাষাকে এমন ভাবে প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তাহা পদে পদে আমাদের শ্রুতিকে আঘাত না করে। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই আমাদের সমস্ত ধারণা সম্ভবপর হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।

বুদ্ধি আমাদের সকল বোধের মূলে রহিয়াছে বলিয়াই যে কেবল সাহিত্যের মূলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন এমন নয়। যেটুকু বুদ্ধি না থাকিলে কোনো কিছুর ধারণা সম্ভবপর নয় সেটুকু বুদ্ধি তো অবশ্য প্রয়োজন, উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে তাহার চেয়ে আরও কিছু প্রয়োজন। এই অতিরিক্ত বুদ্ধি-বৃত্তিকে প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলা অসংগত হইবে না। ইহা শুদ্ধমাত্র বুদ্ধি নয়—ইহা হৃদয়ের রসে জারিত এবং আমাদের চেতনা হইতে উদ্ভূত একটি শক্তি বিশেষ। যে সাহিত্যকারের এই শক্তিটি নাই তাঁহার রচনায় ভাবালুতা ও অনর্থক উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য দেখা যায়। সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য আনন্দ দান—কিন্তু সেই আনন্দ শুদ্ধমাত্র পুলকের প্রাবল্য নয়, চেতনার গভীরতম প্রদেশ হইতে রসের ক্ষরণই সেই আনন্দকে সঞ্জীবিত করে। শুষ্ক বুদ্ধি চেতনার সেই গভীরতর স্তরে পৌছিতে পারে না, হৃদয় দূর হইতে তাহাতে তরঙ্গ সঞ্চার

করিতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের সহিত প্রজ্ঞার সমন্বয় হইলেই সেই গহন লোকের সুগভীর আনন্দস্বাদ আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে। উৎকৃষ্ট সাহিত্যে হৃদয়াবেগের সহিত প্রজ্ঞাদৃষ্টির সংশ্লেষণের ফলে রসঘনতার সঙ্গে সঙ্গে একটা জীবনজিজ্ঞাসাও প্রকাশিত হয়।

অনেক বুদ্ধিজীবী সাহিত্যরচয়িতা প্রজ্ঞাদৃষ্টিকেই মুখ্য মর্যাদা দান করিয়া হৃদয়কে যেন কিছু পরিমাণে উপেক্ষা করিয়া দূরে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, সাংকেতিকতা, তত্ত্বালোচনা, সমস্যা লইয়া বিচার প্রভৃতি বুদ্ধিজীব্য উপাদান তাঁহাদের রচনায় স্থান লাভ করে। ইহাতে তাঁহাদের রচনা বস্তু-গৌরবে সমৃদ্ধ হইলেও সাহিত্যের প্রধানতম মানদণ্ড রসোত্তীর্ণতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। হৃদয় ব্যতীত সাহিত্যরসের ক্ষরণ অসম্ভব।

বাস্তবিকপক্ষে সাহিত্য বিশ্লেষণের বিষয় নয়, তাহাকে আস্বাদ করিতে হয়। বুদ্ধির পরিবর্তে হৃদয় দিয়াই তাহাকে সৃষ্টি করিতে হয়, উপভোগও করিতে হয়। কাব্যরসের পরিচয় দিতে গিয়া প্রাচীন আলংকারিকগণ রসকে 'সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী' বলিয়াছেন। কাব্যরস আস্বাদ করিতে উন্মুখ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ের বাহিরে রসের অস্তিত্ব নাই। সাহিত্যরস হৃদয় হইতেই নিঃসৃত এবং হৃদয় দ্বারাই আস্বাদ্য।

কাব্যের আনন্দকে এই জন্যই খেলার আনন্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়। খেলার কোনো প্রয়োজন নাই—তাহার আনন্দ অপ্রয়োজনের আনন্দ। বুদ্ধি দিয়া সেই আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করা যায় না, আমাদের হৃদয়েই খেলার আনন্দের উদ্ভব। আমাদের হৃদয়ের বহুধা-প্রকাশবাসনাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই আমরা খেলা করি। নিছক বুদ্ধি দিয়া বিচার করিলে খেলাকে অনর্থক আয়োজন বলিয়া মনে হইবে—রসসাহিত্যকেও চিন্তাশক্তির অযথা অপব্যয় বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমাদের হৃদয় প্রয়োজনের হিসাব করে না। তাহা আত্মতৃপ্তির জন্য খেলার মধ্য দিয়া যেমন, তেমনই সাহিত্য এবং অন্য শিল্পকলার মধ্য দিয়া নিজেকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করিতে চাহে।

এইজন্যই দেখি যে, সেই সব সাহিত্যকারের রচনাই কালজয়ী হইয়াছে যাঁহারা হৃদয়ের সংবাদটি নিপুণভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন। কালিদাসের সমকালের বিচক্ষণ পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা মুষ্টিমেয় গবেষকদের অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; আর কালিদাসের হৃদয়সংবাদী রচনাবলী যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের হৃদয়ে আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে।

যা শ্রেষ্ঠ কাব্য, তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া

কাব্যের আত্মার অন্বেষণ করিতে গিয়া ধ্বন্যালোককার বলিয়াছেন :

প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥

'রমণীদেহের লাবণ্য যেমন অবয়ব সংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিষ তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গি, এ সবারও অতিরিক্ত আরও কিছু।'

এই অতিরিক্ত বস্তুটিকেই আলংকারিকরা কাব্যের আত্মা বলিয়া নির্দেশ করেন। প্রত্যেক কাব্যেরই একটা বাচ্য থাকে—কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে বাচ্যকে ছাড়াইয়া একটা অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা থাকে। এই অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাই কাব্যের উৎকর্ষের নিদান।

কাব্যের মধ্যে শব্দ ও অর্থ অবশ্যই থাকে। কিন্তু শব্দ ও অর্থই কাব্যের সব কিছু নয়। ধ্বন্যালোককার এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

শব্দার্থ শাসনজ্ঞানমাত্রে নৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে স হি কাব্যার্থে তত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্ ॥

অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থের জ্ঞানেই কাব্যের জ্ঞান হয় না। যিনি কাব্যের তত্ত্ব যথার্থভাবে জানেন, তিনিই যথার্থভাবে শব্দ ও অর্থের অতিরিক্ত কাব্যের সারবস্তুকে জানিতে পারেন।

কাব্যমাত্রেরই বাচ্যার্থ আছে, কিন্তু তাহা কাব্যের প্রাণস্বরূপ নয়।— যদি .চ বাচ্যরূপ এবাসাবর্থঃ স্যাৎ তদ্বাচ্য-বাচক-স্বরূপ পরিজ্ঞানাদেব

তৎপ্রতীতিঃ স্যাৎ। অর্থাৎ কাব্যের সারভূত অর্থ যদি কেবলমাত্র তাহার বাচ্যার্থই হইত, তাহা হইলে বাচ্যের স্বরূপ জ্ঞানেই কাব্যের সবটুকু অর্থ অবগত হওয়া যাইত।

কিন্তু তাহা হয় না। শব্দ ধরিয়া ধরিয়া কাব্যের অর্থের সন্ধান করিতে গেলে রমণীদেহের গঠন সংস্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার লাবণ্যের পরিমাণ নির্দেশ করিবার চেষ্টার মত হাস্যকর হইয়া উঠে। অথচ বাচ্যবাচকরূপলক্ষণকৃত-শ্রমাণাং কাব্যতত্ত্বার্থভাবনাবিমুখানাংস্বরশ্রুত্যাদিলক্ষণমিব প্রগীতানাং গান্ধর্ব, লক্ষণবিদামগোচর এবাসাবর্থঃ। অর্থাৎ বাচ্য ও বাচকের লক্ষণ বিচার করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া যাঁহারা কাব্যের তত্ত্বার্থ ভাবনা করিতে বিমুখ হন, কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য তাঁহাদের নিকট অগোচর থাকে। যেমন, যাহারা গানের বাহ্যলক্ষণমাত্র জানে, তাহারা সংগীতের স্বর ও শ্রুতি অনুভব করিতে পারে না।

সাহিত্যের মধ্যে এই শব্দার্থাতিরিক্ত অর্থাৎ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত অভিব্যঞ্জনাকে সাহিত্যকারেরা 'ধ্বনি' বা 'ব্যঞ্জনা' 'আখ্যা দিয়াছেন। এই ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের মধ্যে নিহিত থাকে, অথচ তাহা বাচ্যকে অতিক্রম করিয়া অতিরিক্ত একটি বস্তুরূপে দ্যোতনা লাভ করে।

এই ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ কীভাবে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে, তাহা কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের একটি পরিচিত শ্লোক হইতে দেখা যাইতে পারে। নারদ হিমালয়ের নিকট আসিয়া মহাদেবের সহিত উমার বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছেন :

এবংবাদিনী দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥

অর্থাৎ, দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিলে পিতার পার্শ্বস্থা পার্বতী অধোমুখী হইয়া লীলাকমলের পত্রগুলি গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।—এখানে লীলাকমলের পত্রগণনা বাচ্যার্থ—উমার পূর্বরাগের লজ্জার ব্যঞ্জনা এই বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'অত্র হি লীলাকমলপত্র-গণনমুপসর্জনীকৃত-স্বরূপং……অর্থান্তরং ব্যভিচারিভাবলক্ষণং প্রকাশয়তি।'—

এখানে লীলাকমল পত্রগণনাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থে একটি ব্যভিচারী ভাবকে প্রকাশিত করা হইয়াছে।

কুমারসম্ভব কাব্যের শ্লোকটি বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশের একটি উদাহরণ মাত্র। শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্যকে অতিক্রম করিয়া একটা অতিরিক্ত বিষয় অভিব্যঞ্জিত হয়। যে কাব্যের মধ্যে এই অতিরিক্ত বক্তব্য নাই, তাহা অল্পপ্রাণ—তাহার মধ্যে মণ্ডনৈপুণ্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহা তুচ্ছতার হাত হইতে রক্ষা পায় না। তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধকে বা বুদ্ধিবৃত্তিকে ক্ষণিক তৃপ্তি দান করিলেও আমাদের গভীরতর সত্তাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে সাহিত্যের অর্থ প্রকাশের অতিরিক্ত ধ্বনি নাই, যাহা অর্থ প্রকাশকে ছাড়াইয়া অন্য কোনো ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত দেয় না তাহার মূল্য নিতান্ত সামান্য। সে রচনা আমাদের কৌতূহলমাত্র উজ্জীবিত করিলেও আমাদের অন্তরে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে যে শিল্পচাতুর্য থাকে তাহা আমাদের মুগ্ধ করে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে যে অতিরিক্ত বস্তুটুকু থাকে তাহা আমাদের অন্তরে একটা স্থায়ী রসানুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দেয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রণয়মূলক প্রকীর্ণ কবিতার অসদ্ভাব ছিল না··· 'মেঘদূত'ও প্রণয়মূলক কবিতার সমষ্টি। কিন্তু কলাকৌশলময় অজস্র প্রকীর্ণ শ্লোক কবে হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু মানুষের অন্তরে যে চিরবিরহের সুর ধ্বনিত হইতেছে 'মেঘদূত' তাহার বার্তা চিরকাল বহন করিয়া চলিয়াছে। 'মেঘদূত'-এর মধ্যে প্রকৃতি বর্ণনামূলক বা প্রণয়মূলক যে সকল শ্লোক আছে স্বতন্ত্রভাবে সেগুলির অর্থকে অতিক্রম করিয়া মেঘদূত চিরন্তন বিরহের 'ধ্বনি'-টুকুকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে প্রেম ও সৌন্দর্যের ছবি আছে—কিন্তু সমগ্র নাটকে জীবনের একটি গভীর সত্যের যে অভিব্যঞ্জনা আছে তাহাই নাটকটিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপে যুগে যুগে সমাদৃত করিয়াছে। মহাভারতের মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধের কাহিনী, জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও বিচিত্র উপকাহিনী অজস্র আছে—কিন্তু এই বিরাট গ্রন্থটিতে

মহাকাব্যের আধারে একটি জাতির জীবনের উত্থান-পতনের যে বিরাট ইতিহাসের রসস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে তাহাই ইহাকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবার গৌরব দান করিয়াছে।

নীলকান্ত মণির দেহটুকুই সব নয়—তাহার ক্ষুদ্র দেহ হইতে অপরূপ নীলাভদ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়া নীলকান্ত মণিকে বহুমূল্য করিয়া তুলে। শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যেও সেইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থটি যেন একটি ভাবদেহ পরিগ্রহ করিয়া রসিক পাঠকের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। বাচ্যার্থের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া মহৎ সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। তাহা বাচ্যার্থ বা বক্তব্য বিষয়টিকে অবলম্বন মাত্র করিয়া একটি রসমূর্তি রচনা করিয়া দেয়। জগতের স্মরণীয় সমস্ত রচনাই বক্তব্যকে ছাড়াইয়া গিয়া ধ্বনিময় সূক্ষ্মদেহে চিরজীবী হইয়া আছে।

যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, এক হিসাবে তাহার কিছুই নাই, সে জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য।

যে সকল জাতি তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, তাহারা এক একটি বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সব সাহিত্যই সেই সব জাতির মানসিক পুষ্টির সহায়তা করিয়াছে। জাতির সামগ্রিক উন্নতি সেই সকল সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সুদূর অতীতকালে ভারতবর্ষে বৈদিক সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। আর্য সভ্যতা তখন সবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আপনাকে সম্প্রসারিত করিতেছে, তখনও এ দেশের মধ্যে তাহা আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নাই। এইজন্য যে সাহিত্য এই যুগে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র ঋষি সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—তাহা অধ্যাত্মসাধনার পথে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে অনুপ্রাণিত করিলেও সমগ্র জাতির সহিত তাহার সংযোগ ছিল না।

কিন্তু ইহার পর আর্য সভ্যতা যখন এ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যখন সমগ্র আর্যাবর্তে একটি অখণ্ড সংস্কৃত গড়িয়া উঠিয়াছে, তখন দুইটি বিরাট সাহিত্য গ্রন্থ এই সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে। একটি মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ অপরটি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত মহাভারত। এই দুইটি মহাগ্রন্থে ভারতবর্ষের সমগ্র কর্ম ও ভাব-জীবন প্রতিফলিত হইয়াছে—ইহা তাহার জাতীয় সাহিত্য।

সাধারণ সাহিত্যের সহিত জাতীয় সাহিত্যের পার্থক্য রহিয়াছে। এ যুগে সাহিত্যসৃষ্টি ব্যক্তিগত সাধনার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এখনকার সাহিত্যকার একান্তে বসিয়া আপনার মনের খেয়ালী কল্পনা (fancy) দিয়া জীবনের বিচিত্র বর্ণ সংযোগে চিত্র-রচনা করেন। তাহা জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন অলস মায়াকুহেলি না হইলেও তাহার মধ্যে জাতির প্রাণস্পন্দন শোনা যায় না। কিন্তু জাতীয় সাহিত্য ব্যক্তিগত শিল্পসাধনার বিষয়মাত্র ছিল না। মহাকবি বাল্মীকি কি আপনার কল্পনাবলে রামকথা রচনা করিয়া তাহা দিয়া তাঁহার সমকালীন শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন? তাহা নয়; তাঁহার পূর্বেও দেশে রামকথা প্রচলিত ছিল। রামের জীবনকথা জাতির নিকট একেবারে অজানা ছিল না। মহর্ষি বাল্মীকি সেই কাহিনীকে আপনার কবিপ্রতিভা দিয়া—নূতন রসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়া জাতির নিকট তাহা যেন বিতরণ করিয়া দিয়াছেন।—মহর্ষি বেদব্যাসও জাতির মধ্যে প্রচলিত বিচ্ছিন্ন আখ্যায়িকাকে সমন্বিত করিয়া তাঁহার মহাগ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা নূতন কোনো বিষয় সৃষ্টি করেন নাই। যাহা সারা দেশের মধ্যে ছড়াইয়া ছিল, তাহাকে একত্র করিয়া জাতির সংস্কৃতির ধন দুইখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দুইটির মধ্যে জাতির হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত হইতেছে—ভারতবর্ষের জীবনধারার একটি সমগ্ররূপ, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবনবোধ সকলই এই দুইটি মহাকাব্যের মধ্যে এইজন্যই প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাকবি হোমারও যে মহাকাব্য দুইটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত কল্পনার ফলমাত্র নয়, তাহাও জাতির সম্পত্তি। তাঁহার সমকালে গ্রীসের বীরত্বের যে কাহিনী প্রচলিত ছিল, দেশের ইতিহাসে যে সকল গৌরবজনক বিষয় ছিল, সেগুলিকে তিনি তাঁহার মহাকাব্যে গ্রথিত করিয়াছেন। ইলিয়াদ ও ওদেসির কাহিনী গ্রীসের জাতীয় সম্পত্তি। একটি যোদ্ধা জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ—সবকিছুই এই দুইটি মহাকাব্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকজাতির জীবনের স্পন্দন এই জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে শোনা যায়। প্রাচীন গ্রীকজাতি এই অমর কাব্য দুইটির মধ্য দিয়া যেন আত্মদর্শন করিয়াছিল।

জাতীয় সাহিত্যে কেবল জাতির ভাবভাবনার প্রতিনিধিমাত্র নয়—ইহা কামধেনুর মতো জাতিকে যুগ যুগ ধরিয়া অতুল ঐশ্বর্য দান করে। রামায়ণ বা মহাভারত কেবল বিদগ্ধ সমাজের পাঠ্য গ্রন্থমাত্র হইয়া থাকে নাই। পরবর্তী-কালে অসংখ্য কবি ও নাট্যকারগণ এই গ্রন্থের কাহিনীর অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া জাতীয় সম্পদ্ বহু গুণে বর্ধিত করিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারত প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও বাংলা ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে এবং অজস্র কবি ও গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিয়া ইহা জাতির ঘরে ঘরে পৌঁছিয়াছে। অশিক্ষিত পল্লীবাসীও তাহার এই জাতীয় সাহিত্যের সহিত অপরিচিত নয়। এই সাহিত্য তাহার সংস্কৃতির সহিত এমনভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা তাহার সমগ্র ভাবধারার মূলে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। তাহার সমস্ত চিন্তার মধ্যে এই দুই মহাগ্রন্থের প্রভাব নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

যে জাতির এইরূপ জাতীয় সাহিত্য নাই, সেই জাতিকে হতভাগ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ সেই জাতির এমন কোনো স্থায়ী সম্পদ নাই যাহা তাহাকে বিপদের দিনে পাথেয়ের সন্ধান দিতে পারে, যাহা তাহাকে সমৃদ্ধির অধিকারী করিয়া তুলিতে পারে। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহার কোনো ধ্রুব আদর্শ নাই, তাহার সংস্কৃতি ও সভ্যতা কালের

তরঙ্গে নিত্য ভাসিয়া যায়—আপনার বৈশিষ্ট্যকে চিরস্থায়ী করিয়া তুলিবার উপযুক্ত অবলম্বন তাহার নাই।

জাতীয় সাহিত্য মানুষকে জীবন গঠনে সহায়তা করে তাহার চিন্তাকে পরিণতি লাভের একটা অবকাশ করিয়া দেয়। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহার গৌরবময় ঐতিহ্যও নাই—তাহা ভিখারীর মতো একবার এ সভ্যতা একবার ও সভ্যতার দ্বারস্থ হয়—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার নাম চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাহার সাহিত্য সৃষ্টিও অমূল তরুর মতো পরাশ্রয়ী—সতেজে আপনাকে প্রকাশিত করিবার মতো উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা তাহার নাই।

যে জাতি জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই, সেই জাতি এক সময়ে গৌরব লাভ করিলেও পরে তাহার আত্মবিস্মৃতি ঘটে। বিপদের দিনে সে জাতি আপনার ঐতিহ্যের নিকট প্রেরণা লাভ করিতে পারে না—বিপদ হইতে মুক্তির পর তাহা দিগ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রাচীনের প্রজ্ঞায় তাহার পুনরুজ্জীবন হয় না। সে জাতি বার বার পরের অনুকরণ করিয়াই আপনার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অবসিত করিয়া দেয়—দৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

অবশ্য এ কথাও এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় সমৃদ্ধি পরিণতি লাভ করিলেই জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর। প্রতি যুগই তাহার উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করে এবং সেই সাহিত্যকে গ্রহণ করাই সেই যুগের পক্ষে সমীচীন। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহার চিৎ-প্রকর্ষ এমন হয় নাই যাহাতে তাহার পক্ষে একটি ধ্রুব সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে। তাহাকে পরের দেখিয়া আপনার সদ্‌বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়াই চলিতে হইবে। অক্লান্ত অনুশীলনের ফলে সে এমন একটি স্তরে গিয়া পৌছিবে, যখন তাহার জাতীয় সাহিত্য আপনিই সৃষ্ট হইবে। কোনো জাতির জাতীয় সাহিত্য কখন সৃষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না। যতদিন পর্যন্ত জাতীয় সাহিত্য সৃষ্ট না হয়, ততদিন পর্যন্ত জাতিকে হতভাগ্য

বলিতে হইবে—কারণ অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার তখনও তাহার নিকট উন্মুক্ত হয় নাই।

রামমোহন আসিয়া সরস্বতীর সেই আমদরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কী রকম ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথমেই যে জিনিষটি আমাদের মনে হয় তাহা এই যে, সে যুগে বাণীর মন্দিরে সকলের প্রবেশ অবারিত ছিল না। শিক্ষা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাহাকে লাভ করিতে পারিত। বর্তমানে শিক্ষাকে সর্বজনের আয়ত্ত করিবার জন্য যে প্রয়াস দেখা যায় সে যুগে তাহা আদৌ ছিল না। বিদ্যা তখন স্বল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবানেরই করতলগত ছিল।

তখন এ দেশে ইংরেজী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল বটে, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা বা ইংরেজী সভ্যতা এ দেশে একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল। তখন বিদ্যার দুইটি ধারা দেশের মধ্যে প্রবাহিত—একটি সংস্কৃত শিক্ষার ধারা, লোকাচার রক্ষা বা বিদ্যালোচনা যাহার লক্ষ্য; অপরটি ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া, কিছু বাংলা ও ফারসী শিক্ষা ছিল এই ধারাটির অঙ্গ।

তখনকার দিনে সংস্কৃত শিক্ষা মুখ্যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার পণ্ডিতসমাজে স্মৃতি ও নব্যন্যায়েরই সমাদর ছিল বেশি—ইহার পর ব্যাকরণ, দর্শন, সাহিত্য কেবলমাত্র অধ্যয়নের বস্তুই ছিল—অধ্যাপনার জন্যই বেশির ভাগ পণ্ডিত এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন; স্বাধীনভাবে বিদ্যাচর্চা করিবার প্রয়াস তাঁহারা করিতেন না—সে অবকাশও তাঁহাদের ছিল না। অধ্যাপকের পরিবারভুক্ত বা পরিচিত ব্রাহ্মণ বালকগণই বিদ্যার্থী হইত, কচিৎ কোনো ধনীসন্তান কৌতূহলবশতঃ বা অভিভাবকের উৎসাহবশে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে অগ্রণী হইতেন। যে জ্ঞানভাণ্ডার হইতে

তাঁহারা রত্ন আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহার দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিদ্যাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ যেন আপনাদের কুক্ষিতলগত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শিক্ষার অপর ধারাটি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়তো ছিল—কিন্তু তাহা একান্তভাবে ব্যবহারিক বিদ্যা হওয়ায় কেহ কেহ ঐ জীবিকার সংস্থানমাত্র করিবার জন্য ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাগ্‌বাণী নন—কমলার পদনখর হইতেই এই বিদ্যা নিঃসৃত হইয়াছিল। কিন্তু সেই যুগে যখন জীবিকা অর্জন ব্যাপারটি এখনকার মতো দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে নাই, তখন নূতন করিয়া কেহ এই বিদ্যা অর্জন করিতে অগ্রসর হইত বলিয়া মনে হয় না। ইহা স্বল্পসংখ্যক মসীজীবীদের অবলম্বন ছিল।

বরং সরস্বতীর খাসদরবারে কোনো কোনো বাঙালী স্থান পাইয়াছিলেন। পূর্ব পূর্ব যুগে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহার মানের অবনতি হওয়া সত্ত্বেও এই যুগে কবিওয়ালাদের প্রসার বাড়িয়া গিয়াছিল। এই লোক-সাহিত্যই তখন জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিত এবং ইহার মাধ্যমেই জাতীয় শিক্ষা সম্ভবপর হইয়াছিল।

কিন্তু জ্ঞানের দিকটি সাধারণের নিকট একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। বিদ্যার চর্চা সাধারণ মানুষের নিকট দুর্লভ বস্তুই ছিল। খ্রীষ্টীয় মিশনরীরা কিছু কিছু বই ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতেও অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল—কিন্তু তাহা কেবল প্রথমশিক্ষার্থী বা অল্প শিক্ষিতরাই পাঠ করিত। বাংলা ভাষায় যে কোনো আলোচনা সম্ভবপর—বাংলা গদ্যে যে জ্ঞানগর্ভ বিষয় তো দূরের কথা—মনের ভাবও যে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে ইহা তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের কল্পনারও অগোচর ছিল। রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর নাসিকাকুঞ্চনকে উপেক্ষা করিয়া বাংলা গদ্যে আলোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই পণ্ডিতসমাজের অবজ্ঞার উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন।

তাঁহার সেই প্রয়াসই বাংলা সাহিত্যে চিন্তাপূর্ণ রচনার স্থান করিয়া দিয়াছে।

রামমোহন নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু লর্ড আমহার্স্টের নিকট একটি পত্রে সংস্কৃত বিদ্যার জন্য অর্থ ব্যয়ের পরিবর্তে এ দেশে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার যাহাতে প্রচার হয় তাহার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি তাঁহার অবজ্ঞার ভাব ছিল না; কিন্তু তৎকালে সারা দেশের মধ্যে বিদ্যার প্রতি যে উপেক্ষা ছিল তাহা দূর করিবার জন্য এবং দেশের চিন্তাধারার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিশীলতা প্রচার করিবার জন্য তিনি এ দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে যে একটা সার্বভৌমিকতা আছে তাহা এ দেশের অশিক্ষাজনিত তামসিকতা অচিরেই দূর করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

রামমোহন দেশের মধ্যে জ্ঞানের আলোক প্রসারিত করিবার জন্য এক দিকে যেমন পাশ্চাত্ত্য ধরণের বিদ্যায়তন স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন, অন্য দিকে তেমনই সংস্কৃত শাস্ত্রবারিধি মন্থন করিয়া রত্ন আহরণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। দেশের ধর্মবুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া তিনি যেভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে একটি সুদৃঢ় ধর্মবোধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত বেদান্ত দর্শনের উপরে তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বেদান্ত সম্পর্কীয় রচনাগুলি তৎকালীন গোঁড়া পণ্ডিতদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বাংলা ভাষার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—রামমোহন তাহার প্রত্যুত্তরও প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্মতত্ত্বের দিক হইতে এই সব আলোচনার মূল্য যাহাই হোক না কেন, বাংলা ভাষায় বিচারের দিক হইতে ইহা একটা নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া, যুক্তিকে বিচারসহ করিয়া নিরপেক্ষভাবে অভিমত প্রকাশ তাঁহার

পূর্বে আর কেহ করেন নাই। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে মননশীলতার একটা স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন।

কেবল ধর্মালোচনা নয়—রামমোহন অন্যান্য বিবিধ বিষয়েরও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে মূল্যবান্। তাঁহার এই সব রচনার সংখ্যা তেমন বেশি নয়। তাঁহার প্রায় সারা জীবনটাই সংগ্রাম করিতে করিতে কাটিয়া যাওয়ায় তিনি সুপ্রচুর রচনাসম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চিন্তাশীলতার প্রবর্তকরূপেই তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রামমোহন কিছু ব্রহ্মসংগীতও রচনা করিয়াছেন—কিন্তু বঙ্গবাণীর খাস-দরবারে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—পরবর্তীকালে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র নবীনা বঙ্গভারতীর খাসদরবারের তোরণদ্বার উন্মুক্ত করিয়া উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন আমদরবারের সিংহদ্বারটি উন্মুক্ত করিয়া সর্বজনলভ্য ও সর্বজনসাধ্য জ্ঞানচর্চার পথ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মতো একজন কঠোর কর্মব্রতীকে উদ্বোধকরূপে না পাইলে অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা গদ্যকে মননের বাহন করিয়া তুলিতে পারিতেন কি না সে বিষয়ে সংশয় পোষণ করা অসঙ্গত হইবে না। তাঁহার সংবাদপত্র প্রবর্তনের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। জ্ঞান-বিষয়ক আলোচনাকে তিনি কেবল বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন নাই—দেশের সর্বস্তরে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবার একটি প্রয়াস তাঁহার ছিল। বস্তুতঃ, স্বদেশের তিমিররাশি অপনোদন করিয়া 'শান্তং জ্ঞানম্ অদ্বৈতম্'-এর প্রকাশ করার যে আকাঙ্ক্ষা রামমোহনের ছিল, তাহা পরিপূর্ণ করিবার জন্য একদিকে তিনি যেমন সমাজ সংস্কার করিয়া দেশের মধ্য হইতে আবর্জনারাশি বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই স্বদেশবাসীর মানসক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য উপযুক্ত বস্তুসম্ভারের আয়োজনও করিয়াছিলেন।

বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র রসসৃষ্টির দুই ভিন্ন কৌশল। কোন্ কবি কোন্ কাব্যকৌশল অবলম্বন করিবেন তা নির্ভর করে তাঁর প্রতিভার উপরে।

আধুনিক কাব্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের মধ্যে আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

'আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

কিন্তু, এ'কে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই।'

এ যুগে যাঁহারা আধুনিকতার জয়গান করেন, তাঁহারা এই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাস্তব জগতের যে চিত্র দেখা যায় তাহাকে সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী। পূর্বতন সাহিত্যকে এই বস্তুবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই পরিণতির মর্যাদা দিতে চাহেন না, কারণ পূর্ব পূর্ব কালে যে সকল সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে বাস্তব জীবনের ছাপ বেশি পরিমাণে নাই—তাহা ভাববাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। নিরাসক্তভাবে বিশ্বদর্শন করিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই—একটা ভাবদৃষ্টি লইয়া বিশ্ব ও বিশ্বজীবনের মধ্য হইতে সৌন্দর্য, প্রেম, করুণা প্রভৃতি মহৎ বিষয়গুলির নিষ্কাশন করিবার চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন।—এ যুগে যে সকল সাহিত্যকারের রচনায় এইরূপ ভাবদৃষ্টি দেখা যায় তাঁহারা বস্তুতান্ত্বিক সাহিত্যবাদীদের নিকট মধ্যযুগীয় আদর্শবাদী বলিয়া নিন্দিত হন। ইহারই

প্রতিক্রিয়ায় বহু সাহিত্যকার জীবনের দিকে নিরাসক্তভাবে চাহিবার নাম করিয়া জীবনের বিকৃতিকে সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্রের মধ্যে একটা বিরোধের সম্পর্ক আছে, এই ধারণা অনেক সাহিত্যকার মনে করিয়া থাকেন। ভাব ও বস্তু পরস্পর বিরোধী না হইলেও একেবারে স্বতন্ত্র উপাদান সন্দেহ নাই। বাস্তব জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যকারকে সাহিত্যসৃষ্টি করিতে হয়। সাহিত্য বাস্তবের প্রতিবিম্ব মাত্র না হইলেও স্রষ্টার কল্পনায় তাহাই নবরূপ লাভ করে। এদিক দিয়া বিচার করিলে সাহিত্যকে কবির কল্পনামণ্ডিত বাস্তব বলা হয়তো একেবারে অসঙ্গত হইবে না।

কিন্তু বাস্তব ছাড়াও আর একটি উপাদান সাহিত্যের মধ্যে রহিয়াছে—তাহা কবির চিত্ত। কবির চিত্ত বিচিত্র ভাবের সমাবেশে গঠিত। কবি যাহা কিছুই কল্পনা করেন তাহার মধ্যে এই ভাবের অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। এ দিক দিয়া দেখিলে সাহিত্যকে কবির সুবিচিত্র ভাবের প্রকাশ বলাও অসমীচীন হয় না।

বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র উভয়ের মধ্যেই একটা করিয়া সঙ্গত যুক্তি আছে। কিন্তু যাঁহারা বস্তুতন্ত্রবাদী তাঁহারা ভাবনির্ভর সাহিত্যকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে ভাববাদ সাহিত্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা আদর্শকে ফুটাইয়া তুলে এই মাত্র—তাহা সাহিত্য হিসাবে অপরিণত ও অপূর্ণাঙ্গ। আবার যাঁহারা ভাবতন্ত্রের উপাসক তাঁহারা বস্তুতন্ত্রকে স্থূলতার চর্চা বলিয়া তাহার প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভাববাদী তাঁহারা বলেন যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হইল সত্যের প্রকাশন—সুতরাং সাহিত্যের মধ্যে একটা আদর্শকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সাহিত্যে যাহা চিত্রিত হইয়াছে তাহা কতখানি বাস্তব হইয়াছে সে প্রশ্ন অবান্তর, তাহার মধ্যে জীবনসত্য কতখানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই প্রধান কথা।

বস্তুতন্ত্র এবং ভাবতন্ত্র এই দুয়ের বিরোধ বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার ভঙ্গির মধ্যে যে পার্থক্য তাহাই সাহিত্যকারদের এই দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়াছে। কিন্তু গভীরভাবে এই দুই ধারার সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এই উভয় তন্ত্রের মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নাই, বরং একটিকে অপরটির পরিপূরক বলাই হয়তো সঙ্গত হইবে।

আমরা যাহাকে বাস্তব বলি তাহাও একেবারে অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বাস্তবের বোধের মধ্যে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। একজন দিনমজুরের বাস্তব আর মহাকবি গ্যেটের বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান অপরিসীম। প্রত্যেকেরই চিন্তার একটা স্বকীয়তা আছে—কোনো বিষয়ের দিকে চাহিয়া দেখিবার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে। একজন সাধারণ মানুষের নিকট তাহার দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলি যেমন সত্য, একজন অসামান্য চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে কোনো নৈর্ব্যক্তিক সমস্যাও তেমনই সত্য। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রাত্যহিক তাহার জীবনের খুঁটিনাটিবিষয় যেমন বাস্তব, একজন চিন্তাবীরের নিকট কোনো দুরূহ তত্ত্বও তেমনই বাস্তব। একজন সাধারণ মানুষের নিকট একজন দার্শনিকের যে কোনো চিন্তা কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন ভাবমাত্র বলিয়া মনে হইবে আবার দার্শনিক সাধারণ মানুষের জীবনের খুঁটিনাটির দিকে হয়তো দৃষ্টিপাতই করিবেন না—বাস্তব সম্পর্কে বোধের মধ্যে একটা আপেক্ষিকতা থাকায় একই বিষয় একজনের নিকট বাস্তব এবং আর একজনের নিকট ভাবমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সাহিত্যকার বাস্তবকে রূপ দিব বা ভাবকে রূপ দিব এমন কোনো একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হন না। সাহিত্য সৃষ্টি—তাহা নির্মাণ নয়। সাহিত্যিকের সৃজনীকল্পনায় যাহা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহাকেই তিনি সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত করেন। যাহা অস্পষ্ট, যাহা অল্পমাত্র জ্ঞাত তাহাকে সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা

কোনো যথার্থ সাহিত্যস্রষ্টা করেন না। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সাহিত্যশাস্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন :

"The creation of an artist is a rational whole. It may or may not have its replica in the objective world, but so far as the artist's creation is concerned, it is a completed and integrated whole in which every part has its reason in every other part. It is an organic unity, a welded whole of thought or words and colours. Thus, an artist's creation, provided it is of a super-excellent order, is real in its internal coherence of rationality. In the objective world, however, there are contingent facts which may fail to give their reason in the congeries of connected events which we may try to present to us as a whole. Thus, in the objective occurrences there may be many contingent events which may be facts but which are not rational as they cannot be rationally integrated with the associated occurrences which one may wish to have a perspective as a whole. It is from this point of view that the fancies of the poet forming a harmonious and artistic whole may be said to be real by the application of the criterion of rationality and from this point of view the objective facts may only be partially true".

বস্তুতঃ, কবি তাঁহার কল্পনায় যাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহাই রূপায়িত করেন—আমাদের নিকট কখনও বা বস্তুতান্ত্রিক রচনা আবার কখনও বা ভাবতান্ত্রিক রচনা বলিয়া প্রতিভাত হয় এইমাত্র। কবিপ্রতিভা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত—তাহা যাহাকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহাই সাহিত্য হইয়া উঠে—তাহাতে বস্তু বা ভাব কোন্‌টি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে স্রষ্টা তাহা আদৌ লক্ষ্য করেন না। বস্তুই হোক আর ভাবই হোক, সাহিত্যের উপাদান হইবার মতো বিষয়ের অভাব বিশ্বে নাই—প্রতিভাবান্ সাহিত্যকার আপনার মানসপ্রবণতা অনুসারে উপাদান গ্রহণ করেন—বস্তু বা ভাবের

পরিবর্তে রসপরিবেশনের দিকেই তাঁহার কবিসত্তার দৃষ্টি থাকে, আর যাহা কিছু তাহা আনুষঙ্গিক বিষয় বা উপলক্ষ মাত্র।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

গানের প্রধানতম উদ্দেশ্য মনোহর সুরঝংকারে শ্রোতার মনোরঞ্জন। গায়ক যে সংগীতকে সুরের মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলেন মনোহারিত্বই তাহার সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ। তাহার মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকে না— কেবল আভাসে ইঙ্গিতে তাহার একটা অস্পষ্ট রূপ কখনও কখনও ফুটিয়া উঠে এই মাত্র।

সাধারণ কবিতার মধ্যে একটা বক্তব্য বিষয় থাকে। কাব্যের দেহ শব্দময়। প্রত্যেক শব্দেরই একটা অর্থ আছে—কাব্যের শব্দসম্ভার একটা সুনির্দিষ্ট অর্থকে গড়িয়া তুলে এবং কখনও কখনও তাহাকে অতিক্রম করিয়া একটা গভীরতর অর্থের ব্যঞ্জনাও প্রদান করে। অর্থবহতা কাব্যের প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু এক ধরণের কাব্য আছে, যাহার মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ সব চেয়ে বড়ো কথা নয়। কবি সেখানে কোনো বিষয় সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে অগ্রসর হন না। কেবল কবির অন্তরে যে আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহাই সেই কাব্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়। সংগীতের মধ্যে যেমন একটা কথাকেই সুরে মণ্ডিত করিয়া প্রকাশিত করা হয়, কবির অন্তরের একটি আবেগও তেমনই ঐ কাব্যের মধ্যে সূক্ষ্ম রেখায় ফুটিয়া উঠে।

এই গীতধর্মী কবিতা গীতিকাব্য নামে অভিহিত হয়। সংগীতের মধ্যে যে কথা দেখা যায় তাহার মধ্যে ভাবের আভাসমাত্রই সাধারণত দেখানো হয়—কবির বক্তব্যের অনেকটাই অগোচরে থাকিয়া শ্রোতার কল্পনাগম্য মাত্র হয়। সংগীতের জন্য লিখিত গীতগুলিই গীতিকাব্যের আদি রূপ। পূর্বে যে সকল গীতিধর্মী কবিতা রচনা করা হইত,

তাহা গীত হইবার উপযোগী করিয়াই রচিত হইত। পরে কাব্যের প্রসার হওয়াতে এমন কবিতা রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যাহা গীত হইবার জন্ত লেখা না হইলেও গীতধর্মী।

গীতিকাব্যের নিদর্শনস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা' কবিতাটির প্রথম স্তবকটি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে,
হৃদয় নাচেরে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস,
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে ॥

এই কবিতায় কবি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা বস্তু হিসাবে খুব বড়ো কিছু নয়; কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার অন্তরের যে সমুচ্ছ্বসিত আবেগ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই কবিতায় প্রাণ। বক্তব্যের গৌরব এখানে অতি সামান্ত; বক্তব্য বিষয়কে অতিক্রম করিয়া কবির অন্তরের সুতীব্র অনুভূতিই এখানে পরিব্যক্ত হইয়াছে। পরিণত বয়সে কবি এই রচনাটিকে সুরে গ্রথিত করিয়াছিলেন; কিন্তু কবিতাটির মর্মোপলব্ধির জন্ত তাহারও প্রয়োজন ছিল না। গীতের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস, যে আবেগ পরিলক্ষিত হয়, কবিতা হিসাবে পাঠ করিলেও ইহাতে তাহার প্রাচুর্য আছে। যে কথা কেবল অর্থমাত্র বহন করে, কবির সৃজনী প্রতিভা যেন তাহাকে সুরের পক্ষবিহারী সংগীতের মতো ভারহীন আবেগময় ও গতিমান্ করিয়া তুলিয়াছে। ইহাই যথার্থ গীতিকাব্যের লক্ষণ।

যে কবিতায় কবির নিজের হৃদয়ের আবেগমাত্র ব্যক্ত হয়, তাহাই যে গীতিকাব্য হইতে পারে এ ধারণা পোষণ করা সঙ্গত হইবে না। একটা বর্ণনীয় বিষয়কে অবলম্বন করিয়াও গীতিকাব্য রচিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র উদাহরণস্বরূপ পাঠ করা যাইতে পারে।—

অচ্ছোদ-সরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি। সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায় সঘন
পল্লব শয়নতলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্ছিত বনের কোলে, কপোত দম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবকাশকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন॥

ইহা প্রকৃতির বর্ণনা। কবি দুই তিনটি রেখায় প্রকৃতির একটি নিপুণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা চিত্র মাত্র নয়—ইহার মধ্যে একটা অব্যক্ত সুর যেন সমস্ত চিত্রকে অতিক্রম করিয়া ধ্বনিত হইতেছে।

এই সুরটি সংগীতের সুরের মতোই কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়—মুখ্যত অনুভূতি দ্বারাই ইহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। এই অতিরিক্ত সুরটিই কাব্যাংশটিকে গীতিকাব্য করিয়া তুলিয়াছে। বক্তা কবির ভাবোচ্ছ্বাস এখানে সূক্ষ্মশরীরে বর্তমান বলিলে অসঙ্গত হইবে না—কবি প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন করিলেও ইহা চিত্রধর্মী রচনা না হইয়া সেই সূক্ষ্মদেহী ভাবোচ্ছ্বাসের ঈষৎ প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশের ফলে গীতিকাব্যই হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রের স্ফুটতা আপাতদৃষ্টিতে প্রধান বলিয়া মনে হইলেও

অভিব্যক্ত সুরটুকুই কাব্যাংশটির প্রাণ। এই সুরটুকু না থাকিলে ইহার সৌন্দর্যই থাকিত না।

আবার আবেগমুখ্য হইলেই যে কোনো কবিতা গীতিকাব্য হইবে এমন নাও হইতে পারে। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' প্রভৃতি কাব্যাংশে আবেগের প্রাচুর্য থাকিলেও তাহা গীতিকাব্য নয়, কারণ তাহার মধ্যে কবির ভাবোচ্ছ্বাসের সূক্ষ্ম প্রকাশ-ব্যাপার সাধিত হয় নাই। গান ও কথার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য এই যে, গানের মধ্যে সুরের যে শিল্পময় সূক্ষ্ম আবেদন আছে তাহা কথার মধ্যে নাই। সেই আবেদন-টুকু সঞ্চার করিতে পারে নাই বলিয়াই বহু কবিতায় আবেগ বা উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও গীতিকাব্য হয় নাই।

গীতের মধ্যে যে সুর থাকে তাহা আমরা শ্রুতির মাধ্যমে হৃদয় দিয়া অনুভব করি। গীতিকাব্যের মধ্যেও আমাদের একটি সুর অনুভব করিতে পারি—এখানে শ্রুতির ব্যবহার নাই, কাব্যের মধ্যে শ্রুতির অগোচর একটা সুর অনুরণিত হইতে থাকে, হৃদয় দিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। গীতের মতোই এই সুরটি কেবল রসরূপে আস্বাদ্য—ইহার অন্য কোনো ভার নাই। সাহিত্যের অন্য শাখাগুলির চেয়ে এই শাখাতেই বিশুদ্ধ সাহিত্যিক আনন্দ বেশী পরিমাণে পরিস্ফুট হয়। এইজন্যই ইহা অধিকতর চিত্তগ্রাহীও হইয়া থাকে।

সামাজিক জীবনের পুষ্টি ও মঙ্গল সাধন কি সাহিত্যের লক্ষ্য, না তার কাজ কেবল মনকে এক রকম আনন্দ দেওয়া, যার নাম সাহিত্যিক আনন্দ?

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমাদের জানা দু-রকমের—জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য-কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই একটা পরিণতি ঘটা। বাইরে পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ-

রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা। সেইজন্তে উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকে কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিত-কলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে-আনন্দ। অনুভূতির গভীরতার দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। প্রতিদিনের ব্যবহারিক-ব্যাপারে ছোট ছোট ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মসম্প্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে বেঁধে রাখে বৈষয়িকতার সংকীর্ণতায়, প্রয়োজনের সংসারটা আমাদের আপনাকে ঘিরে রাখে কড়া পাহারায়; অবরোধের নিত্য অভ্যাসের জড়তায় ভুলে যাই যে, নিছক বিষয়ী মানুষ অত্যন্তই কম মানুষ—সে প্রয়োজনের কাঁচিছাঁটা মানুষ।

প্রয়োজনের দাবি প্রবল এবং তা অসংখ্য। কেননা, যতটা আয়োজন আমাদের জরুরি তা আপন পরিমাণ রক্ষা করে না। অভাব মোচন হয়ে গেলেও তৃপ্তিহীন কামনা হাত পেতে থাকে, সঞ্চয়ের ভিড় জমে, সন্ধানের বিশ্রাম থাকে না। সংসারের সকল বিভাগেই এই যে 'চাই-চাই'য়ের হাট বসে গেছে, এরই আশপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে যেখানে তার মন বলে 'চাইনে', অর্থাৎ এমন-কিছু চাইনে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত করে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশী। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, তার যে রস তা অহেতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার-কাঠি-

ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনে।"

কিন্তু সকলেই সাহিত্যকে অপ্রয়োজনের আনন্দের উপাদান মাত্র বলিয়া মনে করেন না। প্রাচীন আলংকারিকরা সাহিত্যকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তির অবলম্বন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্য মানুষের মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করিবে, ইহাই ছিল তাঁহাদের বক্তব্য। সাহিত্য মানুষকে উপদেশই দান করিবে, কিন্তু গুরুর মতো নয়, কান্তার মতো মধুর ভাষায় সাহিত্য মানুষকে মঙ্গলকর বাণী শুনাইবে—ইহাই কয়েকজন প্রাচীন আলংকারিকের অভিমত। পাশ্চাত্ত্য বহু সাহিত্যিকও সাহিত্যকে শিক্ষাদাতা জনকল্যাণের অবলম্বন বলিয়া মনে করিয়াছেন বা করেন। এযুগে আবার সাহিত্য প্রচারের মাধ্যমে পরিণত হইতেছে। বস্তুতঃ, সাহিত্য চিত্তরঞ্জক ও বহুজনের সহিত সম্পর্কযুক্ত শিল্প হওয়ায় অনেকেই সাহিত্যকে কোনো না কোনো ভাবে কাজে লাগাইতে চাহেন।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই দ্বিবিধ মতের আলোচনা করিয়া অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন, "এই মতবিরোধের আলোচনায় প্রথমেই একটি কথা মনে রাখা দরকার, যা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু যা এ প্রসঙ্গে সব সময় মনে থাকে না। সাহিত্য কাব্য মতবাদীদের কল্পিত কোনো বস্তু নয়। সাহিত্যিক ও কবির প্রতিভা যা সৃষ্টি করে, এবং সাহিত্য ও কাব্য ব'লে বিদগ্ধ সমাজে যা গ্রাহ্য হয়, সেই বস্তুর প্রকৃতি ও লক্ষ্য নিয়েই আলোচনা"। এ কথা মনে রেখে বিচার করলে সহজেই দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও কাব্য বলে যা স্বীকৃত তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে, সামাজিক মঙ্গলের লক্ষ্য যার মধ্যে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। রামায়ণ কি মহাভারতের কবির লক্ষ্য ছিল সমাজের মঙ্গল, এ তর্ক তোলা কঠিন নয়। রঘুবংশ কি শকুন্তলায় এ লক্ষ্য আবিষ্কার করাও হয়তো অসম্ভব নয়। তবুও করা যায়, এ কথা কেউ

বলবে না যে, যক্ষের বিরহবর্ণনায় কালিদাসের উদ্দেশ্য ছিল উপরওয়ালার সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার থেকে লোকদের নিবৃত্ত করা, এবং মেঘদূত পাঠের ফল সেই উপদেশ লাভ। কাদম্বরী বা Alice in Wonderland-এর কী উপদেশ। My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে—কোন্ উপদেশ বা মঙ্গল এদের লক্ষ্য? মোট কথা, সাহিত্য ও কাব্যের লক্ষ্য সমাজহিত, তবে খুব মনোরম ছলে, এ মত সত্যিকারের কাব্য পরীক্ষার ফল নয়; তথ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে একটা মনগড়া তত্ত্ব।

এর উত্তরে বলা চলে যে, এগুলি ব্যতিক্রম। হিতকে মনোহারী করাই কাব্য ও সাহিত্যের লক্ষ্য। কিন্তু মনোহরণের কৌশলটা খুব সার্থক হলে তার জোরেই রচনা কাব্য ও সাহিত্য বলে চলে যায়; মধুর আধিক্যে ভিতরে যে ঔষধ নেই, সেদিকে লক্ষ্য থাকে না। এই হিতবাদ, যাদের বলে প্রাচীনপন্থী, তাদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। হিতবাদী যদি সামাজিক ব্যাপারে হন স্থিতির পক্ষপাতী, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম সৎ-সাহিত্য, আর তিনি যদি হন পরিবর্তন বা গতির পক্ষে, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম প্রগতি সাহিত্য। কিন্তু স্থিতিবাদী ও গতিবাদী সাহিত্য বিচারে দুজনার দৃষ্টিভঙ্গি এক। যার লক্ষ্য ও ফল সামাজিক মঙ্গল নয়, তা যথার্থ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়।

সুতরাং এ প্রশ্ন তুলতেই হয়, মানুষের মনের সমস্ত চেষ্টার লক্ষ্য কেন হবে সমাজের মঙ্গলসাধন। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সামাজিক মঙ্গল প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শেষ পর্যন্ত মানুষের শরীর ও প্রাণের রক্ষা ও পুষ্টি। শরীর ও প্রাণের প্রতি যে মায়া, আমাদের মীমাংসকদের ভাষায় তা রাগপ্রাপ্ত—অর্থাৎ তা স্বভাবতই আছে, কোনো যুক্তি ও উপদেশের তা ফল নয়। পশুপক্ষী ও মানুষে তা সমান। এই মায়ার প্রেরণায় মানুষের মনের যা সব সৃষ্টি, তার চরম মূল্য স্বীকারে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। কারণ, সেই সৃষ্টিতেই মানুষের সভ্য জীবন যাপন সম্ভব হয়েছে। মনের অন্য কোনো সৃষ্টির যদি মূল্যও থাকে, এ সৃষ্টির ভিত্তি ছাড়া তা অসম্ভব। মৈত্রেয়ীকে

নিয়ে বনে যাওয়া চলে, কিন্তু কাত্যায়নীকে ছেড়ে ঘরকন্না চলে না। কিন্তু মানুষের মন যে কেবল মনের তৃপ্তি ও আনন্দের জন্তই সৃষ্টি করে, এ-ও তো স্বাভাবিক; কারণ এরকম সৃষ্টি মানুষ করেছে ও করছে। তবে বলতে হয়, যেমন সভ্যসমাজের মঙ্গলের জন্ত মানুষের অনেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করতে বা তাদের মুখ ঘোরাতে হয়েছে, সেই মঙ্গলের জন্তই এই আত্মতুষ্ট সাহিত্যিক প্রবৃত্তির মুখ ঘুরিয়ে শরীর ও প্রাণের হিতে তার নিয়োগ হওয়া উচিত।

এই মতকে প্রচ্ছন্ন জড়বাদ, কি দেহ-সর্বস্ববাদ নাম দিয়ে হেয় করার চেষ্টায় লাভ নেই। কিন্তু প্রাণের উপর স্বাভাবিক মায়ায় তার মঙ্গলের উপায়ের নিঃসংশয় মূল্যবোধ ছাড়া এ মতের অন্ত কোনো ভিত্তিও নেই। সামাজিক মঙ্গল কেন কাম্য, সে প্রশ্নও তোলে না, মেনে নেয়। তাই কেন একমাত্র কাম্য, সে প্রশ্নও তোলে না, মেনে নেয়। অর্থাৎ উপায় নিয়ে তর্ক চলে, উদ্দেশ্য নিয়ে চলে না। কোনো কিছু অন্তকিছুর সদুপায় কি না, এটা তর্কের কথা; কারণ প্রমাণের বিষয়। কিন্তু কোনো জিনিস তার নিজের জন্তই কাম্য কিনা, এটা প্রমাণের বিষয় নয়, রুচির কথা। অন্ত উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ সাহিত্যিক আনন্দ কাম্য কি না, তা যার মন কাম্য বলে জেনেছে, তার কাছেই কাম্য—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। সে বোধ যার মনে নেই, তার কাছে প্রমাণ করা যাবে না। সাহিত্যিক আনন্দ যে সেই আনন্দে শেষ হয়েই অমূল্য আলংকারিকদের ভাষায় মনের অনুভূতি ছাড়া তার অন্ত প্রমাণ সম্ভব নয়—সচেতসামানুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।"

সাহিত্য সৃষ্টির তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে সাহিত্যিক আনন্দকেই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। রসসম্ভোগই কাব্যের চরম লক্ষ্য বলিয়া প্রাচীন আলংকারিকদের মধ্যে অনেকে স্বীকার করিয়াছেন—এ যুগেও রসবাদীদের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দের সহিত শিবের কোনো বিরোধ নাই,—যে কাব্য মানুষকে আনন্দ দান করে, তাহাই তাহাকে পরম কল্যাণের নির্দেশও দিতে পারে। মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য বিশুদ্ধ কাব্যরসকে অবলম্বন

করিয়া রচিত হইয়াও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু কাব্যের মধ্যে জীবনজিজ্ঞাসারও স্থান আছে, জীবনের গূঢ় সত্যকে প্রকাশ করাও কবির কাজ। শুদ্ধমাত্র শিল্পের দিক হইতে বিচার করিলে কাব্যের মধ্যে আনন্দকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়—কিন্তু জীবনের দিক হইতে সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার মধ্যে জীবনের পক্ষে পুষ্টিকর অন্ন উপাদান প্রত্যাশা করা অসঙ্গত হইবে না।

সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া তাহাকে বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

'পুরস্কার' নামক কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ কবির উক্তিতে বলিয়াছেন :

না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।

মানুষের ভাবের সীমা পরিসীমা নাই। এই বিশ্বজগৎ তাহার অন্তরে অসংখ্য ভাবনা জাগ্রত করিয়া তুলে। কিন্তু সেই সকল ভাব ও ভাবনাকে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত কথা সকলে খুঁজিয়া পায় না। ভাববিশেষকে কথার মধ্যে প্রস্ফুট করিয়া তুলিবার শক্তি সকলের নাই—কেবলমাত্র কবিই সেই শক্তির অধিকারী। কবি কথার মালা গাঁথিয়া মানুষের ভাবপ্রকাশের একান্ত কামনা কিছুটা মিটাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে কেবল যে তাঁহার নিজের কথাই ব্যক্ত হয় তাহা নয়, তাহার মধ্যে যাহা প্রতিফলিত হয় তাহা আরো অনেক মানুষের মনের গোপন কথা।

কবির অন্তরের সহিত পাঠকের অন্তরের এই ভাবগত সাধর্ম্য আধুনিক যুগের একটি কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে :

এ কবিতা ভালো লাগে নাকি ?—
ধ্বনির তরঙ্গলীলা
তোমারও মনকে দোলায় ?
সারা প্রাণ ঢেউ হয়ে উঠে
আছড়ে আছড়ে পড়ে খুশির বেলায় ?
মনে হয়—মনে হয় নাকি,
যে বাণী পড়েছে ধরা
ছন্দের সপ্তকে গাঁথা ভাষার এ গানে,
স্বপ্নের হারানো কথা তাই যেন ?
যে কথাটি বলি বলি করে
এখনও হয়নি কো বলা,
সেই চির চেনা না বলা কথাটি
ফুটেছে এখানে ?

বাস্তবিকপক্ষে কবির কাব্যরচনা বিজন সাধনা হইলেও তাঁহার স্বজন চিন্তা আছে। তিনি যে সমাজের মধ্যে বাস করেন তাহা তাঁহার অন্তরে বিচিত্র ভাবোর্মি তরঙ্গিত করিয়া তুলে। তাঁহার স্রষ্টামানস সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি মানবের ব্যক্তিগত সম্পত্তিমাত্র নয়—সমাজের বিভিন্ন মানুষের ভাবের সহিত তাহার একটা সুনিবিড় আত্মীয়তা বর্তমান। কবি বলিয়াছেন :

এ কবিতা ভালো লাগে যদি,—
জেনো এ জীবনটুকু মূর্ত হয়ে ওঠে
যে অসংখ্য দেহহারা প্রাণকণিকার
বিচিত্র লীলায়,
তারি কটা লীন আছে তোমার সত্তায়।

সামাজিক জীব কবির অন্তরের সহিত সমাজের আর একজনের অন্তরের

নিকট সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, কবি-মানস সমাজকে উপেক্ষা করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। যে ভাবগুলি তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করে তাহা বহুমানবের অন্তরে ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবেরই একটা বিশিষ্ট রূপভেদ মাত্র। যাহা বহুমানবের মধ্যে সাধারণ ভাবরূপে ছিল তাহা কবির অন্তরে বিশিষ্ট ভাবরূপে প্রতিভাত হয়। একটা বিমূর্ত আইডিয়া যেন বহুজনের মানস হইতে নিঃসৃত হইয়া কবিদৃষ্টির ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া প্রতিসৃত হইয়া বিশিষ্ট ভাবরূপে অনুভূত হয়—কবি যেন সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে আপনার করিয়া লন।

কবির অন্তরের এই বিশেষীকৃত সাধারণভাব তাঁহার কাব্যসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার বোধরূপে তাঁহার চেতনায়—হযতো বা অবচেতনাতেই সংগুপ্ত হইয়া থাকে।—

প্রাণের কী ভাষা যেন বিজড়িত থাকে
নাড়ীর অদৃশ্য পাকে পাকে—
চেতনাতীতের গর্ভে . .
সুষুপ্তির গাঢ় সুখে লীন।

বাহিরের সংঘাতেই হোক বা প্রকাশের দুঃসহ বেদনাতে হোক কবির কবিসত্তা যখন উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন যেন এই সুখসুপ্ত ভাবনারাজির ঘুম ভাঙিয়া যায়। তখন কবি মনের ভাবগুলি ব্যক্ত হইবার জন্য যেন আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে।

কবির ভাবের এই প্রকাশের মধ্যেও একটা বিচিত্র ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কবির মনে ভাবের যে বিশেষ রূপটি আছে তাহা একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব সম্পদ। মন্ময় কবিদের রচনায় কবির অন্তর্লোকের পরিচয়ই বেশী করিয়া পাওয়া যায়—কিন্তু সেখানেও কবির নিজস্বভাব একেবারে নিজের মতো করিয়া তিনি প্রকাশ করেন না। কারণ কবি যখন কোনো কিছু প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন তখন তিনি কবিরূপে কেবলমাত্র নিজের অনুভূতিটুকু অভিব্যক্ত করিতে চাহেন না—তিনি যেন কবিসত্তা ও পাঠকসত্তায় দ্বিধা বিভক্ত

হইয়া যান। তিনি যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকরূপে তাহাকে উপভোগ করিবার একটা বাসনা তাঁহার অন্তরে থাকে। নতুবা কবিতা রচনা করিবার জন্য তাঁহার কোনো আগ্রহই থাকিত না। তিনি তথাকথিত 'নীরব কবি'র মতোই নীরবে নিজের অন্তরের ভাবসম্পদ নিজেই উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কবিতা কবি ও পাঠকের যৌথ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। বরং বলা যাইতে পারে যে, কবি কেবলমাত্র স্রষ্টা বলিয়াই উল্লিখিত হন, তাঁহার রচনার মধ্যে যে ভাব বা রস প্রকাশিত হয় যুগ যুগ ধরিয়া পাঠকসমাজই তাহা উপভোগ করে।

কবি যখন তাঁহার অন্তরের ভাববস্তুকে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেন তখন আর সেই সকল ভাবকে নিজের বিশেষ সম্পত্তি করিয়া রাখা চলে না। তাহাকে এরকমভাবে প্রকাশিত করিতে হয় যে, পাঠকসাধারণ তাহা বুঝিতে এবং উপভোগ করিতে পারে। সাহিত্য সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী—সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে কবির হৃদয়ের সংবাদ গিয়া পৌঁছিলে তবেই তাঁহার কাব্যের সার্থকতা। সুতরাং কবিকে একান্ত স্বকীয়ভাবে অনুভূত ভাবগুলিকে এমনভাবে পরিস্ফুট করিতে হয় যাহাতে তাহা সাধারণ পাঠকের ধারণাগম্য হইতে পারে। এইভাবে বিশেষভাবে অনুভূত ভাবকে সাধারণের মতো করিয়া পরিবেশন করাকে ভাবের সাধারণীকরণ বলা যাইতে পারে। এই সাধারণীকরণের মধ্যে কবির অনুভূতির বৈশিষ্ট্যও উপেক্ষিত হয় না, অথচ সাধারণ পাঠক তাহাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। সাহিত্য সাধারণভাবকে কবির বিশেষভাবের মধ্য দিয়া পাঠকদের নিকট আবার ফিরাইয়া দেয়। কবিমানস রঙিন আয়নার মতো সাধারণ ভাবগুলিকে আপনার রঙিন কাচে প্রতিফলিত করিয়া সাধারণ ভাবরূপে পাঠকদের নিকট ফিরাইয়া দেয়—অবশ্য সেই প্রতিবিম্বে কবিমানসের বিশিষ্ট ধর্মের রঞ্জন থাকে।

সাহিত্য স্বভাবের সূক্ষ্ম শরীর; পরন্তু সূক্ষ্ম শরীরে যেমন স্থূল শরীরের অন্তর্ভুক্ত অথচ অতিরিক্ত, সেইরূপ সাহিত্য স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত অথচ স্বভাবাতিরিক্ত।

সাহিত্যের উপাদান স্বভাব অর্থাৎ এই প্রকৃতি হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে দুইটি বিষয় রহিয়াছে—একটি পরিদৃশ্যমান বহির্জগৎ অপরটি কবিমানস। এই দুইয়ের সমবায়েই সাহিত্য গড়িয়া উঠে।

সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে কবির মানসই অবশ্য প্রধান বিষয়। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে একজন স্রষ্টা থাকেন। এদিক দিয়া সংগীতের সহিত সাহিত্যের সাজাত্য থাকায় সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া সঙ্গীতের সৃষ্টি ব্যাপারের দিকে দৃষ্টিপাত করা অসঙ্গত হইবে না। সংগীতের উপকরণ আদৌ স্থূল নয়, তাহা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ—ধ্বনি মাত্র। এই ধ্বনিকে সুরকার সংগীতে পরিণত করেন। বৈজ্ঞানিকগণ ধ্বনির কম্পনের তারতম্য অনুসারে অসংখ্য স্বরের সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সংগীতে কেবল সপ্তস্বর ও তাহারই বিভিন্ন গ্রাম স্বীকৃত হইয়াছে। অনন্ত ধ্বনিকে এই সপ্তস্বরে ভাগ করার মূলে সুরকারের স্রষ্টা মন রহিয়াছে। তাহাকে আবার বিভিন্ন সুরে গ্রথিত করিয়া যে সংগীত সৃষ্ট করা হয়, তাহার মূলে কবির কল্পনাই কার্যকারী। সুর-রসিকের মানস-ভূমিতেই সংগীতের প্রতিষ্ঠা বাহিরের কোনো ভিত্তির উপর সংগীতের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়।—তেমনই সাহিত্যের মূল কবিমানসের মধ্যেই রহিয়াছে। কবির মনটি সক্রিয় না হইলে সৃষ্টিব্যাপার সম্ভবপর হইত না। কবি তাঁর কল্পনা দিয়াই সাহিত্যকে রূপদান করেন। তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে যাহা ফুটাইয়া তোলেন তাহা তাঁহার মানসক্ষেত্র হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কবির মনোধর্মের বৈশিষ্ট্যের জন্যই সাহিত্য বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। স্রষ্টা-মনই কাব্যের জনক।

সাহিত্যে কবিমানসের যে স্থান বিশ্বেরও সেই স্থান। কবি সমাজবহির্ভূত পুরুষ নহেন—এই সংসারেই তাঁহার অধিষ্ঠান। কাব্য রচনা করিবার সময় তিনি আপনার গহন মনের ভাবনাগুলিকে তারার মত ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার যে স্রষ্টা চেতনা কাব্যরচনায় ব্যাপৃত, তাহাও যে তাঁহার চারিদিকের জীবনের যোগেই গঠিত হইয়াছে। কবিমানসকে যেমন ব্যক্তিমানস হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনই তাঁহার পরিবেশ

হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করাও সম্ভবপর নয়। একথা স্মরণ করিতে হইবে যে, কবিপ্রতিভা একদিনে অকস্মাৎ দৈব আশীর্বাদের মতো নামিয়া আসে না—তাহার মূলে যুগযুগান্তরের প্রস্তুতি রহিয়াছে। জাতীয় জীবনধারা, সংস্কৃতি, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বা অনটন, শিক্ষাদীক্ষা পরিমণ্ডল—সব কিছুই কবিমানসের গঠন ব্যাপারে সহায়তা করে। কবিমানস একদিকে যেমন জীবকোষের বিচিত্র বিকাশের ফল—তেমনই তাহা ইতিহাসের দানও বটে। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনের কবিপ্রতিভাই অসামান্য ছিল—কিন্তু তাহাদের মধ্যে কি বিপুল ব্যবধান! যে সমাজচেতনা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্য হইতে উদ্ভূত হয়, তাহা কবির সমগ্র সত্তাকে লালন করিতে থাকে—তাহাকে এড়াইয়া যাওয়া কোনো কবির পক্ষেই সম্ভবপর নয়। যে জীবনের বাতাবরণের মধ্যে চেতনা সঞ্চরণ করে, তাহাকে পাশ কাটাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা কবির পক্ষে অসম্ভব। যাহাকে পলায়নী মনোবৃত্তি বলিয়া অনেকে চিহ্নিত করেন, কবির সেই বিশেষ মনোভাবটি একেবারে বর্তমান কাল হইতে একটু স্বতন্ত্র কোনো আদর্শমণ্ডিত কালের মধ্যে কবিমানসের আত্মসমর্পণ মাত্র। কিন্তু সেখানেও কবি তাঁহার কালকে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিলেও তাহা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ, তিনি তাঁহার কাল ও পরিমণ্ডলের মধ্যেই সঞ্চরণ করিতে থাকেন, কোনো বিশেষ জীবনের কল্পিত আদর্শ তাঁহার ভাবনাকে একটু রাঙাইয়া দেয়। প্রকৃতিকে অর্থাৎ এই আবেষ্টনকে লঙ্ঘন করিবার প্রয়াস কবিমানসের পক্ষে একটা আত্মঘাতী প্রচেষ্টা মাত্র।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাহিত্যকারকে এই বিশ্বজগতের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় বটে, কিন্তু সাহিত্য ও এই জগতের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। যে স্বভাব বা প্রকৃতি কবির চতুর্দিকে একটা অনতিক্রমণীয় বাতাবরণ রচনা করে তাহা সাহিত্যের মধ্যে অবশ্যই ফুটিয়া উঠে, কিন্তু সাহিত্যে যাহা প্রকাশিত হয় তাহা সেই প্রকৃতিমাত্র নয়। কবির সৃজনী শক্তি সেই উপাদানকে বিদেহ করিয়া তুলে—প্রকৃতিকে যেন অপ্রাকৃত বিষয়ই করিয়া তুলে।

সাহিত্য সৃষ্টি ব্যাপারটা যে কী তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে তাহার মধ্যে দুইটি স্তর দেখা যায়। প্রথমতঃ, বাহিরে যে প্রকৃতি আছে তাহা কবির মনে একটা বিশেষ ধরণে প্রতিভাত হয়। একটি লাল গোলাপ প্রত্যেকের চোখে অর্থাৎ প্রত্যেকের মনে সমান বলিয়া মনে হয় না। গোলাপের সৌন্দর্য সম্পর্কে সকলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের চিত্তে গোলাপ যে প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে তাহার বিশিষ্টতা আছে। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে এই বিশিষ্ট বোধটির কার্যকারিতা অনস্বীকার্য হওয়ায় কেহ কেহ এই বিশিষ্ট বোধটিকেই 'স্টাইল' বলেন। কোনো একটি বিষয় কবির চিত্তে যে ভাবে প্রতিভাত হয়—নবজন্ম গ্রহণ করে বলাও হয়তো অসঙ্গত হইবে না—তাহাই তাঁহার 'স্টাইল'।

সাহিত্যে আমরা যাহাকে প্রকাশিত দেখি তাহা প্রকৃতির এই অনুভূত রূপেরই প্রতিফলন। কবির অন্তরে যাহা একটি মূর্তির মতো স্পষ্ট হইয়া উঠে, তাহাই যে সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে এ ধারণাও সত্য নয়। কবির অভিজ্ঞতা যতই সুবিস্তৃত হোক না কেন, তাহার বোধ যতই সুস্পষ্ট হউক না কেন—রচনার পূর্বে রচিতব্য বিষয় কবির মানসলোকে নীহারিকার মতো অস্ফুট এবং অপরিণত আকারে বর্তমান থাকে। কবি যখন সেগুলিকে সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত করেন তখনই সেগুলি এক একটি সুস্পষ্ট মূর্তি লইয়া আবির্ভূত হয়। সেই আবির্ভাবের পূর্বে কবি স্পষ্টভাবে জানিতেও পারেন না তাঁহার হৃদয়ের ভাবনাগুলি কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিবে।

সুতরাং দেখা গেল যে, সাহিত্যের মধ্যে যাহা প্রকাশিত তাহার মূলে রহিয়াছে এই জগৎ—যাহাকে প্রকৃতি বা স্বভাব নাম দেওয়াও যাইতে পারে। কিন্তু সেই জগৎটি প্রথমে কবির মানসলোকে তাহার পর সাহিত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দুইবার নবরূপ পরিগ্রহ করে। সাহিত্যের জগতের মূলের সন্ধান করিতে গেলে আমাদের পরিচিত জগতের কথাই বলিতে হয়—কিন্তু তাহা আমাদের স্থূল জগৎ নহে, সাহিত্যের মধ্যে জগতের যেন একটা সূক্ষ্ম শরীর আত্মপ্রকাশ করে।

আমাদের দেহের একটা স্থূল অংশ একটা সূক্ষ্ম অংশ বর্তমান। সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরের মধ্যেই আবদ্ধ, কিন্তু তাহা স্থূল শরীর হইতে স্বতন্ত্র একটি বস্তু। তাহার মধ্যে যে প্রাণবত্তা আছে তাহাই স্থূল দেহকে পরি-পরিচালনা করে। সাহিত্যের মধ্যে স্বভাবের যে সূক্ষ্ম শরীর বর্তমান তাহা স্বভাবকে পরিচালনা করে না সত্য, কিন্তু তাহা স্বভাবের অন্তর্ভূত হইয়াও স্বভাবাতিরিক্ত পদার্থ। সাহিত্যের মধ্যে আমরা যে জগৎকে দেখি, তাহাকে আমাদের পরিচিত জগৎ বলিয়া মনে হয়—স্বপ্নের মধ্যেও আমরা যাহা দেখি তাহা আমাদের পরিচিত লোক বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নের জগতের মতোই সাহিত্যের জগতেও বাস্তব জগতের চেতনা মাত্র বর্তমান। স্বপ্নের মধ্যে আমাদের বোধশক্তি মাত্র থাকে, অন্য সকল শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। সাহিত্যের মধ্যে সমস্ত শক্তিগুলি কবিমানসের মধ্য দিয়া সাহিত্যের জগতে আত্মপ্রকাশ করে।

কল্পনা ও কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি, সংযম ও সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভাগ আছে, কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়।—বাংলার উপন্যাস ও কাব্যসাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত কর।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা সাহিত্যে আখ্যায়িকামূলক কাব্যের প্রচলন একটু বেশী পরিমাণেই হইয়াছিল। বৈষ্ণব গীতিকবিতা এবং তাহারই রূপভেদ প্রকীর্ণ কবিতাগুলির কথা বাদ দিলে প্রাচীন বাংলা কাব্য আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছিল। তবে রঙ্গলাল ও মধুসূদনের কাব্যে আখ্যায়িকামূলক কাব্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব এই দুই কবির রচনা হইতেই বাংলা কাব্যে সঞ্চারিত হইয়াছে—রঙ্গলাল গঠনশিল্পের দিক দিয়া পূর্বসূরীদের অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং মধুসূদন স্ব-বলে একটি নূতন দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে আধুনিক কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এইমাত্র প্রভেদ।

এই আখ্যায়িকা কাব্যগুলির কোনোটি পৌরাণিক, কোনোটি অর্ধ-ঐতিহাসিক আবার কোনোটি বা কাল্পনিক রচনা। নবীনচন্দ্রের কয়েকটি কাব্য কতক পরিমাণে নিকটতর কালের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত হইলেও সাধারণভাবে একথা বলা যাইতে পারে যে, এই যুগের কবিগণ মুখ্যত কল্পনার সহায়তা গ্রহণ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, তরুণ রবীন্দ্রনাথ—সকলেই আখ্যায়িকামূলক কাব্যের মধ্যে কল্পনাকেই প্রাধান্য দান করিয়াছিলেন। সমকাল হইতে কাব্যের উপাদান পর্যাপ্তভাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াস তাঁহারা করেন নাই।

এইজন্যই কবিগণকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।—কাব্যে কল্পনার আতিশয্য দোষাবহ নয়—কল্পনাই কাব্যের সৌকর্য বিধানে সহায়তা করে। কিন্তু কল্পনা বলিতে কবির খেয়াল মাত্র বোঝায় না। যাহা কবির মানসলোকে বর্তমান, তাহাকেই সুগঠিত দেহে প্রকাশিত করা কল্পনার কাজ। যেখানে কবির অন্তরে প্রকাশের উপযোগী বিষয়ের সমাবেশ হয় নাই, সেখানে কল্পনাশক্তি আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে না। সেখানে কবি যাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা কল্পনা নয়, কাল্পনিকতা।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের উপজীব্য বিষয় মূলত কল্পনানির্ভর ছিল। মহর্ষি বাল্মীকির কাব্য তিনি তাঁহার কাব্যের কাহিনীর রেখাচিত্রটুকু পাইয়াছিলেন—তাহাকে বর্ণাঢ্য করিয়া তুলিবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলই কল্পনা করিয়া লইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অন্তরে বর্ণিতব্য বিষয় একটা নীহারিকামূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাঁহার কল্পনা তাহাকে সুঠাম রূপ দান করিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে আমরা যাহা পাই তাহার মূলে কবির সৃজনী কল্পনা আছে বলিয়া তাহার মধ্যে কোথাও এতটুকু দুর্বলতা নাই। কবি সমগ্র কাব্যটিকে যুক্তির শৃঙ্খলে এমনভাবে বাঁধিয়াছেন যে, কোথাও এতটুকু দুর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় না; তাঁহার বর্ণনার মধ্যে এমন দৃঢ় সংযমের ভাব আছে যাহা প্রতিপদে

শক্তির অপব্যয়ের আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিয়াছে। কবি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোনো অংশ কুয়াশার মতো অস্পষ্ট বা প্রভাতচন্দ্রের মতো পাণ্ডুর হইয়া নাই। তাঁহার স্জনী কল্পনা প্রতিটি বর্ণনাকে কাব্যের প্রতিটি অংশকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য বিশুদ্ধ কল্পনা শক্তির আর একটি নিদর্শন। তাঁহার সমস্ত কাব্যখানি কল্পনার বৃন্তের উপর প্রস্ফুটিত। কবির স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছলতা কাব্যের মধ্যে বর্তমান, কিন্তু তবুও যৌক্তিকতা সংযম ও সত্যবোধ কাব্যটির মধ্যে এমনভাবে ওতপ্রোত হইয়া আছে যে, কাব্যটি অতিরঞ্জন ও অস্পষ্টতার আশঙ্কা সর্বতোভাবে পরিহার করিতে পারিয়াছে।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইঁহাদের কবিপ্রতিভা কল্পনার পরিবর্তে কাল্পনিকতার আশ্রয়ই বেশি পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে সত্যজ্ঞান, যুক্তি-সচেতনতা ও সংযমের অভাব ইঁহাদের কাব্যগুলির বহু অংশকে, অস্পষ্ট, অতিরঞ্জিত ও কষ্টকল্পিত করিয়া তুলিয়াছে। নবীনচন্দ্রের বর্ণনা-দক্ষতা ছিল কিন্তু অসংযম তাঁহার কাব্যকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার মধ্যেও কাল্পনিকতার প্রাচুর্য দেখা যায়। কাব্যের মধ্যে প্রশংসনীয় নানা বিষয় থাকা সত্ত্বেও সত্যকার জীবনবোধের অভাব ও ভাবালুতা তাঁহার প্রথম জীবনের আখ্যায়িকা কাব্য-গুলিকে উচ্ছ্বাসসর্বস্ব করিয়া তুলিয়াছে।

রঙ্গলাল কাব্যামোদী ছিলেন—কিন্তু তাঁহার কবিকল্পনা ছিল না। তিনিও তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে কাল্পনিকতারই প্রশ্রয় দিয়াছেন। ঈশান-চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি কবির রচনার মধ্যে মধ্যে রসগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া গেলেও কাল্পনিকতার আতিশয্য প্রায়ই তাঁহাদের কাব্যকে অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছে।

গীতিকবিতার মধ্যেও যে কল্পনা ও কাল্পনিকতা উভয়ের প্রভাবে রচনা সুকাব্য ও অকাব্য হয় তাহা রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাগুলির সহিত যে কোনো অল্পশক্তিমান কবির গীতি-কবিতা তুলনা করিলে অনুভব করা যাইবে।

ভাবগত সমৃদ্ধির সহিত কল্পনা সংযুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের খণ্ড কবিতাগুলি অনবদ্য হইয়াছে। অপর বহু কবি কল্পনার ঘাটতি কাল্পনিকতা দ্বারা পূরণ করিতে গিয়া কাব্যকে হয় অস্পষ্ট না হয় অদ্ভুত আতিশয্যে অপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছেন। কাব্যে কল্পনাই শিল্পদৃষ্টির প্রসূতি।

বাংলা উপন্যাসে কল্পনার প্রকাশ প্রায়ই দেখা যায় না। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উপন্যাসই সর্বাপেক্ষা শ্লথবদ্ধ হওয়ায় উপন্যাসেই কাল্পনিকতার চূড়ান্ত দেখা যায়। অবাস্তব ঘটনার বর্ণনায়, দুর্বল কথাবস্তু এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাত্রাবোধের অভাব বহু বাংলা উপন্যাসকে অপকৃষ্ট রচনা করিয়া তুলিয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত অপরাপর লেখকেব ইতিহাসাশ্রিত রচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্র ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে উপন্যাসগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলিতে ইতিহাসের পটভূমিকা যথাযথভাবে অঙ্কিত হইযাছে। ইতিহাস হইতে যে সকল বিষয় পাওযা যায় নাই, সেগুলিকে তাঁহারা কল্পনার সাহায্যে পূবণ করিয়া লইয়াছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে যে কাহিনী তাঁহারা স্থাপনা করিয়াছেন তাহাও সুস্পষ্ট। বস্তুত তাঁহাদের বচনার মধ্যে এমন একটা সংগতি আছে যে, উপন্যাসেব প্রতিটি অংশ যথার্থ বলিয়া মনে হয়। কল্পনাশক্তির অভাববশত যে সকল লেখক কাল্পনিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের বচনায় এই সংগতির একান্ত অসদ্ভাব। ফলে ইতিহাসের নামে তাঁহারা অতিমাত্রায় কাল্পনিক ও অবাস্তবরূপে প্রতীয়মান ঘটনাবলীকে উপন্যাসের মধ্যে রূপায়িত করেন। সেই অবাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা যে সব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও কম অবাস্তব নয়। ঘটনার পরম্পরার মধ্যে যৌক্তিকতার অভাব এবং অত্যুগ্র কাল্পনিকতায় অদ্ভুত ঘটনার পরিকল্পনায় এই রচনাগুলি প্রায়ই অতিনাটকীয় কাহিনীমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে এবং উপন্যাসের পরিবর্তে রূপকথা নামের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতেই বেশির ভাগ সামাজিক উপন্যাস রচিত হইয়াছে। বেশির ভাগ বাংলা সামাজিক উপন্যাসেই যে পরিবেশ বা যে চরিত্রাবলী কল্পিত হয়, সেগুলির কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকে না। সত্যকার জীবনদৃষ্টি না থাকিলে উপন্যাসসৃষ্টি সম্ভবপর নয়। জীবনকে অনুভব করিয়া কল্পনার সাহায্যে আর একটি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে জীবনকে রূপায়িত করাই ঔপন্যাসিকের কর্তব্য। বহু অল্পশক্তি বাঙালী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বা কচিৎ রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়া কাহিনী রচনা করেন। কিন্তু লেখকদের কল্পনাদৃষ্টির অভাবে সেগুলির মূলে জীবনসত্যের অভাব একান্তভাবে অনুভূত হয়। তাঁহারা যে জীবনের চিত্র অঙ্কন করেন, উপন্যাস-লোকেই তাহাদের স্থিতি। তাঁহারা যে চরিত্রগুলিকে নাটকের মুখ্য পাত্রপাত্রীরূপে উপস্থাপিত করেন, তাহারা রক্তমাংসের জীব নয়—তাহারা ভাবালু চিত্তের অদ্ভুত কল্পনা মাত্র। নিছক কাল্পনিকতা ঘটনার মধ্যে কোথাও সতেজতা ও অগ্রগতির সহায়তা করে না, বাহ্য ঘটনার স্রোতে কাহিনী কোনোক্রমে আগাইতে আগাইতে কোনোক্রমে শেষ হইয়া যায়। এইসব অল্পশক্তি ঔপন্যাসিকদের কয়েক জনের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—বাস্তবিকপক্ষে বাংলা সাহিত্যে যত উপন্যাস লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা দুই চারটির অধিক রচনায় যথার্থ কল্পনাশক্তির বিচরণক্ষেত্র দেখা যায় না; বেশির ভাগ রচনাই কাল্পনিকতার আতিশয্যে মেদবহুল ও অন্তঃসারহীন।
